Rizon

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ২৮

রকিব হাসান

কিশোর থ্রিলার

সেবা প্রকাশনী

ভলিউম ২৮

তিন গোয়েন্দা

১২৭, ১৪৬, ১৫৪

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
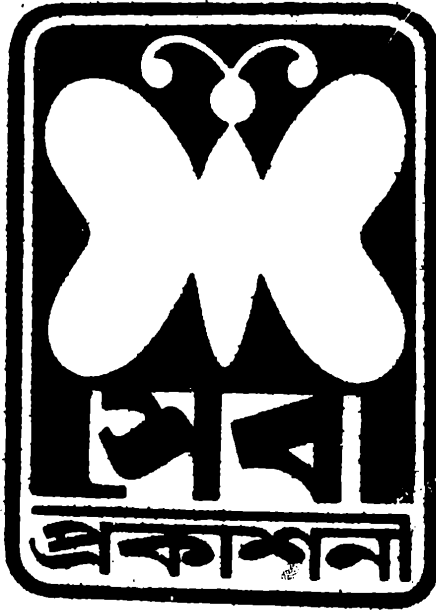
ISBN 984 16 1373 5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: টিপু কিবরিয়া

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-28
TIN GOYENDA SERIES
By Rakib Hassan

চুয়াল্লিশ টাকা

তি. গো. ভ. ১/১[তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ১/২[ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ২/১[প্রেতসাধনা, চক্তচক্ষু, সাগরসৈকত] ৩২/-
তি. গো. ভ. ২/২[জলদস্যুর দ্বীপ, ১, ২ সবুজ ভূত] ২৮/-
তি. গো. ভ. ৩/১[হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি] ৩০/-
তি. গো. ভ. ৩/২[কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি] ৩০/-
তি. গো. ভ. ৪/১[ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য, ১, ২]
তি. গো. ভ. ৪/২[ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব]
তি. গো. ভ. ৫ [ভীতুসিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল] ৩০/-
তি. গো. ভ. ৬ [মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর] ২৮/-
তি. গো. ভ. ৭ [পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ] ৩০/-
তি. গো. ভ. ৮ [আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ] ৩০/-
তি. গো. ভ. ৯ [পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল] ৩২/-
তি. গো. ভ. ১০[বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১] ৩২/-
তি. গো. ভ. ১১[অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো] ৩০/-
তি. গো. ভ. ১২[প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া] ৩৪/-
তি. গো. ভ. ১৩[ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু] ২৮/-
তি. গো. ভ. ১৪[পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন] ৩৪/-
তি. গো. ভ. ১৫[পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ১৬[প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ১৭[ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ] ৩২/-
তি. গো. ভ. ১৮[খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড] ৩২/-
তি. গো. ভ. ১৯[বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্থানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া] ৩২/-
তি. গো. ভ. ২০[খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ] ৩২/-
তি. গো. ভ. ২১[ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার] ৩৭/-
তি. গো. ভ. ২২[চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সঙ্কেত] ৩৩/-
তি. গো. ভ. ২৩[পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ২৪[অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ] ৩৩/-
তি. গো. ভ. ২৫[জিনার সেই দ্বীপ, কুকুর খেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী] ৩৫/-
তি. গো. ভ. ২৬[ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে] ৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৭[ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি] ৩৬/-

---
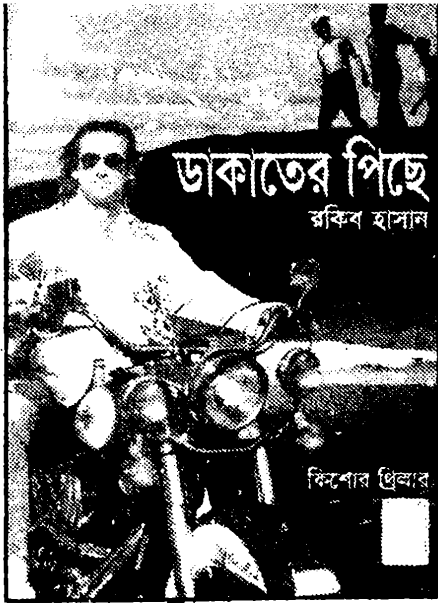
ডাকাতের পিছে

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৫

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা। দড়াম করে বন্ধ হলো। গটমট করে ভেতরে ঢুকলেন মিসেস আমান। চোয়াল কঠিন। ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট চেপে বসা। হ্যান্ডব্যাগটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে।

'আর সহ্য হয় না এই অত্যাচার!' কপাল চাপড়ে বললেন তিনি। 'ইচ্ছে করছে গুলি করে শেষ করে দিই! তারপর আমার জেল-ফাঁসি যা হয় হোক!'

'কি হয়েছে, মা?' শঙ্কিত হয়ে উঠেছে মুসা।

'কি আর! তোর নানা! আবার একটা অঘটন ঘটিয়েছে!'

'আবার কি করল?'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে প্রথমে মুসার দিকে তাকালেন মিসেস আমান। তারপর একে একে তার দুই বন্ধু কিশোর আর রবিনের দিকে। ডাইনিং টেবিলে বসে বিস্কুট খাচ্ছে ওরা।

'পানি ছিটানোর জন্যে একটা ফোয়ারা বসিয়ে দিয়ে এসেছে গির্জার হলরুমে। নতুন ধরনের একটা স্প্রিঙ্কলার সিসটেম। ঘর ধোয়ার জন্যে। ভালমানুষী করে দান করেছে। করেছে, ভাল কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের আরও একখান আবিষ্কার লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। ফোয়ারা চালু করার একটা যন্ত্র। সুইচ টিপলে হালকা ধোঁয়া তৈরি করে যন্ত্রটা, সেই ধোঁয়া গিয়ে লাগে সিসটেমে, চালু হয়ে যায়। তাতেই হয়েছে সর্বনাশ। হলঘরটা ভাড়া নিয়ে মহিলারা ফ্যাশন শো করছিল। এই সময় জ্বালানো সিগারেট নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়লেন পাদ্রী সাহেব। ব্যস, কোন দিক থেকে যে কি ঘটে গেল, ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল ঘরের সমস্ত লোক। ফ্যাশন শো মাথায় উঠল। মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসেছে কোম্পানি। টাকাটা বাবাকে দিতে হবে। হুমকি দিয়েছে, নইলে কেস করে দেবে তার নামে। বাজারে গিয়েছিলাম। মিসেস গিলবার্ট আমাকে এ খবর জানাল। কেন বাপু, দুনিয়ায় এত জিনিস থাকতে ধোঁয়াকে ট্রিগার করার কুবুদ্ধি কেন? আর কি কিছু ছিল না?'

হাসি দমন করার অনেক চেষ্টা করেও পারল না মুসা। বলল, 'নানা হয়তো ভেবেছিল এখন দুনিয়া জুড়ে সিগারেট বিরোধী আন্দোলন চলছে, ধোঁয়া কোন সমস্যা নয়। তা ছাড়া গির্জার ভেতর তো কেউ সিগারেট খায় না। স্বয়ং পাদ্রী সাহেবই যে এই কাণ্ডটা করে বসবেন, তা কি আর নানা ভেবেছিল।'

'দেখ, অত হাসবি না! গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা কর!' ধমকে উঠলেন মিসেস

আমান। কিন্তু বেশিক্ষণ তিনিও গম্ভীর থাকতে পারলেন না। ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। আর ঠেকানো গেল না ছেলেদের। হাসির রোল পড়ে গেল।

কিশোর বলল, 'কাজটা তিনি ভালই করতে গিয়েছিলেন। দোষটা তো পাদ্রী সাহেবের।'

'মোটেও তা নয়,' আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন মিসেস আমান। 'দোষটা আমার বাবারই। অত সেনসিটিভ একটা ট্রিগার কেন বানাতে গেল? আর সেটা বসাতেই বা গেল কেন ওরকম একটা জায়গায়, যেখানে পাবলিক মীটিঙ চলে? প্রার্থনার সময় কেউ খায় না বটে, কিন্তু অন্য অনুষ্ঠান চলার সময় যে কেউ সিগারেট খেতে পারে ওখানে। সরকারী চাকরিতে যতদিন ছিল, ভাল ছিল। অকাজ করার সময় পেত না তখন। রিটায়ার করার পরই ধরেছে ভূতে। খালি আবিষ্কারের চিন্তা। উদ্ভট সব ভাবনা মাথায় ঘোরে। একবার বানাল তেরপলের ছাতওয়ালা একটা বাড়ি। ভাঁজ করে সরিয়ে রাখা যায় ওই ছাত। কিন্তু তার নিচে আর বাস করার সাধ্য হলো না কারও। টানা-হেঁচড়ায় এত ছিদ্র হয়ে গেল, বাইরে বৃষ্টি পড়ার আগেই ভেতরে পড়ে।'

আবার একচোট হাসাহাসির পর মিসেস আমান বললেন, 'আরও কত কাণ্ড যে করেছে, যদি জানতে! সারাজীবনে জরিমানা যা দিয়েছে, সেগুলো জমিয়ে রাখতে পারলে এখন বড়লোক থাকতাম আমরা। বাবা ভীষণ বদমেজাজী। কথায় কথায় লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, হাতাহাতি করতেও ছাড়ে না। আমাদের বাড়ির সামনে একটা এলম গাছ আছে। কি নাকি রোগ হয়েছে ওটার; রেখে দিলে আশপাশের অন্য গাছেরও হতে পারে এই ভয়ে একদিন পার্ক ডিপার্টমেন্টের লোকেরা এসে সেটা কাটতে চাইল। বেঁকে বসল বাবা। কিছুতেই কাটতে দেবে না। কথা কাটাকাটি হতে হতে একসময় ঘর থেকে গিয়ে হকি স্টিক নিয়ে এল। এলোপাতাড়ি পেটানো শুরু করল। পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরে দিল বাবাকে। উকিলের পেছনে অনেক টাকা খরচ করে শেষে বের করে আনা হলো। মোটা টাকা জরিমানা তো করলেনই জজ সাহেব, শাসিয়েও দিলেন, ফের এ রকম করলে জেল-জরিমানা কোনটাই আর মাপ হবে না।'

চুপ করে দম নিলেন মিসেস আমান। তারপর বললেন, 'এখন ধরেছে নিউ ইয়র্ক যাবার বাতিক!'

'খাইছে!' হাসি চলে গেল মুসার মুখ থেকে। 'রকি বীচ থেকে নাকি আর কোথাও নড়বে না?'

'একেবারে যাচ্ছে না তো। একটা বিশেষ কাজে যেতে চায়। তার মতে কাজটা খুবই জরুরী। কি একটা আবিষ্কার করেছে। জিনিসটা কি, এ ব্যাপারে কোন ধারণা দিতেও নারাজ। নিউ ইয়র্ক যাওয়া ছাড়া নাকি ওটার গতি করা যাবে না। অনেক ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি—না গিয়ে কিছু করা যায় কিনা, শোনে না। বলে টেলিফোন কিংবা চিঠিতে কাজ হবে না, নিজেকেই যেতে হবে। সামনাসামনি প্রচুর আলোচনার দরকার।'

'গেলে যাক না। অসুবিধেটা কি?'

'অসুবিধে আছে। কার কাছে যাচ্ছে, কিছু জানি না। যাওয়ার পর সেই লোক যদি দেখা করতে রাজি না হয়? যদি কাউকে দিয়ে বলিয়ে দেয়—বাড়ি যান, চিঠিতে যোগাযোগ করুনগে? কাণ্ডটা কি করবে জানিস না? জোর করে ঢোকার চেষ্টা করবে!'

'দূর, বেশি বেশি দুশ্চিন্তা করছ তুমি।'

'দেখ, আমার বাপকে আমি চিনি! না শব্দটা শুনতে রাজি নয় বাবা। তার হলো বদমেজাজ। যার কাছে যাচ্ছে যদি সে দেখা করেও, বাবার ধারণার সঙ্গে একমত হতে না পারে, তাহলেও যাবে রেগে। তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারে।'

'মা, তুমি শুধু শুধু...'

মুসার কথায় কান দিলেন না মিসেস আমান। 'আমি জানি এইই ঘটবে! খেপে গিয়ে অনর্থ ঘটাবে বাবা। ওরা তখন পুলিশ ডাকবে। মনে নেই, সৌরশক্তির সাহায্যে পানি ফুটানোর যন্ত্র আবিষ্কার করে কি গোলমালটাই না পাকিয়েছিল? ঘরের আর্দ্রতা দূর করার যন্ত্র নিয়েও একই অবস্থা। যন্ত্রটা ঠিকমতই কাজ করছিল, ভাঁজ করা ছাতের মত হয়নি। তবে বাবার আগেই নাকি ওই যন্ত্র আবিষ্কার করে বসেছিল আরেকজন। বাবা গেল খেপে। বলে বেড়াতে লাগল, তার ফর্মুলা চুরি করেছে ওই লোক। ভাবো একবার! সেই লোক থাকে আইওয়ায়। কোথায় রকি বীচ আর কোথায় আইওয়া। এত দূরে বসে কি করে চুরিটা করল? এ সব ফালতু কথা বলার কোন মানে আছে? সেই লোকের কানে গেলে নির্ঘাত কেস ঠুকে বসত, দিত মানহানির মামলা করে।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। বিস্কুট খাওয়া ভুলে গেছে।

মিসেস আমান বললেন, 'বুঝতে পারছি না, রওনা হয়েই না আরেকটা অঘটন ঘটিয়ে দেয়!'

'দেবে না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মুসা। 'অর্থাৎ তাকে করতে দেয়া হবে না। তুমি কিচ্ছু ভেব না, মা। আমরা পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে প্লেনে তুলে দিয়ে আসব।'

'প্লেনে গেলে তো! ঠিক করেছে, মোটরগাড়িতে যাবে। নিজে গাড়ি চালিয়ে। মনটানার ভেতর দিয়ে নাকি যায়নি কখনও। ওরিগন আর ওয়াশিংটনও দেখেনি। এবার সব দেখতে চায়। আরও যুক্তি আছে, গাড়ি চালানোর সময় নাকি তার মগজ সবচেয়ে বেশি কাজ করে। তার বিশ্বাস, সাংঘাতিক কোন আবিষ্কারও করে বসতে পারে ওই সময়! এ সুযোগ কোনোমতেই হারাতে রাজি নয়।'

হেসে ফেলল মুসা। 'মা, এতই যখন দুশ্চিন্তা, নানার সঙ্গে তুমিও চলে যাও না কেন? ঘর নিয়ে ভেব না। আমি আর বাবা মিলে সামলে নিতে পারব।'

'আমি! মাথা খারাপ! ভাল করেই জানিস, বাবার সঙ্গে দশটা সেকেন্ডও বনে না আমার! গাড়িতেই খুনোখুনি বেধে যাবে! তার চেয়ে এক কাজ কর, তুইই চলে যা। বেড়াতে খারাপ লাগবে না।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'মা, সত্যি বলছ!'

'বলছি। যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করব। তবে একটা শর্ত আছে—বাবাকে সব গোলমাল থেকে দূরে রাখতে হবে। পুলিশ তাকে ধরবে না, সে কারও মাথা ফাটাবে না, তুই সব ঠেকাবি।'

'আমার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করব। কিন্তু নানাকে একা সামলানো...'

'খুব কঠিন, এই তো? আমিও সেটা জানি। সে-জন্যেই ভাবছি, আরেক কাজ করা যেতে পারে—তোরা তিনজনেই চলে যা।' ঘোষণা করলেন তিনি, 'তিন গোয়েন্দাকে ভাড়া করতে রাজি আছি। প্রয়োজনে খরচাপাতিও দেব। আমার বাবাকে পাহারা দিয়ে নিরাপদে নিউ ইয়র্ক পৌঁছে দিতে হবে। সেখানেও তার নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রাখতে হবে।'

হাসল কিশোর। চকলেট মেশানো বড় একটা বিস্কুটের আধখানা কামড়ে কেটে নিয়ে বলল, 'কিন্তু, আন্টি, আমরা গোয়েন্দা, বডিগার্ড নই।'

'তা ঠিক, গোয়েন্দা আর বডিগার্ড এক নয়,' মেনে নিলেন মিসেস আমান। 'কিন্তু গোয়েন্দারা আর কোন কাজ করতে পারবে না, এমনও কোন বিধিনিষেধ নেই। বডিগার্ডই ভাবছ কেন? বেড়াতে যাচ্ছ, সেই সময়ে একজন লোকের কিছুটা খেয়াল রাখছ, এই তো। বিনিময়ে বেড়ানোর খরচটা পাবে।'

'বডিগার্ডের চেয়ে খারাপ,' ফোড়ন কাটল মুসা, 'মানুষের কেয়ারটেকার। তবে গাড়িতে করে নিউ ইয়র্ক যাওয়া সত্যি লোভনীয়। এ দিক বিবেচনা করে যে কোন কাজ করতে রাজি আছি আমি।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'কি বলো?'

কিশোর তাকাল রবিনের দিকে। নথি-গবেষকের মতামত চায়।

'আমি রাজি,' বলে দিল রবিন। 'মুসার নানা আমাদেরও নানা। তাঁর কেয়ারটেকার হতে আপত্তি নেই আমার।'

'কিন্তু নানাটা কি জিনিস ভাবতে হবে!' চিন্তায় পড়ে গেছে মুসা। 'বেরিয়ে না শেষে পস্তাতে হয়!'

'কেন?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'নানার কেয়ারটেকার হওয়ার চেয়ে খেপা গণ্ডারের কেয়ারটেকার হওয়া অনেক সহজ। সব কিছুতে সন্দেহ। মেজাজের ঠিকঠিকানা নেই। এই ভাল তো এই খারাপ। প্রতি মুহূর্তে কত আর সামলানো যায়!'

'তা বটে,' একমত হলেন মা। 'বাবার ধারণা, তার মত সৃষ্টিশীল মানুষদের পেছনে সব সময় লোক লেগে থাকে—বলে, পাগল, মাথায় ছিট। আড়চোখে তাকায়, ব্যঙ্গ করে, উল্টোপাল্টা কথা বলে। রেগে গিয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধালে দোষ দেয়া যায় না। আরেক ধরনের লোক আছে, তারাও পিছে লাগে, তারা আবিষ্কারের ফর্মুলা ছিনিয়ে নিতে চায়। সেজন্যেই এত সন্দেহ...'

টেলিফোন বাজল।

সেদিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন মিসেস আমান। 'কে আবার করল?'

উঠে দাঁড়াল মুসা। 'তুমি বসো। আমি ধরছি।'

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে 'হালো' বলল সে। নীরবে শুনতে লাগল ওপাশের কথা। তারপর বলল, 'মাকে বলছি!'

রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'মা, মিস্টার পেইত্রি। নানার বাড়ির উল্টোদিকে যাঁর বাড়ি। আজ নাকি নানার সঙ্গে তাঁর দাবা খেলার কথা ছিল। গিয়ে দেখেন নানা নেই। সারা বাড়ি খুঁজেছেন, কোথাও পাননি। পেছনের দরজা খোলা। রান্নাঘরে সিঙ্কের কল খোলা, পানি পড়ছে। এখুনি পুলিশকে খবর দিতে বললেন।'

'হয়তো ঘুরতে বেরিয়েছে। চলে আসবে। এত তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দেয়ার দরকার নেই।'

'মা, গাড়িটা নাকি ড্রাইভওয়েতেই আছে। হাঁটতে গেলেও কি দরজা খোলা রেখে যেত? কলই বা খোলা কেন?'

'হুঁ! তা-ও কথা! চল, যাই!'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আপনার যাওয়া লাগবে না, আন্টি, আগে আমরাই যাই। তিন গোয়েন্দার আসল কাজ পাওয়া গেছে, রহস্য। দরকার হলে আপনাকে ফোন করব।'

দুই

মিস্টার রাবাতের বাড়ির সামনে পায়চারি করছেন মিস্টার পেইত্রি। রোগাটে শরীর, চুলের অনেকখানি ধূসর হয়ে এসেছে, মুখের বাদামী চামড়া কুঁচকানো। বসন্তের এই উজ্জ্বল আলোকিত দিনেও মুখ বাদলের মেঘলা আকাশের মত অন্ধকার।

মুসাকে বললেন, 'তোমার নানার স্বভাবের সঙ্গে একেবারেই মেলে না! দাবা খেলার কথা দিয়ে কখনও মিস করেনি। তা ছাড়া আগের খেলায় হেরে গিয়ে খেপে আছে আমাকে হারানোর জন্যে। কোন ব্যাপারেই হার সহ্য করতে পারে না সে।'

'জানি,' পেইত্রির সঙ্গে মুসাও একমত।

সামনের দরজায় তালা নেই। ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। পেছন পেছন এলেন পেইত্রি। 'নিশ্চয় খারাপ কিছু ঘটেছে! এ ভাবে দরজা খুলে, কল ছেড়ে রেখে দূরে যাওয়ার কথা নয়। কোন কারণে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছে। হয়তো এমন কিছু চোখে পড়েছিল, কল বন্ধ করার কথাও মনে ছিল না।'

রান্নাঘরে ঢুকল গোয়েন্দারা।

সিঙ্কের ওপরে কলটার দিকে তাকাল কিশোর। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, তার প্রশ্নের জবাব চাইছে ওটার কাছে। বিড়বিড় করে বলল, 'পানি গরম করতে যাচ্ছিলেন। কেটলির ঢাকনা খোলা। সিঙ্ক থেকে পানি নেয়ার সময় জানালা দিয়ে সত্যি কিছু চোখে পড়েছিল তাঁর? কি?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। ভাবছে, কি দেখেছিলেন রাবাত? লনের একটা অংশ চোখে পড়ছে। তার ওপারে সুন্দর করে ছাঁটা পাতাবাহারের বেড়া আলাদা করে দিয়েছে পাশের বাড়ির সীমানাকে। এ পাশটা যেমন পরিচ্ছন্ন, ওপাশটা তেমনি নোংরা। আগাছা হয়ে আছে, কেউ কাটে না। বাড়িটাও মেরামত হয় না কতদিন কে জানে। দরজার পাল্লা আর জানালার ফ্রেমের রঙ মলিন হয়ে গেছে, উঠে গেছে অনেক জায়গায়। ছাতের অবস্থা আরও খারাপ। বাড়ি ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছে নাকি বাড়ির মালিক? নাহলে এত অযত্ন কেন?

'ওটা কার বাড়ি?' পেইত্রিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যারিস মিলারের।'

হাত নেড়ে মুসা বলল, 'নানা ওখানে যায়নি। ছায়া দেখতে পারে না একজন আরেকজনের। দেখলেই ঝগড়া।'

'কিন্তু কেউ একজন গেছে ওই পাতাবাহারের বেড়া ফাঁক করে। দেখো, ডাল ভেঙে আছে। ভাঙা গোড়াটা এখনও সাদা, তারমানে গেছে যে বেশি দেরিও হয়নি।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে উঠান দিয়ে বেড়ার দিকে এগোল ওরা।

বিড়বিড় করে নিজেকেই বোঝাল যেন কিশোর, 'বেড়াটা বেশি উঁচু না। মিস্টার রাবাতের পক্ষে ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাঁর পায়ে লেগেই ডালগুলো ভেঙে থাকতে পারে।'

গুঙিয়ে উঠলেন পেইত্রি। 'আবারও ঢুকল! আগের বার কি কাণ্ডটাই না করল! গুলি করার জন্যে বন্দুক বের করে ফেলেছিল মিলার। পাশের বাড়ির মিসেস ডনিগান পুলিশকে ফোন না করলে খুনই হয়ে যেত একটা। পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে রাবাত—মিলার নাকি তার ঘাস কাটার মেশিন চুরি করেছে। আর মিলার বলেছে, রাবাত তার গ্যারেজের তালা ভেঙে ঢুকেছে। পুলিশ একটা মিটমাট করে দিয়ে গেছে বটে, তবে তাতে কোনই সমাধান হয়নি। শত্রুতা বন্ধ হয়নি দু'জনের। হবেও না।'

'তাই নাকি!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আবারও ঢুকে থাকলে তো খুব খারাপ কাজ করেছেন। ধরে আনা দরকার।'

'গেলে তো আনবে।'

'দেখি গিয়ে।'

বেড়া ডিঙানোর সময় আরও কয়েকটা ডাল ভাঙল কিশোর। তার সঙ্গী হলো মুসা আর রবিন। দ্বিধা করতে লাগলেন পেইত্রি। তবে শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে তিনিও ঢুকলেন মিলারের বাড়িতে।

অনেক ঘুরে পুরানো বিল্ডিঙটার দিকে এগোল চারজনে।

বেশি দূর যেতে হলো না। বাড়ি ছাড়িয়ে একটা গ্যারেজ, তার ওপাশে কাঁচ আর কাঠের তৈরি একটা গ্রীনহাউস। বাড়িটার মত অবহেলার শিকার নয় এটা। কাঠের ফ্রেমগুলোতে নতুন সাদা রঙ করা। দেয়াল আর ছাতের কাঁচগুলোও পরিষ্কার, তবে কুয়াশা পড়েই বোধহয় ঘোলা হয়ে আছে।

হঠাৎ গ্রীনহাউসের আরেক প্রান্ত থেকে দরাজ গলায় ছড়া গান শোনা গেল:

এবার তুমি কোথায় যাবে,
পাজির রাজা মিলার?
ঘাড়টি তোমার মটকে দেবে,
পুলিশ ক্যাপ্টেন ফ্লেচার!

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'নানা!'

কথা শুনে ওপাশ থেকে প্রশ্ন হলো, 'কে?' গ্রীনহাউসের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলেন রাবাত। লম্বা, ছিপছিপে শরীর। বয়েসের তুলনায় অনেক শক্ত-সমর্থ এখনও। মুসার চুলের মতই খুলি কামড়ে আছে কুঁচকানো তারের মত কোঁকড়া চুল। তবে অত কালো নয়, বয়েসের রঙ লেগেছে তাতে, ধূসর হয়ে গেছে। ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে বললেন, 'আরি, তুই, মুসা! ও, তোমরাও এসেছ,' রবিন আর কিশোরকে বললেন। 'পেইত্রি, মাপ করে দাও, ভাই। তোমার সঙ্গে দাবা খেলার কথা ছিল। দাঁড় করিয়ে রাখলাম।'

'দাঁড় করিয়ে রেখেছ তাতে কিছু মনে করছি না, কিন্তু ভয়টা পাওয়ালে কেন? আর কিছুক্ষণ না দেখলে পুলিশকে ফোন করতাম। তোমার মেয়েই দেরি করতে বলল। এখানে মরতে এলে কেন? আগের বারে আক্কেল হয়নি?'

'মরতে নয় মরতে নয়, মারতে,' হাসিমুখে জবাব দিলেন রাবাত, 'মিলারকে।' হাতের পেন্সিল কাটার ছুরিটা দেখালেন, 'এটা দিয়ে।'

'সর্বনাশ! খুন করতে এসেছিলে!'

মাথা নাড়লেন রাবাত, 'না, গ্রীনহাউসের তালা খুলতে। জানালা দিয়ে দেখলাম, ও বেরিয়ে যাচ্ছে। সুযোগটা ছাড়লাম না।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে নানার দিকে তাকাল মুসা। মিলারকে খুন করার সঙ্গে গ্রীনহাউসের তালা খোলার কি সম্পর্ক, বুঝতে পারল না। ভাবল, নানার মাথাটা বোধহয় পুরোপুরিই গেছে। 'গ্রীনহাউস খুলতে গেছিলে কেন?'

'দেখে আয় উঁকি দিয়ে। তাহলেই বুঝবি।'

গ্রীনহাউসে আর কি থাকবে? শাকসব্জি নয়তো অন্য কোন ধরনের উদ্ভিদ। দেখার আগ্রহ হলো না মুসার। 'যা-ই বলো, নানা, মিস্টার মিলার ইচ্ছে করলে এখন তোমাকে হাজতে পাঠাতে পারেন—চুরি করে তার বাড়িতে ঢুকে তালা ভাঙার অপরাধে।'

'কচু করবে! আমি কিচ্ছু ভাঙিনি। দরজাটা খোলার চেষ্টা করেছি কেবল, আমার জিনিসটা বের করে নেয়ার জন্যে। ওই টিনটা দেখেছিস? ওতে ম্যালাথিয়ন আছে। গত হপ্তায় বেকারের দোকান থেকে কিনেছিলাম। আমার চীনা এলম গাছটাতে স্প্রে করার জন্যে। হঠাৎ দেখি টিন গায়েব। আরও

একটা জিনিস নেই, একটা কর্নিক। ওই যে, গ্রীনহাউসের মধ্যে পড়ে আছে। আমারটাই। পুলিশের কাছে গিয়ে এখন বললে কোমরে রশি বেঁধে নিয়ে যাবে না! আগের বার চুরি করেছিল ঘাস কাটার যন্ত্র, এবার করেছে কর্নিক আর পোকা মারার ওষুধ। এ সব কেনার টাকা তার যথেষ্ট আছে, শয়তানটা করে শুধু আমাকে খেপানোর জন্যে। আমার কাজে অসুবিধা হতে দেখলে মজা পায়। অত্তবড় শয়তান, অথচ অর্কিড ক্লাবে গিয়ে কি ভালমানুষটিই না সেজে থাকে! আহাহা, যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না! বাড়ির বাগানে ঘাস হয়ে থাকে আধহাত লম্বা, কাটার নাম নেই, ওদিকে সারাদিন গ্রীনহাউসে পড়ে থেকে অর্কিড জন্মায়। ছাগল আর কাকে বলে!'

ঘাস না কেটে অর্কিড জন্মালে দোষটা কোথায়, ছাগল হয় কি করে, সেটাও মাথায় ঢুকল না মুসার। নানার মাথার স্থিরতা সম্পর্কে সন্দেহ আরও বাড়ল। বলল, 'নানা, ওগুলো তোমার জিনিস কি করে বুঝলে?'

রেগে উঠলেন রাবাত, 'তোর মত গাধা নাকি আমি নিজের জিনিস চিনব না! ছাউনিতে ঢুকে দেখি জিনিসগুলো নেই। তারপর দেখি পাতাবাহারের ডাল ভাঙা। মগজটা এখনও এত বুড়ো হয়নি যে কি ঘটেছে বুঝতে পারব না!'

মিলারের ড্রাইভওয়েতে গাড়ির শব্দ হলো। থামল গাড়িটা। শঙ্কিত হলেন পেইত্রি। রাবাতের হাত ধরে টানলেন, 'ওই বুঝি এলো! চলো, চলে যাই!'

ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলেন রাবাত। 'যাব কেন? ওর মত চোর নাকি? আমার জিনিস না নিয়ে যাব না!'

গ্যারেজের কোণ ঘুরে বেরিয়ে এল গাট্টাগোট্টা এক লোক। ঘন পুরু ভুরুর নিচে কোটরে বসা চোখে যেন আগুন জ্বলছে।

তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন রাবাত, 'হ্যারিস মিলার, আবার চুরি করেছ তুমি! গ্রীনহাউসে আছে। জলদি বের করে দাও! ম্যালাথিয়নের টিন আর কর্নিকটা আমার!'

'কি প্রমাণ আছে তার?' সমান তেজে জবাব দিলেন মিলার। 'তুমি বেরোও আমার বাড়ি থেকে, নইলে পুলিশ ডাকব!'

চাপ দিয়ে কটাত্ করে ছুরির ফলা বন্ধ করে ফেললেন রাবাত। বন্ধ ছুরির মাথা মিলারের দিকে তুলে ধরে শাসালেন, 'প্রমাণ, না? আবার যেয়ো চুরি করতে! বুঝবে মজা! এখন থেকে তক্কে তক্কে থাকব আমি। খালি ধরতে পারলে হয় একবার! ঘাস কাটার যন্ত্র দিয়ে তোমার চুল ছেঁটে না দিয়েছি তো আমার নাম রাবাত নয়!'

'আরে যাও যাও, যা পারো কোরো!' এখন বেরোও! নইলে...'

'কি করবে?' কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন রাবাত। 'কি করবে? চোর কোথাকার! চুরি তো চুরি, আবার সিনাজুড়ি!'

মিলারের চোখে ভয়ের ছায়া দেখতে পেল কিশোর। বুঝল, মুখে যতই বড় বড় কথা বলুক, রাবাতকে ভয় পায় সে। অবশ্য সেজন্যে মিলারকে দোষ দেয়া যায় না। খেপা মোষ বা গণ্ডারকে কে না ভয় পায়।

মারামারি বেধে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি নানার হাত ধরে টান দিল মুসা,

'নানা, দোহাই তোমার, থামো! এসো, যাই!'

ঝাড়া দিয়ে আবার হাত ছুটিয়ে নিলেন রাবাত, 'এই, সর্, কথার মাঝখানে কথা বলতে আসবি না!'

মুসাও দমল না। 'তুমি আসবে, না মাকে ফোন করব?'

ঝাঝিয়ে উঠলেন রাবাত। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, করগে না! তোর মাকে কি আমি ডরাই!' তবে আর দাঁড়ালেন না তিনি। গটমট করে গ্রীনহাউসের কাছ থেকে সরে এসে বেড়ার দিকে এগোলেন। পিছু নিল তিন গোয়েন্দা।

পেইত্রি রয়েছেন সবার পেছনে। দুর্বল ভঙ্গিতে হাঁটছেন। খুনোখুনির ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। 'যা কাণ্ড করো না, তোমার কাছে আসাই বাদ দিতে হবে!' অনুযোগ করলেন তিনি। 'আমি বলে দিলাম, এ রকম চলতে থাকলে খুনের দায়ে জেলে যাবে একদিন!'

'আমি কি ইচ্ছে করে করি নাকি? আশেপাশে বদ লোক থাকলে এ-ই হবে!' পাতাবাহারের বেড়া ডিঙিয়ে নিজের সীমানায় ঢুকলেন রাবাত। 'তাই তো বলি, একটা পড়শী-প্রতিরোধ সংগঠন করা উচিত আমাদের। তাহলে ভোটাভোটির মাধ্যমে ঠিক করা যাবে, কাকে রাখব, কাকে নয়।'

'তখন তোমাকে নিয়েও ভোট হতে পারে,' মুখের ওপর বলে দিলেন পেইত্রি। 'নিজেকে অত ভাল ভাবার কোন কারণ নেই। ভোট দিয়ে তোমাকেও তাড়াতে পারে!'

'বাজে বোকো না!' গজগজ করে বললেন রাবাত। 'খেললে এসো, নইলে ভাগো! অহেতুক সময় নষ্ট কোরো না!'

কেটলিতে ফুঁসা বাষ্পের ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরোল পেইত্রির নাক থেকে। তবে চলে গেলেন না। রাবাতের পিছু পিছু লিভিং রুমে ঢুকলেন।

রান্নাঘরে রাখা টেলিফোনের দিকে এগোল মুসা। রিসিভার তুলে বাড়ির নম্বরে ডায়াল করল।

মাকে উৎকণ্ঠা মুক্ত করে রিসিভার রেখে দিল সে। কিশোরের দিকে তাকাল। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝলে? যাবে নানার সঙ্গে? তাকে সামলানো সম্ভব?'

সন্দেহ ফুটল কিশোরের চোখে। তারপর উজ্জ্বল হলো। হেসে বলল, 'সহজ হবে না কাজটা। তবে একঘেয়েমিতে ভুগতে হবে না আমাদের, এটা বলতে পারি।'

তিন

পরের হপ্তায় বাবাকে বাড়িতে দাওয়াত করলেন মিসেস আমান। বাবার পছন্দের সমস্ত খাবার তৈরি করে তাঁর সামনে দিলেন। কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বাবাকে পটানোর চেষ্টা করলেন। মুসা, কিশোর আর রবিন তাঁর

সঙ্গে নিউ ইয়র্কে বেড়াতে গেলে যে মন্দ হয় না ইনিয়ে বিনিয়ে বললেন সে-কথা। বোঝালেন, ওদের জন্যে এটাকে শিক্ষা সফর হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে।

ওপরে পুরু করে মাখনের স্তর দেয়া চকোলেট কেকে বড় বড় কামড় বসাচ্ছেন রাবাত। কথা বলতে অসুবিধে। ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকালেন।

'অমন করো কেন, বাবা?' কণ্ঠস্বর আরও কোমল করলেন মিসেস আমান। 'ছোটদের জন্যে বেড়ানো একটা বিরাট শিক্ষা, তুমিই তো বলতে আমাকে। বই পড়ে এ জ্ঞান অর্জন করা যায় না। আমাকে নিয়ে যেতে। সবচেয়ে মনে পড়ে কার্লসব্যাড ক্যাভার্নে বেড়াতে যাওয়ার কথা। কি যে ভাল লাগে ভাবতে! আমার সঙ্গে, মা'র সঙ্গে কত ভাল ব্যবহার করতে তুমি, মনে আছে, বাবা? মা মারা যাওয়ার পরই তুমি গেলে বদলে। সেই আগের তুমি আর এখনকার তুমিতে যে কত তফাৎ, যদি বুঝতে! তখন তোমাকে ঋষি মনে হত আমার, বাবা, আর এখন...'

'পাগল!'

'না না, তা নয়!' তাড়াতাড়ি বললেন মিসেস আমান। 'তবে মেজাজটা যে তোমার ভাল থাকে না, এটা ঠিক। শোনো, বাবা, আমার একটা কথা রাখো, ওদেরকে তুমি নিয়ে যাও। আমি কথা দিতে পারি, ওরা তোমার বিরক্তির কারণ হবে না। খুব ভাল ছেলে ওরা। দায়িত্বশীল।'

নীরবে কেক খাওয়া শেষ করলেন রাবাত। কফির কাপে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন। চিনি হয়নি। আরও এক চামচ চিনি মেশালেন। তারপর তাকালেন মেয়ের দিকে।

কুঁকড়ে গেলেন মিসেস আমান। ওই দৃষ্টি তাঁর চেনা। কারও মনের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নেয়ার ক্ষমতা আছে ওই দৃষ্টির। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন তিনি।

'তোর ধারণা দারোয়ান দরকার আমার?' রাবাত বললেন, 'দারোয়ান তুই ভালই জোগাড় করেছিস, নাক টিপলে এখনও দুধ বেরোয়! আমাকে কি পাহারা দেবে ওরা?'

'সে কি আমি জানি না? বিশ্বাস করো, পাহারা দেয়ার জন্যে ওদেরকে সঙ্গে দিচ্ছি না, বাবা। বরং ওদের দেখেশুনে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই তোমার সঙ্গে দিতে চাইছি। গাড়িতে করে সেই নিউ ইয়র্ক যাওয়া, আমারই লোভ হচ্ছে! সংসারের ঝামেলা না থাকলে...'

হাত নেড়ে মেয়েকে থামিয়ে দিলেন রাবাত। কাটা কাটা স্বরে বললেন, 'থাক, অত কথা বলতে হবে না! আমি বুঝে গেছি!'

মিস্টার আমানের দিকে ফিরলেন তিনি।

একেবারে চুপ করে আছেন মুসার বাবা। শ্বশুরের সঙ্গে তর্ক করতে রীতিমত ভয় পান। তর্কটা শুধু তর্কে সীমাবদ্ধ থাকলে এতটা পেতেন না, কিন্তু লড়াই বেধে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেজন্যে পারত পক্ষে কথা বলতে চান

না শ্বশুরের সঙ্গে, এড়িয়ে চলেন।
'এই মিয়া, তোমার কি বক্তব্য?' জামাইকে প্রশ্ন করলেন রাবাত। 'দারোয়ান দরকার আছে আমার?'
সেরেছে রে! এই ভয়টাই তিনি করছিলেন, তাঁকে না কোন প্রশ্ন করে বসেন। বড় করে ঢোক গিললেন। লম্বা দম নিলেন। সাবধানে শব্দ বাছাই করে বললেন, 'না না, দারোয়ান লাগবে কেন! তবে মাঝেমধ্যে সবারই কমবেশি অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়...'
'আমার হয় না!' কর্কশ কণ্ঠে বললেন রাবাত। 'তোমরা ভাবছ রাস্তায় গণ্ডগোল করে আমি জেলে যাব, সেটা ঠেকাবে তোমাদের দারোয়ানেরা! তোমাদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, রোজই একবার করে জেলে যাই আমি। অ্যারেস্ট হয়েছিলাম যে সে-কথা মনে করিয়ে দিতে চাও। কিন্তু কেন গিয়েছিলাম? নিজের গাছ বাঁচাতে প্রতিবাদ করতে গিয়ে। একে তুমি মারামারি বলতে পারো না। ধরো এখন তোমার সামনে থেকে জোর করে এই টেলিভিশনটা কেউ তুলে নিয়ে যেতে চাইল, বাধা দেবে না? সেই বাধাটাই আমি দিয়েছিলাম। পুরো দোষটা ছিল পার্ক ডিপার্টমেন্টের। আমার গাছ পোকায় খেয়ে মারুক, না ঝড়ে উড়ে যাক, তাতে ওদের কি? সেটাই বলতে গিয়েছিলাম। তাতে আমি হয়ে গেলাম পাগল, বদ্ধ উন্মাদ!'
শ্বশুড়ের মারমুখো মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেলেন আমান। চুপ করে রইলেন। এখন তর্ক করতে যাওয়ার ফল হবে ভয়ঙ্কর।
জ্বলন্ত চোখে মুসার দিকে তাকালেন রাবাত।
দম বন্ধ করে ফেলল মুসা।
ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাবাত, 'এই, সত্যি করে বল, তোদেরকে দারোয়ান হিসেবে আমার সঙ্গে দেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে না?'
ঢোক গিলল মুসা।
আসল কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে রেগে গেলেন মিসেস আমান। গলা চড়ে গেল তাঁর, 'তাতে কি হয়েছে? তোমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাই যদি ভাবা হয়, ক্ষতিটা কি? তোমার পাকা খেতে মই দেয়া হচ্ছে নাকি! তুমি ভেবেছ তুমি ধমকাতে থাকবে আর সবাই তা সহ্য করবে? আমি বলছি, ভাল করে শুনে রাখো, আমি বলছি ওরা যাবে তোমার সঙ্গে। হয় ওরা যাবে, নয়তো তোমার নিউ ইয়র্ক যাওয়া বন্ধ। এতক্ষণ ভাল ভাবে বলেছি, শোনোনি। এই আমি বাঁকা হলাম, দেখি তুমি কি করতে পারো!'
আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। বাবা আর মেয়ে কেউ কারও চেয়ে কম যায় না! মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকতে লাগল, 'আল্লাহ্‌রে, বাঁচাও! কি জানি কি ঘটে যায়! নানার মেয়ে খেপেছে!'
কারও দিকে তাকালেন না আর রাবাত। চুপচাপ কাপের কফি শেষ করলেন। তারপর মুখ তুললেন। মেয়ের দিকে তাকালেন না। কণ্ঠস্বরও নরম করলেন না। খসখসে গলায় বললেন, 'আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করব। কারও বাধা মানতে আমার বয়ে গেছে। আমি ঠিক করেছি, ছেলেগুলোকে

আমি সঙ্গে নেব। তবে দারোয়ান হিসেবে নয়। এত লম্বা পথ, মুখ বুজে থাকা যাবে না। কথা বলার জন্যেও কাউকে দরকার। তার জন্যে ছোটরাই উপযুক্ত। বুড়োগুলোর নানা ফেঁকড়া, নানা ঝামেলা। তর্ক ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না, বেশি পেকে যায় তো!' আড়চোখে মেয়ে আর জামাইয়ের দিকে তাকালেন তিনি। 'পেইত্রি কিংবা কক বিলার্ডকে নিতে পারতাম। কিন্তু বেড়াতে বেরোলেই বিশাল এক সুটকেস সঙ্গে নেবে পেইত্রি, তাতে থাকবে হাজার রকমের ওষুধপত্র। কক হলো বীমার লোক। চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছে, তবু শুধু বীমা, বীমা। দুনিয়ায় যেন এ ছাড়া আর কোন বিষয়ই নেই। সুতরাং মুসা এবং তার দুই দোস্ত আসতে পারে আমার সঙ্গে। মুসা, স্কুল ছুটি হতে আর কদ্দিন? দুই হপ্তার বেশি না নিশ্চয়? ঠিক আছে, অপেক্ষা করতে পারব আমি। তোদের স্কুল ছুটি হলেই রওনা হব। জুনের শুরুতে যাত্রা করব আমরা। অতিরিক্ত গরম পড়ার আগেই খোলা অঞ্চল পেরিয়ে যেতে পারব। ফিরে আসব ক্যানাডার ভেতর দিয়ে। ভাবতে কেমন লাগছে রে তোর?'

লাফিয়ে উঠল মুসা। 'আর বোলো না, নানা! দম আটকে আসছে আমার! স্কুলটা যে কবে ছুটি হবে! সহ্য করতে পারছি না!'

রবিন আর কিশোরকে সুখবরটা জানানোর জন্যে ফোনের দিকে প্রায় উড়ে গেল সে।

স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে এরপর দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি চলল। বাড়িতে জরুরী কোন কাজ নেই, তাই মা-বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিতে রবিনের তেমন অসুবিধে হলো না। তবে কিশোরকে নিয়ে ঘাপলা বাধাতে চাইলেন মেরিচাচী। ইয়ার্ডে প্রচুর কাজ। তিনি ভেবেছিলেন, স্কুল ছুটি হলে বাড়তি কাজগুলো কিশোরকে দিয়ে করিয়ে নেবেন।

কিশোর তাঁকে বোঝাতে চাইল, 'শোনো, কাজ তো সারাজীবনই করা যাবে, করতে হবেও। কিন্তু এ রকম সুযোগ আর আসবে না। তা ছাড়া এ সব ভ্রমণে অভিজ্ঞতা বাড়ে। বুদ্ধি বাড়ে। চিন্তাশীল হতে শেখায় মানুষকে।'

'তোর কি চিন্তা করার অসুবিধে নাকি? বুদ্ধিও কম না! যা আছে তাতেই একেক সময় ভয় হয়, মাথাটা না বিগড়ে যায়!'

চিলেকোঠা থেকে একটা স্লীপিং ব্যাগ বের করে আনলেন মেরিচাচী। রোদে শুকাতে দিলেন।

সেটা দেখে আশা হলো কিশোরের। 'তারমানে যেতে দিচ্ছ তুমি আমাকে?'

জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন চাচী, 'জুন মাসে মিনেসোটার আবহাওয়া কেমন থাকে জানিস?'

'বিউটিফুল!' জবাব দিয়ে দিলেন কাছে দাঁড়ানো রাশেদ পাশা। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন, 'চমৎকার!'

চাচার সমর্থন পেয়ে চোখ উজ্জ্বল হলো কিশোরের। চাচীকে বলল, 'তুমি হিসেবগুলোর কথা ভাবছ তো? যাও, বেড়াতে যাওয়ার আগেই সব শেষ করে দেব। আর কোন অসুবিধে আছে?'

এতক্ষণে হাসি ফুটল মেরিচাচীর মুখে। কিশোর যখন কথা দিয়েছে, ধরে নেয়া যায় কাজটা হয়ে গেছে। হিসেব মেলানোটা সাংঘাতিক ঝামেলার কাজ মনে হয় তাঁর কাছে।

অবশেষে ছুটি হলো স্কুল।

জুনের এক কুয়াশা ঢাকা সকালে নিজের গাড়িতে করে তিন গোয়েন্দাকে মিস্টার রাবাতের বাড়ি নামিয়ে দিয়ে গেলেন আমান। সুটকেস এনেছে ওরা, তবে স্লীপিং ব্যাগ আনেনি। সাফ মানা করে দিয়েছেন রাবাত, বাইরে ক্যাম্প করে ঘুমানো চলবে না। বলেছেন, 'বাইরে রাত কাটানোর বয়েস আমার নেই। এটাই হয়তো জীবনের শেষ অ্যাডভেঞ্চার। অতএব কিপটেমি করে দীনহীনের মত দিনগুলো না কাটিয়ে হোটেলে থাকব, মোটেলে থাকব। যতটা সম্ভব আরামে কাটাব।'

নানার মত অত বয়েস না হলেও বয়েস হয়েছে তাঁর পুরানো, বিশাল বুইক গাড়িটার। তবে যথেষ্ট সমর্থ এখনও। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পারবে।

রওনা হলো ওরা। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন আমান। শেষবারের মত বাবাকে বিদায় জানানোর জন্যে পেছনে ফিরে হাত নাড়ল মুসা। কিশোরও তাকাল। দু'জনেরই চোখে পড়ল, রাবাতের বাড়ির কোণ থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে আসছে গাট্টাগোট্টা একজন মানুষ। ঝোপের আড়ালে অর্ধেক শরীর আড়াল করে তাকিয়ে দেখছে রাবাত সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছেন কিনা।

হ্যারিস মিলারকে চিনতে পারল দুই গোয়েন্দা।

'খালি পেয়েই ঢুকে পড়েছে! একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করেনি!' বিড়বিড় করল মুসা। 'মতলবটা কি?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই সামনের সীট থেকে গাঁক করে উঠলেন নানা, 'কি বলছিস?'

'কিছু না,' তাড়াতাড়ি বলল মুসা। 'ভাবছি, সান্তা বারবারার ওই রেস্তোরাঁটায় থামবে কিনা? ওই যে, যেটাতে ঘরের বাইরে টেবিল পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।'

'ভাল বলেছিস,' খুশি হয়ে উঠলেন রাবাত। নাতির মতই খাওয়ার ব্যাপারে তাঁরও প্রবল আগ্রহ। হয়তো তাঁর কা থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাটা পেয়ে গেছে মুসা। 'আমার তো খিদেয় পেট জ্বলছে। নাস্তা না খেয়ে আর পারব না।'

অবাক হলো মুসা। 'নাস্তা না খেয়েই বেরিয়েছ!'

'মনে নেই!'

প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে নতুন উদ্যমে গাড়ি হাঁকালেন রাবাত।

মুচকি হাসল কিশোর। মেজাজ ভাল আছে রাবাতের। তবে বেশি আশা করা ঠিক না। কখন যে কি কারণে খেপে যাবেন, আন্দাজ করাও সম্ভব নয়!

চার

নাস্তা নয়, ভরপেট ভোজন হলো সান্তা বারবারায় পৌঁছে। পুরানো একটা বাড়ির চত্বরে টেবিল পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা। ক্যালিফোর্নিয়ার সেই স্প্যানিশ কলোনির যুগে তৈরি হয়েছিল বাড়িটা। কুয়াশা তাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে রোদ। বাতাস পরিষ্কার, তাজা।

'খুব সুন্দর!' রাবাত বললেন। 'যতই এগোব, আবহাওয়া আরও ভাল হবে।'

যতই উত্তরে এগোল ওরা, শুধু আবহাওয়া নয়, প্রকৃতিরও রূপ বদল হতে থাকল। কখনও সাগরের কিনার দিয়ে গেছে পথ, তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের একেবারে ধার ঘেঁষে; কখনও পাহাড়ের চূড়ার কাছ দিয়ে, ওখান থেকেও সাগর চোখে পড়ে। গ্যাভিয়োটা ছাড়িয়ে কয়েক মাইল এসে পাওয়া গেল একটা সুড়ঙ্গ, রাস্তা গেছে তার ভেতর দিয়ে। সুড়ঙ্গের অন্য পাশে বদলে গেল প্রকৃতি। সাগরের ঢেউয়ের বদলে এখানে দেখা গেল গরু-বাছুরের পাল। শীতের বর্ষণের শেষে মাঠের ঘাস এখন সবুজ। ছড়ানো সর্ষে খেতে সবুজের মাঝে বিছিয়ে থাকা হলুদ ফুলকে লাগছে বিশাল হলুদ চাদরের মত। ঢালের গায়ে তৃণভূমিতে চরছে গরু-ঘোড়া, মহা আনন্দে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে বাছুর আর ঘোড়ার বাচ্চা।

দুপুরের পর, বিকেলের শুরুতে আবার সাগরের দেখা পাওয়া গেল।

'ওই যে পিজমো বীচ!' রাবাত বললেন। 'মুসা, তোর মা তখনও হয়নি, তোর নানীকে নিয়ে বেড়াতে আসতাম এখানে। সাগরের পাড়ে ঝিনুক খুঁজে বেড়াতাম। বহু বছর আগের কথা, অথচ মনে হচ্ছে এই সেদিন! এখন তোর নানী নেই, আছে শুধু ঝিনুক! একা একা কুড়াতে আর ভাল লাগে না রে, তবে সৈকতের পানিতে গাড়ি চালাতে এখনও মজা পাই।'

'পানিতে!' বিশ্বাস করতে পারল না রবিন। 'পারবেন? চাকা আটকে যাবে না?'

'না, পিজমোতে যাবে না। কোন্ জায়গাটাতে নামতাম আমরা, দেখি বের করতে পারি কিনা?'

হাইওয়ে থেকে একটা সরু রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে আনলেন রাবাত। সাগরের দিকে নামতে নামতে পথের শেষ মাথায় চলে এলেন। তারপরে রয়েছে একটা র‍্যাম্প। সেটার পর সৈকত।

বালির দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'সত্যি বলছ, নানা, কাদায় চাকা দেবে যাবে না? চোরাবালি যদি থাকে?'

'দূর বোকা, এ সব জায়গায় থাকে না। ওই দেখ, আরেকটা গাড়ি নেমেছে।'

একেবারে পানি ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছে একটা ফোক্সওয়াগেন। তীরে আছড়ে ভাঙছে ঢেউ। কোন কোনটা এতবড়, গাড়ির চাকা আর নিচেটা ভিজিয়ে দিয়ে এ পাশে চলে আসছে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'ফোক্সওয়াগেন বলেই চলছে এখনও। বুইক পারবে না, ইঞ্জিনে পানি ঢুকে বন্ধ হয়ে-যাবে।'

'থাম তো!' অধৈর্য হয়ে নানা বললেন, 'দেখ্ই না কি করি।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। অন্য কেউ এখানে গাড়ি চালালে ভয় পেত না। কিন্তু তার নানাকে বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও। এত ঘনিষ্ঠভাবে কোনদিন মেশার সুযোগ পায়নি। বদমেজাজী বলে এড়িয়েই থেকেছে। নানার হাতে নিজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

র‍্যাম্প পার হয়ে এসে বালিতে নেমে পড়ল বুইক। মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলল সৈকত ধরে। তীর থেকে খানিকটা দূরে পানির ওপরে কুয়াশা জমছে। রাবাত বললেন, 'এই এক যন্ত্রণা! খালি কুয়াশা পড়ে এখানে! ভৌগোলিক কারণ একটা নিশ্চয় আছে। কিন্তু কি, কে জানে!'

গাড়ি থামিয়ে, হ্যান্ডব্রেক সেট করে দিয়ে ফিরে তাকালেন তিনি। 'আমি এখানে নামব। পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তোরা?'

'নামব,' একটানে পাশের দরজা খুলে ফেলল মুসা।

চোখের পলকে খুলে গেল চারটে দরজাই। গাড়ি থেকে প্রায় ছিটকে বেরোল চারজনে। দরজায় তালা লাগালেন রাবাত। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে সৈকত ধরে হেঁটে চললেন।

কয়েক মিনিটেই পিজমো বীচের শহর ছাড়িয়ে এল ওরা। লম্বা একটা দেয়াল ঘেঁষে প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো কয়েকটা বাড়ি-ঘর, এই হলো শহর। পাহাড়ের চূড়া আর ঢালে দাঁড়িয়ে আছে হোটেল ও মোটেলগুলো।

কাছে এসে গেছে কুয়াশা। ধীরে ধীরে যেন জড়িয়ে ধরতে আরম্ভ করেছে ওদের। চোখের আড়াল করে দিয়েছে একপাশের সৈকত। কেমন ভূতুড়ে নীরবতা গ্রাস করছে সমস্ত পরিবেশকে। চূড়ার ওই হোটেলগুলোর ওপাশে রয়েছে হাইওয়ে। কাছেই। অথচ একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দও কানে আসছে না।

সামনে বিছিয়ে আছে প্রায় নির্জন সৈকত। একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ঘন হয়ে গেল কুয়াশা। তার মধ্যে হারিয়ে গেল লোকটা। ওদের চারপাশে এখন শীতল, শূন্য, ধূসর এক পৃথিবী।

বিচিত্র অনুভূতি হলো কিশোরের। মনে হচ্ছে, ভয়ানক বিপজ্জনক কি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে কুয়াশার মধ্যে। এমন কিছু, যা অক্টোপাসের মত শুঁড় বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলে যাবে অজানা কোন জগতে, চিৎকার করে সাহায্য চাওয়ারও ক্ষমতা হবে না ওদের।

মাথা ঝাড়া দিয়ে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করল সে। মনকে বোঝাল, অহেতুক ভয় পাচ্ছে। কিছুই নেই এখানে। কেবল ঘন কুয়াশা সূর্যকে ঢেকে দিয়ে জায়গাটাকে অন্ধকার, বিষণ্ণ আর অপার্থিব করে তুলেছে।

'অনেক দূর চলে এসেছি আমরা, তাই না, নানা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

কিশোরের আগে রয়েছে সে। মুসার সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। প্রশ্নটা করে জবাবের আশায় ডানে তাকাল সে। কিন্তু কোথায় রাবাত?

মুসাও থমকে দাঁড়াল। 'নানা! কোথায় তুমি?'

জবাব নেই।

'মিস্টার রাবাত!' চিৎকার করে ডাকল কিশোর।

কয়েক সেকেন্ড কান পেতে রইল সে। রাবাত গেলেন কোথায়? কুয়াশার মধ্যে জলজ্যান্ত একজন মানুষ অদৃশ্য হতে পারে, গায়েব হয়ে যেতে পারে না!

মুসাও ভয় পেয়েছে। চাপা স্বরে বলল, 'এই, কাছাকাছি থাকো সবাই!' রবিনের কাঁধে হাত রাখল। যেন তাকেও গায়েব হওয়া থেকে ঠেকাতে চায়।

'নানা!' গলা চড়িয়ে ডাকল আবার রবিন।

'নানা, কোথায় তুমি?' আরও জোরে ডাকল মুসা। 'জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'চুপ!' এতক্ষণে শোনা গেল একটা ভোঁতা, খসখসে কণ্ঠ।

এক ঝলক বাতাস আচমকা ফাঁকা করে দিল কুয়াশার খানিকটা। রাবাতকে চোখে পড়ল গোয়েন্দাদের। পাহাড়ের গোড়ায় বড় একটা পাথরের কাছে হুমড়ি খেয়ে আছেন। সতর্ক, উত্তেজিত, কোন কিছুর দিকে নজর রাখছেন মনে হচ্ছে।

'নানা, কি হয়েছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা।

তাকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করলেন রাবাত। খানিক পর রাগত স্বরে বলে উঠলেন, 'যা সন্দেহ করেছিলাম!'

নিঃসঙ্গ সেই লোকটাকে দেখা গেল আবার, যে কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অনেক কাছে চলে এসেছে। ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে এখন। সাবধানে পা ফেলছে। যেন কুয়াশার জন্যে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাবাত। ঝাঁপিয়ে পড়লেন লোকটার ওপর।

চিৎকার করে উঠল লোকটা।

লোকটার কলার চেপে ধরে চিৎকার করতে লাগলেন রাবাত, 'এত্তবড় সাহস তোমার, আমার পিছু নিয়েছ!'

'ছাড়ো, পাগল কোথাকার!' নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল লোকটা।

'খাইছে!' দম আটকে যাবে যেন মুসার।

'রাবাত, তুমি একটা উন্মাদ!' বলল লোকটা। 'পুরোপুরি মাথা খারাপ! জলদি ছাড়ো বলছি, নইলে ভাল হবে না!'

কণ্ঠ শুনেই লোকটাকে চিনতে পেরেছে মুসা। হ্যারিস মিলার। তার নানার পড়শী, যাঁর সঙ্গে সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

হুমকির পরোয়া করলেন না রাবাত। কলার তো ছাড়লেনই না, আরও জোরে চেপে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন। 'চোর কোথাকার! আমি জানি

তুমি কিসের জন্যে এসেছ! রাতে চুরি করে আমার ঘরে ঢুকেছিলে, নতুন আবিষ্কারটার কথা জেনে গেছ। যন্ত্রপাতি চুরি করেই পেট ভরেনি, ফর্মুলাও চুরি করতে এসেছ...'

ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মিলার। পিছিয়ে গিয়ে চিৎকার শুরু করল, 'বাঁচাও! বাঁচাও! পুলিশ! পাগলে খুন করে ফেলল আমাকে!'

লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল মুসা। মিলারের হাত আঁকড়ে ধরে বলল, 'চেঁচাবেন না, মিস্টার মিলার, প্লীজ! নানা এমনি কথার কথা বলেছে, সত্যি সত্যি খুন করতে চায়নি আপনাকে...'

'চুপ!' গর্জে উঠলেন রাবাত। 'সর্ এখান থেকে! আমার জন্যে মাপ চাইতে হবে না! যা বলেছি ঠিকই বলেছি, মোটেও কথার কথা নয়! মেরুদণ্ডহীন এই পোকাটা কি করতে চাইছে আমি জানি। কিছুতেই সেটা করতে দেব না ওকে। ল্যাঙ মেরে ফেলে ওর কোমর ভেঙে না দিয়েছি তো আমার নাম...'

আবার মিলারকে ধরার চেষ্টা করলেন রাবাত।

ঝট করে সরে গেল মিলার। আর চিৎকার করল না। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাবাতের দিকে।

'ইঁদুর! ছুঁচো! শুঁয়াপোকা!' গাল দিতে লাগলেন রাবাত। 'এই জন্যেই, এতক্ষণে বুঝলাম! এই জন্যেই বিষ্যুৎবার থেকে কাজে যাচ্ছ না তুমি! বাড়িতে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ওপর চোখ রেখেছ। যেই আমি বেরিয়েছি, আমার পিছু নিয়েছ। কেন নিয়েছ, মনে করেছ বুঝব না! অত বোকা পাওনি!'

'পাগলের সঙ্গে কে কথা বলে!' বলেই ঘুরে সৈকত ধরে প্রায় ছুটতে শুরু করল মিলার।

'সত্যি কথা বলেছি তো, সহ্য করতে পারলে না, তাই না!' পেছনে চিৎকার করে বললেন রাবাত।

ফিরল না মিলার। জবাবও দিল না। খেপা মানুষটার কবল থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। আবার অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশার মধ্যে।

'অসহ্য!' নাক দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগলেন রাবাত। 'জঘন্য লোক! আবার যদি আসে, বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব আমি ওর!'

এতক্ষণে খেয়াল করল মুসা, কাঁপছে ও। একটা দুঃস্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠেছে। এ কার সঙ্গে এসেছে! মারাত্মক অবস্থা! স্যান ফ্র্যান্সিসকোতে পৌঁছার আগেই হয়তো ভয়ানক বিপদে ফেলে দেবে। উপকূলের কোন জেলখানায় হবে শেষ ঠাঁই। এমনও হতে পারে, নানার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে সামলানো অসম্ভব ভেবে রকি বীচে ফিরে যেতে পারে কিশোর আর রবিন। নিউ ইয়র্ক যাওয়া আর হবে না।

'নানা,' বলল সে, 'আমার মনে হয় অহেতুক মিস্টার মিলারকে গালাগাল করছ। পিজমো বীচটা বেড়ানোর জায়গা, যে কেউ আসতে পারে এখানে। মিলারের আসতেও বাধা নেই। এমনও হতে পারে, এখানে কোন বন্ধু আছে তার, দেখা করতে এসেছে।'

'তোর মাথা!' খেঁকিয়ে উঠলেন রাবাত। 'ওর আবার বন্ধু আছে নাকি! দুনিয়ায় কেউ ওর বন্ধু হবে না! শুনে রাখ, তার সঙ্গে এই শেষ দেখা নয় আমাদের। না হলে তখন বলিস। কিন্তু যেটার জন্যে এসেছে সেটা পাবে না সে। অত কাঁচা কাজ করি না আমি। ওর মত ছুঁচোরা যে পিছে লাগতে পারে, সেটা আগেই ভেবে রেখেছি।'

'কি নিতে এসেছে?' এমন নিরীহ ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করল কিশোর, যেন কথার পিঠে কথা, জানার কৌতূহল নেই।

'আমার ফর্মুলা!' জবাব দিলেন রাবাত।

'যেটা আবিষ্কার করেছ?' মুসার প্রশ্ন। 'যেটা নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাচ্ছ?'

'তোরাও এমন ভঙ্গি করছিস যেন আমি একটা পাগল! আবিষ্কার যেটা করেছি, জানলে নিউ ইয়র্কের বড় বড় বিজ্ঞানীরাও...'

থেমে গেলেন তিনি। ফাঁস করে দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ খেয়াল হলো যেন। 'না, তোদের না জানাই ভাল। হয়তো মিলার একাই চায় না ওটা, আরও কেউ আছে। চল। আর দেরি করলে অন্ধকার হওয়ার আগে মনটিরেতে পৌঁছতে পারব না।'

শান্ত ভঙ্গিতে বালি মাড়িয়ে হেঁটে চললেন তিনি। কয়েক মিনিট আগে যে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল বেমালুম ভুলে গেছেন যেন।

পেছনে এগোল তিন গোয়েন্দা। মনে ভাবনা। দীর্ঘ যাত্রায় বেরিয়েছে ওরা। শেষ হতে এক মাস কিংবা তারও বেশি লেগে যেতে পারে। এ রকম একজন মানুষের সঙ্গে টিকতে পারবে অতদিন? শুধু কি খামখেয়ালী, না আসলেই পাগল? একজন বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে অজানা পথে পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করছে না তো ওরা!

পাঁচ

'কারও সঙ্গে একঘরে থাকতে আমি পারব না,' ঘোষণা করে দিলেন রাবাত, 'নিজের নাতি হলেও না! পোলাপানকে বিশ্বাস নেই। কখন কি করে বসবে ঠিক নেই। হয়তো দেখা যাবে রাত দুপুরে উঠে পনির দিয়ে রুটি খেতে বসল। হই-চই করে, শব্দ করে আমার ঘুমের বারোটা বাজাবে।'

অতএব ঘুমের সুবিধার জন্যে মনটিরের ফিশারম্যান ওআর্ফ থেকে কয়েক ব্লক দূরে একটা মোটেলে দুটো কামরা ভাড়া করলেন তিনি। তারপর ক্যানারি রো-র একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে গেলেন ছেলেদের। চমৎকার রান্না করা নানা রকম মাছের স্বাদ বহুদিন মনে থাকবে তিন গোয়েন্দার। খেতে খেতে মনটিরে আর স্প্যানিশ ক্যালিফোর্নিয়ার অনেক ইতিহাস বললেন। মেজাজ একেবারে ফুরফুরে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে মিলারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা যেন বহুযুগ আগের ব্যাপার। কোনই গুরুত্ব নেই ওটার। মন

থেকে দূর করে দিয়েছেন বেমালুম।

সে-রাতে সকাল সকাল ঘুমাতে গেল সবাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল তিন গোয়েন্দা, আলাদা ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে একটা কাজের কাজ করেছেন রাবাত। তাতে তাঁর চেয়ে ওদের উপকার হয়েছে বেশি। একঘরে থাকলে সারারাত জেগে থাকতে হত। এত জোরে নাক ডাকাচ্ছেন, দুটো ঘরই কাঁপতে শুরু করল।

'সাইনাসের সমস্যা আছে,' অনুমান করল রবিন।

'মা বলে ওসব কিছু না,' মুসা বলল, 'রোগটোগ নেই। আসলে ঘুমের মধ্যেও নানা চান না তাঁকে অগ্রাহ্য করা হোক।'

মাঝখানে একটা দেয়াল না থাকলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যেত তিন গোয়েন্দা। অন্য ঘর থেকে আসছে বলে রক্ষা। তা-ও যা শব্দ! তবে একবার ঘুমিয়ে পড়ার পর আর অসুবিধে হলো না, একটানা ঘুমাল সকাল পর্যন্ত।

জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকল সকালের রোদ। ঘুম ভাঙল ওদের। শুনতে পেল, উঠে পড়েছেন রাবাত। বাথরুমে তাঁর শাওয়ারের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ওরাও উঠে পড়ল। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পরে তৈরি হলো। দরজায় খটখটানির শব্দ। রাবাত ডাকছেন।

জেটির ধারে একটা রেস্টুরেন্টে নাস্তা করতে বসল ওরা। ভাজা মাংস, কেক আর এক জগ কমলার রসের অর্ডার দিলেন রাবাত। ঘুম ভাল হওয়ায় শরীরটা ঝরঝরে লাগছে কিশোরের। খাবারে আনন্দ পাচ্ছে তাই। খেতে খেতে সাগর দেখার জন্যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি। রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে একজন লোক। তাড়াতাড়ি আবার প্লেটের দিকে নজর ফেরাল, যাতে তার চমকে যাওয়া রাবাতের চোখে না পড়ে। কেকের একটা টুকরো ভেঙে সিরাপে চুবিয়ে মুখে পুরল।

নানার পাশে, কিশোরের মুখোমুখি বসেছে মুসা। ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়াল না তার। প্রশ্ন করার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল। ভ্রূকুটি করে আর সামান্য মাথা নেড়ে তাকে চুপ থাকতে ইশারা করেছে কিশোর।

তার দিকে তাকিয়ে রাবাত জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু খাবে তোমরা?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, অনেক হয়েছে। পেট ভরে গেছে।'

'খুব ভাল খাবার,' রবিন বলল।

চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন রাবাত। খাবারের দাম দেয়ার জন্যে ক্যাশিয়ারের ডেস্কের দিকে এগোলেন।

সামনে গলা বাড়িয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কি দেখেছিলে, কিশোর?'

'হ্যারিস মিলারকে, ক্যানারি রো-র দিকে যাচ্ছে।'

ফিরে এলেন রাবাত। ওয়েইটারের জন্যে প্লেটে টিপস রেখে দিয়ে ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন, 'পানির কিনারটা ঘুরে দেখতে চাও? বেশি দেরি করা যাবে না। আজ রাতেই স্যান ফ্র্যান্সিসকো পেরোতে চাই। সম্ভব হলে

সান্তা রোজাতে চলে যাব। কালকের দিনটা তাহলে রেডউডের বনে ঘুরে কাটাতে পারব।'

তাঁর পেছন পেছন রেস্টুরেন্ট থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল ছেলেরা। রবিনের কাঁধে ঝোলানো একটা আনকোরা নতুন ক্যামেরা। রকি বীচে কেনার পর একটা ছবিও তোলা হয়নি ওটা দিয়ে। এখান থেকে শুরু করার ইচ্ছে তার।

সবাইকে নিয়ে জেটির কাছে চলে এলেন রাবাত। ঘাটে বাঁধা ছোট-বড় অনেক নৌকা ঢেউয়ে দুলছে। জাহাজ বেরিয়ে যাচ্ছে খোলা সাগরে।

এখনও খুব সকাল, কিন্তু জেটিতে পুরোপুরি ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। রাতে ধরে আনা মাছ নামাচ্ছে জেলেরা। দোকানে দোকানে ট্যুরিস্টদের ভিড়। বিশেষ করে ঝিনুক-সামগ্রীর দোকানগুলোতে। খটাখট ক্যামেরার শাটার টিপতে লাগল রবিন। মুসার চোখ আকাশে চক্কর দেয়া সী-গালের খেলা দেখছে। অলস ভঙ্গিতে রাবাত তাকিয়ে আছেন একটা দোকানের দিকে।

ধীরে ধীরে নজর সরে গেল রাস্তার দিকে। মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেলেন তিনি। শক্ত হয়ে গেল কাঁধ।

'কি বলেছিলাম! শয়তানটা এখানেও এসেছে!'

না তাকিয়েও বলে দিতে পারবে কিশোর কার কথা বলছেন রাবাত। হ্যারিস মিলার ছাড়া আর কেউ না। আবার এসেছে যেন রাবাতের হাসিখুশি মেজাজটাকে পলকে বিগড়ে দেয়ার জন্যে। আগুন বানিয়ে দেয়ার জন্যে।

'নানা,' তাড়াতাড়ি দু'হাত তুলে এগিয়ে এল মুসা, 'দোহাই তোমার, চুপ করে থাকো! কিছু বোলো না!'

ভয়ানক ভঙ্গিতে নাক দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করলেন রাবাত। 'বেশ! তবে এখানে আমি আর একটা সেকেন্ডও দাঁড়াব না!'

ঝিনুকের দোকানটায় ঢুকে পড়লেন তিনি। বিশাল এক দানবীয় ঝিনুকের খোলার ওপাশে মুখ লুকিয়ে ফেললেন। জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে গোয়েন্দারা শুধু তাঁর কোঁকড়া চুলগুলো দেখতে পেল।

ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল মিলার। তার ওপর যে নজর রাখা হচ্ছে, বুঝতে পারেনি। কাঁধে ঝোলানো নতুন ক্যামেরার ব্যাগ, ক্যামেরাটা হাতে। অবিকল রবিনেরটার মত, একটা Canon II. রবিনের মতই জেটির দৃশ্যের ছবি তোলায় আগ্রহী মনে হলো তাকে। তবে তুলছে না। সকালের ট্যুরিস্টদের ভিড়ে মিশে গেছে। সবই নতুন তার। গায়ের সাদা শার্টটা নতুন—গলার কাছে দুটো বোতাম খোলা, পরনে নতুন জিনসের প্যান্ট। পায়ে রবার সোলের নতুন জুতো। রকি বীচ থেকে বেরোনোর পর পথে কোনখান থেকে একটা নতুন স্ট্র হ্যাটও কিনেছে। হ্যাটের চওড়া কানা ছায়া ফেলেছে মুখে।

দ্বিধা করতে লাগল মুসা। তার নানা যে ওত পেতে আছেন ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে এ কথা বলে সাবধান করে দেবে মিলারকে? করতে গেলে এবং সেটা দেখে ফেললে তার ওপর খেপে যাবেন নানা। সেটা চায় না সে। মিলারের সঙ্গে আবার একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে যাক, এটাও চায় না। কি

করবে তাহলে? মুশকিলে পড়ে গেল।

ঘুরে তাকাল সে। দেখল, কিশোরও তাকিয়ে আছে। বুঝল, তার মত একই সমস্যায় পড়েছে কিশোরও।

কয়েক পা হেঁটে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসল রবিন। ক্যামেরাটা ব্যাগে ভরে পাশে রেখে সাগরের দিকে তাকাল। মিলারকে না দেখার ভান করল।

ক্যামেরা হাতে হেঁটে এল মিলার। মুসার এত কাছে দাঁড়াল, আরেকটু হলে কাঁধে কাঁধ ঠেকে যেত, অথচ লক্ষ করল না তাকে। ভয়ানক অন্যমনস্ক। বার বার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে আর ঘড়ি দেখছে। কারও আসার অপেক্ষা করছে বোধহয়।

মিনিট দুয়েক পর এল সে। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে দেখতে ধীর পায়ে এগিয়ে এল। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'মিলার?'

কেমন একটু বিস্ময় আর অবজ্ঞা প্রকাশ পেল লোকটার কণ্ঠে। ফিরে তাকাল কিশোর। বয়েস চল্লিশের কোঠায়, মাথায় মসৃণ কালো চুল, মুখটাও মসৃণ। পরনে সিল্কের পাজামা, গায়ে নরম কাপড়ের দামী শার্ট। চোখে বিরাট সানগ্লাস মুখের অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে। চোখা পাতলা নাক। পাতলা ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি। ছোট ছোট কান মাথার সঙ্গে প্রায় লেপ্টে আছে। তার পাশে কেমন আড়ষ্ট আর নগণ্য লাগছে জিনস আর সাদা শার্ট পরা গাট্টাগোট্টা মিলারকে।

জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে মিলার বলল, 'এনেছি।'

কিশোরের দিকে তাকাল আগন্তুক।

নিরীহ ভঙ্গি করে সাগরের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর।

'আসুন,' বলে হাঁটতে শুরু করল লোকটা।

নতুন জিনসের খসখস শব্দ তুলে তার পেছনে এগোল মিলার।

আবার ওদের দিকে ফিরল কিশোর। রবিনের কাছাকাছি চলে গেছে দু'জনে। কেমন সন্ত্রস্ত লাগছে মিলারকে। স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বার বার তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। যেন লক্ষকোটি চোখ রয়েছে তার ওপর। সেগুলোকে এড়ানোর চেষ্টা করছে। অমন করছে কেন লোকটা?

রবিন যে বেঞ্চটায় বসেছে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সানগ্লাস পরা লোকটা। ফিতে ধরে ক্যামেরাটা ঝোলাতে ঝোলাতে তার সঙ্গে সঙ্গে গেল মিলার। তাকে লোকটা বলল, 'বসুন এখানে।'

বসতে যাবে মিলার, এই সময় চোখ পড়ল রবিনের মুখের দিকে।

কুঁকড়ে গিয়ে যেন নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলতে চাইল রবিন।

কিন্তু চিনে ফেলেছে মিলার। চমকে গিয়ে বলল, 'তুমি!'

কিশোর দেখল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ।

বসা আর হলো না মিলারের। সোজা হয়ে চারপাশে তাকাল। কিশোর আর মুসাকেও দেখতে পেল এতক্ষণে। তবে তার চোখ ওদের খুঁজছে না। কাকে খুঁজছে, বুঝতে পারল কিশোর। বিশাল ঝিনুকের খোলার ওপর দিয়ে সেই মুখটাকে দেখতে না পেলেও ধূসর কোঁকড়া তারের মত চুল বেরিয়ে

থাকতে দেখল।

ধরা পড়ে গেছেন বুঝে আর লুকানোর চেষ্টা করলেন না রাবাত। সোজা হলেন। রাগে জ্বলছে চোখ।

মড়ার মুখের মত সাদা হয়ে গেল মিলারের মুখ।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। মিলারের দিকে ছুটল। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে।

তীব্র গতিতে দোকান থেকে ছুটে বেরোলেন রাবাত। মুঠো করে ফেলেছেন হাত। পিটিয়ে বালির সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন বুঝি আজ মিলারকে!

হাতের ক্যামেরাটা বেঞ্চে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দুই হাত তুলে ফেলল মিলার। পিছিয়ে গেল বেঞ্চের কাছ থেকে। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল যে লোকটা, বিপদ বুঝতে পারল সে-ও। যেন পিছলে বেরিয়ে চলে গেল।

তার দিকে নজর নেই তিন গোয়েন্দার, রাবাত আর মিলারকে দেখছে।

মিলারের কলার খামচে ধরলেন রাবাত। চেঁচাতে লাগলেন, 'দেখে ফেলব ভাবোনি, না! আশা ছাড়তে পারোনি। বলেছি না, পাবে না। আমার কাছ থেকে জিনিস নেয়া অত সহজ না।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল মিলার। কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু বেরোল কেবল ঘড়ঘড় শব্দ। কণ্ঠনালীতে চাপ পড়ায় কাশতে শুরু করল। বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না, রাবাতকে ঠেলে সরাল না; এমনকি পিছিয়ে যাবার কিংবা দৌড় দেয়ার চেষ্টাও করল না—প্রচণ্ড ভয়েই বোধহয় আড়ষ্ট হয়ে গেছে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল মারমুখো কালো মুখটার দিকে। নিজের মুখের যে কি ঘনঘন পরিবর্তন হচ্ছে জানতে পারল না।

মিলারকে ভয় দেখাতে পেরে সন্তুষ্ট হলেন রাবাত। শার্ট ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, ছেড়ে দিলাম এবারও! আবার যদি পিছে লাগতে দেখি…!' কথাটা শেষ না করে ইঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিলেন কি করবেন। ছেলেদের কাছে সরে এসে বললেন, 'চলো, ভিড় জমে যাচ্ছে।'

দম বন্ধ করে ফেলেছিল মুসা। বিপদ কেটে যেতে নিশ্বাস ছাড়ল।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে আছে দুটো ক্যামেরার ব্যাগ। ছোঁ মেরে একটা তুলে নিয়েই রওনা হয়ে গেল উত্তেজিত রবিন। ভিড় জমে গেলে মিলার কি করবে, কে জানে! পুলিশ ডাকার জন্যে অনুরোধ করলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কাজটা ঠিক করেননি রাবাত। পুলিশ এলে তিনিই ফাঁসবেন। লোকে দেখেছে, মিলার কিছু করেনি, তিনিই দোকান থেকে ছুটে এসে তাকে আক্রমণ করেছেন। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালানো দরকার।

রাবাতের পেছনে প্রায় উড়ে চলল তিন গোয়েন্দা। খুব জোরে হাঁটতে পারেন তিনি। পানির ধার ধরে পার্কিং লটের দিকে এগোলেন। বুইকটা আছে ওখানে।

গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে আপন মনে হাসলেন তিনি। স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর বেড়ে গেল হাসি। মিলারের ভড়কে যাওয়া

চেহারার কথা মনে করেই হয়তো হাসছেন।

পেছনে চিৎকার শোনা গেল। এত কিছুর পরও আবার এসেছে হ্যারিস মিলার। ছুটে আসছে পেছন পেছন। মনে হলো কিছু বলতে চায়। এক হাতে স্ট্র হ্যাট, আরেক হাতে ক্যামেরার ব্যাগ। চিৎকার করে বলল, 'রাবাত, প্লীজ, একটা মিনিট দাঁড়াও!'

দাঁড়ানো তো দূরের কথা, গাড়ির গতিও কমালেন না রাবাত, বরং এক্সিলারেটর চেপে ধরলেন আরও। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি।

'থামলে না কেন, নানা?' মুসা বলল, 'কি বলতে এসেছে, শুনলে পারতে।'

'হুঁ, কাজ নেই আর। থামি। ওই চোরটার সঙ্গে আবার কিসের কথা? নতুন কোন ফন্দি করে এসেছে নিশ্চয়। অত কাঁচা লোক নই আমি, আর ফর্মুলা চুরির সুযোগ দেব তাকে! তার আগেই জেলে ঢোকাব!'

রাগ হয়ে গেল মুসার। 'যা কাণ্ড শুরু করেছ, জেলে তো ঢুকবে তুমি, দেখতেই পাচ্ছি! মাথা গরম করে কখন মেরে বসবে বেচারাকে; সে মরবে, আর গোষ্ঠীসুদ্ধ আমাদেরকে নিয়ে জেলে ভরবে পুলিশ! তোমার সঙ্গে আসাটাই বোধহয় ঠিক হয়নি!'

কিশোর আর রবিন মনে করেছিল রেগে যাবেন রাবাত। কিন্তু ওদের অবাক করে দিয়ে হাসলেন তিনি। বাঁকা চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একেবারে দেখি তোর মায়ের মত কথা বলিস! নাকি নানীর মত!'

ছয়

'পাগলামি শুরু হলেই বিপদ! নইলে নানা এমনিতে মানুষ খারাপ না। যখন ভাল থাকে, তখন তো খুবই ভাল!' মুসা বলল। 'ক'জন লোক আছে, আমাদের বয়েসী ছেলেদের সহ্য করতে পারে, বলো? তারপর আবার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া! আসলে আমাদেরকে ভাল লেগে গেছে তাঁর।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মুসার নানাকে অনেক আগে থেকেই চেনে সে, তবে এ রকম ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশার সুযোগ হয়নি। মুসারই হয়নি, তার আর কি হবে। তাঁর আচরণে ক্রমেই অবাক হচ্ছে। ভাল না মন্দ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ভদ্রলোকের। এই ভাল তো এই খারাপ। তবে একটা কথা ঠিক, মিলারকে না দেখলে মেজাজ ভালই থাকে তাঁর। অন্তত এতদিন থেকেছে। ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না।

দুপুর দেড়টা বাজে। বুইকের গায়ে হেলান দিয়ে কথা বলছে দু'জনে। তাকিয়ে আছে রবিন আর রাবাতের দিকে। ঘাসে ঢাকা একটা ঢালের গা বেয়ে কিছু দূর উঠে গেছে ওরা। ক্যামেরা উঁচিয়ে ছবি তুলছে রবিন। স্যান ফ্র্যান্সিসকো বে আর গোল্ডেন গেট ব্রিজের দিকে তাকিয়ে আছেন রাবাত।

মহাসুখী মনে হচ্ছে তাঁকে। মেজাজ অত্যন্ত ভাল। মুসা ভাবল, ইস্, এ রকম মেজাজ যদি শেষ পর্যন্ত থাকত!

রাবাতের মেজাজ সেদিন খারাপ হচ্ছে না। সকালে মিলারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সামান্য একটুক্ষণ খারাপ ছিল, আনমনে বিড়বিড় করেছেন, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করেছেন। হাইওয়ে ১০১-এ ওঠার পর মিলারের কথা উধাও হয়ে গেছে তাঁর মন থেকে। শিস দিতে আরম্ভ করেছেন। উত্তরে স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় পৌঁছে কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিলেন। লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে। কিছু স্যুভনিরও কেনা হয়েছে। লাঞ্চ খেতে খেতে শুনিয়েছেন ১৯০৬ সালে স্যান ফ্র্যান্সিসকোর ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা।

'পুরো শহরটাতেই আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিল, তাই না?' কিশোর বলেছে।

মাথা ঝাঁকিয়েছেন রাবাত। 'পানি আর গ্যাসের পাইপগুলো আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ভূমিকম্পে। তারপর যখন গ্যাসে আগুন ধরে গেল, নেভানোর জন্যে পানি আর পাওয়া গেল না।'

বেলা দুটোয় গোল্ডেন গেট ব্রিজ পেরোল ওরা। সাউস্যালিটোতে এসে হাইওয়ে ছেড়ে পাহাড়ী রাস্তায় ঢুকে পড়লেন রাবাত। এক জায়গায় থেমে রবিনকে আরও কিছু ছবি তোলার সুযোগ দিলেন।

আড়াইটা বাজল। ফিল্ম শেষ হয়ে গেল রবিনের। অবাক হলো সে। এত তাড়াতাড়ি তো শেষ হওয়ার কথা নয়! এত ছবি কি তুলেছে? সন্দেহ হতে লাগল।

পাহাড় বেয়ে দৌড়ে নেমে এল সে। গাড়ির পেছন থেকে ক্যামেরার ব্যাগটা বের করে নতুন ফিল্ম নিয়ে ক্যামেরায় ভরল। কি যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে কোথাও, ঠিক ধরতে পারছে না। চাপ লেগেই বোধহয় বেশি চ্যাপ্টা হয়ে গেছে ব্যাগের ওপরটা, ময়লাও লেগেছে বেশ। চিন্তিত মনে ফিরে গিয়ে আরও কয়েকটা ছবি তুলল।

আবার হাইওয়েতে ফিরে এল ওরা। আরও উত্তরে এগিয়ে চলল। রাস্তার দু'ধারে সুন্দর অঞ্চল। আস্তে আস্তে পশ্চিমে ঢলতে শুরু করল সূর্য।

ডিনারের সময় সান্তা রোজাতে পৌঁছল ওরা। একটা মোটেলে উঠে দুটো রুম ভাড়া করলেন রাবাত। পাশাপাশি ঘর। মাঝের দরজা দিয়ে একঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়া যায়। দরজাটার কোন প্রয়োজন পড়বে না ওদের, ভাল আর কোন ঘর পাওয়া গেল না বলেই নেয়া।

মোটেলের পুলে সাঁতার কাটার প্রস্তাব করলেন রাবাত। সাঁতারের পর মোটেলের ডাইনিং রুমে খাওয়া সারলেন। ঘরে এসে রবিন আর কিশোর টিভি দেখতে লাগল, মুসার পেল ঘুম।

এত তাড়াতাড়ি বিছানায় যেতে ইচ্ছে করল না তার। ঘুম তাড়ানোর জন্যে নিচে পুলের ধারে বসানো সোডা মেশিন থেকে একটা সোডা কিনতে চলল। জানালার ধার দিয়ে দরজার কাছে যেতে হয়। জানালার বাইরে চোখ পড়তেই সোডা খাওয়ার কথা ভুলে গেল সে।

ওদের ঘরটা দোতলায়। পার্কিং এরিয়াটা দেখা যায়। নিচে সারি সারি গাড়ি পার্ক করা আছে। নানার বুইকটাও আছে, ওদের ঘরের বেলকনির ঠিক নিচেই। পেছনে খানিক দূরে একটা চকচকে লিংকন গাড়ি। সেটা থেকে হ্যারিস মিলারকে বেরিয়ে আসতে দেখল মুসা।

দম বন্ধ করে ফেলল সে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল নিথর হয়ে। স্তব্ধ, বিস্মিত। তারপর চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে বলল, 'কিশোর, দেখে যাও!'

চোখের পলকে তার পাশে চলে এল অন্য দুই গোয়েন্দা। জানালা দিয়ে ওরাও দেখতে পেল মিলারকে। রাবাতের গাড়িটার চারপাশে ঘুরছে। একটা জানালার কাছে থেমে কাঁচে নাক ঠেকিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। সরে গেল পেছনে, বুটের ঢাকনা টেনে তোলার চেষ্টা করল। না পেরে ফিরে তাকাল মোটেলের অফিস এবং তার ওপরের জানালাগুলোর দিকে।

ঝট করে নিচু হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা, যাতে চোখে না পড়ে।

দ্বিধা করল মিলার। চিন্তিত ভঙ্গিতে বুইকটার দিকে তাকাল আরেকবার। তারপর লিংকনে উঠে স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল তিনজনে।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। বলল, 'মুসা, মনে হচ্ছে তোমার নানার সন্দেহই ঠিক, তাঁর ফর্মুলা চুরির চেষ্টা করছে মিলার।'

মাথা নেড়ে মুসা বলল, 'বুঝতে পারছি না। তবে কিছু একটা যে খুঁজতে এসেছিল মিলার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যা হোক, মিলারের কথা নানাকে বলার দরকার নেই। কি ঘটাবে কে জানে। শেষে পুলিশ তাকেই ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরবে।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা নাড়ল কিশোর।

'মিলারের ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে,' রবিন বলল, 'বিষ্যুৎবার থেকে নাকি ছুটিতে আছে। হয়তো আমাদের মতই বেড়াতে বেরিয়েছে। এ দিকে এসেছিল মোটেলের খোঁজে। রাবুনানার গাড়িটা দেখেছে। ভাল করে দেখে যখন বুঝেছে এটা তাঁরই, এই মোটেলে ওঠার সাহস করেনি আর, পালিয়েছে। পাগলকে সবাই ভয় পায়।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে।' তর্জনী তুলল মুসা, 'কিন্তু একটা কথা। নতুন গাড়ি কোথায় পেল মিলার? তার তো একটা ঝরঝরে পুরানো শেভি গাড়ি ছিল দেখেছি।'

'ভাড়া নিয়েছে হয়তো,' কিশোর বলল। 'অত পুরানো গাড়ি নিয়ে দূরের যাত্রায় বেরোনো ঠিক হবে না, তাই।'

জবাব না পেয়ে চুপ হয়ে গেল মুসা। তবে সন্তুষ্ট হতে পারল না। মনটা খুঁতখুঁত করতেই থাকল।

আবার টেলিভিশন দেখায় মন দিল তিন গোয়েন্দা।

কিছুক্ষণ পর ছেলেরা কি করছে দেখতে এলেন রাবাত।

রাত সাড়ে দশটায় বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা।

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন রাবাত। তাঁর নাক ডাকানোর বিকট গর্জন পাশের ঘরে অন্যদের কানে এসে পৌঁছল। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। হেসে উঠল কিশোর। উঠে গিয়ে মাঝখানের দরজাটা লাগিয়ে দিল মুসা। তারপরেও পুরোপুরি বন্ধ হলো না শব্দ, পাল্লার ফাঁক দিয়ে আসতে লাগল এ পাশে। তবে ঘুমাতে আর অসুবিধে হলো না।

একটা আজব স্বপ্ন দেখল মুসা। হোটেলের লবিতে নানাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে সে। অনেক বড় লবি। সুদৃশ্য কাপড় পরা মানুষেরা সব ভিড় করে আছে সেখানে, নানা-নাতিকে দেখছে আর হো-হো করে হাসছে। কেন হাসছে প্রথমে বুঝতে পারল না মুসা। নানার দিকে চোখ পড়তে দেখল তাঁর পরনে শুধু লাল গেঞ্জি আর লাল জাঙ্গিয়া। তারপর চোখ পড়ল নিজের দিকে। নানার তো তা-ও কিছু পোশাক আছে, তার পরনে একেবারেই নেই। পুরোপুরি দিগম্বর।

চমকে জেগে গেল মুসা। ঘামে নেয়ে গেছে। পানি খাওয়ার জন্যে উঠে বাথরুমের দিকে চলল সে। জানালা দিয়ে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল।

পার্কিং লটের উজ্জ্বল আলোগুলো নেভানো। পাশের প্যাসেজ থেকে এসে পড়া আলোয় দেখা গেল বুইকের কাছে ঘাপটি মেরে আছে একটা ছায়ামূর্তি।

কিশোরের বিছানার পাশে প্রায় উড়ে চলে এল মুসা। তাকে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'কিশোর! জলদি ওঠো! গাড়ির কাছে আবার এসেছে ও!'

সাত

খালি পায়েই ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল তিনজনে।

দুপদাপ করে নামতে গিয়ে হোঁচট খেলো কিশোর। উল্টে পড়তে পড়তে কোনমতে রেলিঙ ধরে সামলে নিল।

গাড়ির পাশে ঝুঁকে থাকা মূর্তিটা ঝট করে সোজা হলো। সিঁড়িতে চোখ পড়তেই আর দাঁড়াল না, দৌড় মারল রাস্তার দিকে মুখ করে রাখা গাড়িগুলোর দিকে।

তাড়া করল তিন গোয়েন্দা। খালি পা বলে সুবিধে করতে পারল না। কিশোর তো খোঁড়াতেই শুরু করল। সবার আগে রাস্তায় পৌঁছল মুসা। কিন্তু লোকটাকে ধরতে পারল না।

'ধুর!' বিরক্তিতে বাতাসে থাবা মারল সে।

'গেল!' দাঁড়িয়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন।

'মিলারকেই দেখেছ তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোন সন্দেহ নেই,' জবাব দিল মুসা। 'পালাচ্ছিল যখন তখনও দেখেছি।

বারান্দার আলো পড়েছিল তার মুখে।'

বুইকের কাছে ফিরে এল ওরা। ঘুরতে শুরু করল চারপাশে। দরজা টান দিয়ে দেখল। তালা লাগানো। বুটের ঢাকনায়ও তালা। চার হাত-পায়ে ভর রেখে উবু হয়ে গাড়ির নিচে উঁকি দিল কিশোর। নিচেটা অন্ধকার বলে কিছু দেখতে পেল না।

'টর্চ লাগবে,' উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঝেড়ে বালি ফেলল কিশোর।

এই সময় মাথার ওপরে একটা দরজা খুলে গেল। ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলেন রাবাত। 'কি ব্যাপার? চারটেই বাজেনি এখনও, এত সকালে গাড়ির কাছে কি?'

সমস্ত হোটেল ঘুমিয়ে আছে। কেউ যাতে বিরক্ত না হয় সেজন্যে আস্তে করে বললেন তিনি। কিন্তু সেই আস্তেটাই আধ মাইল দূর থেকে শোনা গেল। গলা বটে একখান। পটাপট আলো জ্বলে উঠল জানালায়, দরজা খুলে উঁকি দিল কয়েকজন গেস্ট।

'কে জানি ঘোরাফেরা করছিল এখানে,' নানাকে জানাল মুসা।

'মিলার না তো!'

জবাব দিল না মুসা।

তার চুপ করে থাকাকেই 'হ্যাঁ' ধরে নিয়ে ওদেরকে ঘরে ফিরে আসতে বললেন রাবাত। ওরা এলে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বললেন, 'ও সন্দেহ করেছে, আমার কাছেই আছে জিনিসটা। খুঁজুক। যত ইচ্ছে উৎপাত করুক, নিতে আর পারবে না!'

'কি আছে তোমার কাছে, নানা?' জানতে চাইল মুসা।

'ও সব জেনে কাজ নেই তোদের। যত কম জানবি তত ভাল থাকবি। যা, শুয়ে পড়গে। রাত এখনও অনেক বাকি। ওই শেয়ালটার জন্যে ঘুম নষ্ট করার কোন মানে নেই। চেষ্টার কমতি করছে না, তবে ক্ষতি কিছু করতে পারেনি। কি বলিস?'

'তা পারেনি,' জবাব দিল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন রাবাত। 'পারবেও না। ওর স্বভাবই ওরকম। চোরের মত আসে যায়। মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই।'

নিজের ঘরে চলে গেলেন রাবাত। গোয়েন্দাদের অবাক করে দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নাক ডাকানো শুরু করলেন।

মুসা বলল, 'নানার কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে এখন। তার আবিষ্কারের পেছনেই লেগেছে মিলার। নিতে যখন পারেনি, আবারও আসতে পারে। তালা কিংবা জানালা ভেঙে গাড়িটার ক্ষতি করতে পারে। বাকি রাতটা আমি গাড়িতে ঘুমাব।'

রাবাতের ঘরে ঢুকল সে। নাসিকা গর্জনের সামান্যতম ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আলগোছে টেবিল থেকে গাড়ির চাবি তুলে নিয়ে ফিরে এল। নিজের বিছানা থেকে কম্বলটা তুলে নিয়ে কিশোরকে সহ নেমে এল নিচে, গাড়ির কাছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল দু'জনে। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করল

মুসা। কিন্তু সুইচ অনেক টেপাটেপি করেও আলো জ্বালতে পারল না।

'দূর! ব্যাটারি শেষ মনে হয়! দেখা গেল না!'

হতাশ খানিকটা কিশোরও হলো। বলল, 'যার জন্যে এসেছিল, সেটা নিতে পারেনি মিলার। আবার আসতে পাবে। এলে একা কিছু করতে যেয়ো না। আমাদের ডেকো।'

মুসাকে গাড়িতে রেখে ঘরে ফিরে এল কিশোর।

পেছনের সীটে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে গায়ে কম্বল টেনে দিল মুসা। মনে হলো মুহূর্তের জন্যেও আর দু'চোখের পাতা এক করতে পারবে না।

কিন্তু পারল। তবে গাঢ় হলো না ঘুম। একের পর এক দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল। আবার দেখল সেই স্বপ্নটা—ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে আর তার নানা। লোকে হাসাহাসি করছে। সরে যাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, কিন্তু নানা তাকে যেতে দিচ্ছে না।

ঘুম ভেঙে গেল তার। সবে সূর্য উঠছে তখন। গাছের ডালে কলরব করছে পাখিরা। মুসা দেখল, লাল জগিং স্যুট পরা মোটা এক মহিলা গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে তাকে।

মুসা চোখ মেলতেই জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কি?'

উঠে বসল মুসা। পরনে কেবল জাঙ্গিয়া। নামার সময় তাড়াহুড়োয় অন্য কাপড় না পরে কোমরে শুধু কম্বল জড়িয়ে বেরিয়েছিল। স্বপ্নটা সত্যি হয়ে যাচ্ছে দেখে ধক করে উঠল বুক। পিছলে সীট থেকে মেঝেতে নেমে গেল সে।

সন্দেহ হলো মহিলার। চোর-টোর নাকি? দরজার হাতল ধরে টান দিল।

খাইছে! ভাগ্যিস ঘুমানোর আগে তালা লাগিয়ে রেখেছিলাম! মরিয়া হয়ে চিৎকার করে বলল, 'আপনি যান! সরুন!'

ভাল করে কম্বল টেনে শরীরের নিচের অংশ ঢেকে দিল সে। গেল না মহিলা। জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে আরও বেশি করে উঁকি দিতে লাগল। আর কোন উপায় না দেখে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল মুসা। কোমরে কম্বল জড়ানো।

'গাড়িতে কি করছিলে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল মহিলা।

'ঘু-ঘুমাচ্ছিলাম! এটা আমাদেরই গাড়ি!'

'কেন, হোটেলে কি জায়গার অভাব?'

'না, তা নয়…' কোমরে পেঁচানো কম্বল চেপে ধরে হাঁটতে শুরু করল মুসা।

ভুরু কুঁচকে ফেলল মহিলা, 'ব্যাপার কি, অমন করছ কেন? তোমার বাবা-মা সঙ্গে আসেনি? এ ভাবে ছেলেকে গাড়িতে ঘুমাতে ছেড়ে দিল? কাজটা কি ঠিক করেছে?'

'না, ম্যাম,' কোনমতে দায়সারা জবাব দিয়ে মোটেলের দরজার দিকে দৌড় দিল মুসা।

হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল মহিলা। বিড়বিড় করে বলল, 'কি সাংঘাতিক

কিপটেরে বাবা! পয়সা বাঁচাল! ছেলেকে গাড়িতে পাঠিয়ে নিজেরা ঘরে শুয়ে আছে আরাম করে! আরেকটা ঘর ভাড়া নিতে এমন কি-ই বা খরচ হত!'

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে ওপরে উঠে এল মুসা। দরজায় ধাক্কা দিল। খুলে দিল রবিন।

ভেতরে ঢুকে সব বলল মুসা। শেষে বলল, 'নানাকে বলার দরকার নেই! শুনলেই যাবে মহিলার সঙ্গে ঝগড়া করতে!'

হাসতে লাগল রবিন।

রেডউড হাইওয়ে ধরে সেদিন আরও উত্তরে এগিয়ে চলল ওরা। ফুরফুরে মেজাজে আছেন রাবাত। পথের দুই ধারে রেডউডের জঙ্গল তাঁর স্মৃতিকে নাড়া দিয়ে চলেছে। মনে পড়ছে বহুদিন আগের কথা। সেদিন এ পথে যাওয়ার সময় বয়েস ছিল অনেক কম, পাশে ছিল তরুণী স্ত্রী। আর আজ!

জিজ্ঞেস করলেন, 'মুসা, তোর নানীর কথা মনে আছে?'

নানার এই আচমকা প্রশ্নে অবাক হয়ে গেল মুসা। 'আছে, অল্প অল্প। খুব ভাল অ্যাপল কেক বানাতে পারত নানী।'

'আরও অনেক কিছু পারত,' বিষণ্ণ হয়ে গেলেন রাবাত। 'আমাকে ছাড়া একটা মুহূর্ত থাকতে পারত না। আর এখন! মানুষ মরে গেলে কত দূর হয়ে যায়!'

স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। এক খোলসে যেন দু'জন মানুষ। একজন অতি কোমল হৃদয়ের স্নেহপ্রবণ স্বামী এবং নানা, যিনি তাঁর মৃত স্ত্রীর কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে যান, নাতিকে ভালবাসেন, ভালবাসেন তার বন্ধুদেরও। আরেকজন সাংঘাতিক বদমেজাজী পাগলাটে এক বৃদ্ধ, পড়শীকে যিনি সারাক্ষণ সন্দেহ করেন, দু'চোখে দেখতে পারেন না, একবিন্দু সহ্য করতে পারেন না। যদিও সহ্য করার মত লোক নয় হ্যারিস মিলার। তারও দোষ আছে। বাগান করার যন্ত্রপাতি চুরি করে খামখেয়ালী একজন মানুষকে খেপানোর কি দরকার?

আচ্ছা, পেছনে লেগেছে কেন মিলার? কাকতালীয় ঘটনা বলে আর মেনে নিতে পারছে না কিশোর। রাতে দ্বিতীয়বার এল কেন মিলার? তবে কি রাবুনানার কথাই ঠিক? তাঁর আবিষ্কারের ফর্মুল কেড়ে নিতে চায় মিলার? আবিষ্কারটা কি? কোন সূত্র নেই, সুতরাং কি জিনিস হতে পারে আন্দাজও করতে পারছে না সে। জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। ইচ্ছে করে না বললে তাঁর মুখ থেকে কিছু বের করতে পারবে না।

মিলারের আচরণ যেহেতু সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে, তার ব্যাপারে জানা দরকার। আলোচনা শুরু করার জন্যে বলল, 'অর্কিডের কথা ভাবছি।'

কিশোরের এই অপ্রাসঙ্গিক কথায় অবাক হলো রবিন। 'অর্কিড! কিসের অর্কিড?'

'কেন, ভুলে গেছ, মিস্টার মিলার অর্কিডের চাষ করে?'

'হ্যাঁ, করে,' জবাব দিলেন রাবাত।

তার কথায় যোগ দেবেন তিনি, এটাই চাইছিল কিশোর। বলল, 'কিন্তু

বাগান করার মত ধৈর্য তাঁর আছে বলে তো মনে হয় না। লনের ঘাস কাটার ইচ্ছে হয় না যার, সে অর্কিডের চাষ করে, ভাবতে কেমন অবাক লাগে না?'

'লনের ঘাস কাটলে তো আর পয়সা আসে না, কাটবে কেন? গাছ, ফুল কিংবা বাগানের প্রতি কোন আগ্রহ নেই মিলারের, তার একমাত্র আগ্রহ—টাকা। অর্কিডের পেছনে সময় ব্যয় করে টাকা আসে বলে। ফুল বিক্রেতারা তার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যায়। একটা অর্কিড ক্লাবের সদস্য সে। মাসে একবার করে মিলিত হয় সবাই। তখন ওর মতই কিছু পাগলকে অর্কিড দেখাতে বাড়ি নিয়ে আসে মিলার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিনা লাভে আনে না। ওদের কাছ থেকেও কিছু না কিছু হাতিয়ে নেয় সে। অন্য কিছু আদায় করতে না পারলে কায়দা করে ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। মাঝেমধ্যেই দেখি অপরিচিত একজন ওর গ্রীনহাউসে কাজ করছে।'

'কারা ওরা?'

'হবে ওর ক্লাবের কোন বোকা লোক।'

'এখন কেউ আছে নাকি?' জানতে চাইল কিশোর।

'কি জানি! ও সব নিয়ে মাথা ঘামাই না। অত পাজি মানুষ আমি জীবনে দেখিনি! অভদ্র! এই ব্লকে যখন প্রথম এল, কি করেছিল জানো? একবার আমার পানির পাইপে গোলমাল দেখা দিল। পানি সরবরাহ বিভাগকে খবর দিলাম। এসে দেখল মেইন লাইনে ছিদ্র হয়ে গেছে, সেটা দিয়ে সব পানি বেরিয়ে যায়। সারানোর সময় আমার বাড়িতে পানি সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। খাওয়ার পানি নেই ঘরে। ভাবলাম, কি আর হবে, পড়শীই তো, একটা কেটলি নিয়ে মিলারের বাগানের কলে গেলাম পানি আনতে। কি করল সে জানো?'

'নিশ্চয় পুলিশ ডাকল?' অনুমানে বলল রবিন।

'ডাকার হুমকি দিল। অবাক হয়ে গেলাম। আরও অভিযোগ করল, আমি নাকি তার লাইনের সঙ্গে হোস পাইপ লাগিয়ে পানি চুরি করে নিয়ে যাই বাগানে দেয়ার জন্যে। যেন ওই ক'টা টাকার পানি চুরি করার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছি আমি!'

মিলারের কথা বলতে গিয়ে রেগে যাচ্ছেন রাবাত। এই প্রথম রেডউডের জঙ্গলের ওপর থেকে নজর সরে গেল তাঁর।

'মিলারটা একটা প্যারানয়েড, কোন সন্দেহ নেই,' বললেন তিনি। 'এই জন্যেই ওরকম ভাবনা মাথায় ঢোকে। প্যারানয়েড কাকে বলে জানো? মগজের এক ধরনের রোগ। এ সব রোগীরা সব মানুষকেই সন্দেহের চোখে দেখে। ভাবে, এই বুঝি কেউ তার সব জিনিস চুরি করে নিয়ে গেল, তার ক্ষতি করতে এল। মিলার একটা প্যারানয়েড!' কথাটা আবার বললেন তিনি।

রাবাতের রাগ চরমে পৌঁছার আগেই তাঁকে থামানো দরকার। আপাতত মিলারের ভাবনা তাঁর মাথা থেকে দূর করতে না পারলে অবস্থা কোন দিকে গড়াবে বলা যায় না। তাই চুপ হয়ে গেল কিশোর। ও ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না।

নীরবে গাড়ি চালালেন রাবাত। দিনটা চমৎকার, রেডউডের জঙ্গলেরও

এক ধরনের আকর্ষণ আছে, যা খুব তাড়াতাড়িই রাগ কমিয়ে দিল তাঁর।

পথে কোন অঘটন ঘটল না। ক্যালিফোর্নিয়ার সাগর তীরের ছোট্ট শহর ক্রিসেন্ট সিটিতে নিরাপদে পৌছল ওরা। সূর্য তখন দিগন্ত সীমার প্রায় কাছাকাছি নেমে গেছে। একটা মোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে আগে গোসল সেরে নিল সবাই। তারপর বেরোল শহরটা ঘুরে দেখতে।

মনটিরের ফিশারম্যান ওআর্ফ জেটির তুলনায় এখানকার জেটিটা অনেক ছোট। তবে বেশ ছিমছাম। পানির ধারে পার্কিঙের জায়গা আছে, কয়েকটা রেস্টুরেন্ট আর গোটা দুই বড় ধরনের দোকানও আছে। রেস্টুরেন্টগুলোর কাছ থেকে কিছুটা দূরে নৌকা বাঁধার জায়গা। ছোট জেটি হলেও যথেষ্ট সরগরম। নৌকা পরিষ্কার করছে কয়েকজন মাল্লা। কেউ পরিষ্কার করছে, কেউ বা ছেঁড়া পাল মেরামতে ব্যস্ত। সী-গাল উড়ছে। বেড়াতে আসা দম্পতিরা অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে পাকা চত্বরে, সূর্যাস্ত দেখছে।

'মিলারকে বোধহয় এড়ানো গেল,' আচমকা বলে বসলেন রাবাত।

এই রে, সেরেছে! শঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। ভেবেছিল, অর্কিড ব্যবসায়ীর কথা ভুলে গেছেন নানা। কিন্তু না, ভোলেননি। মেজাজ এখন কেমন হয়ে যায়, কে জানে!

'আসার সময় রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখেছিলাম,' রাবাত বললেন, 'কোন গাড়িকে আমাদের লেজে লেগে থাকতে দেখিনি। কাল রাতে তোদের তাড়া খেয়ে ভয় পেয়েছে শেয়ালটা, তাতেই মুরগী চুরির লোভ উবে গেছে।'

'হবে হয়তো,' হেসে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলোচনাটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করল মুসা।

রাস্তায় অনেকগুলো ইঞ্জিনের শব্দ আর হই-চই শোনা গেল।

সাতটা মোটর সাইকেল ছুটে আসছে জেটির দিকে। আরোহীরা সবাই তরুণ, কালো চামড়ার জ্যাকেট পরা।

'হুঁমম!' মাথা দোলালেন রাবাত। 'চালচলন ভাল মনে হচ্ছে না!'

আসলেই ভাল নয় ওরা। বেশির ভাগেরই দাড়ি আছে। কারো ঘন চাপদাড়ি বিচিত্র ছাঁটে কাটা হয়েছে, কারও বা পাতলা ফিনফিনে, লম্বা লম্বা দাড়ি। সেগুলো এমনিতেই বিচিত্র, কাটার আর প্রয়োজন পড়েনি। কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্ট, কব্জিতে রিস্টব্যান্ড, হাতে গ্লাভস—সব কিছুতেই ছোট-বড় নানা আকারের লোহার কাঁটা বসানো। হলিউডের ছবিতে দেখানো ভয়ঙ্কর মোটর সাইকেল গ্যাঙের এ যেন বাস্তব রূপ।

'হাই, কালু নানা!' কাছে এসে চিৎকার করে উঠল এক আরোহী। মোটর সাইকেলের সামনের চাকা রাবাতের গায়ে তুলে দেয়ার ভঙ্গি করে সরে গেল। হি-হি করে গা জ্বালানো হাসি হাসল।

তিন গোয়েন্দা ভাবল এখনই ভীষণ রাগে ফেটে পড়বেন রাবাত। কিন্তু পড়লেন না। ওদের অবাক করে দিয়ে বরং দলটার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসলেন। বললেন, 'এদের মধ্যে একটা ছেলেও ভাল নেই। সব পচা ডিম।'

'নানা, চলো চলে যাই!' ঘাবড়ে গিয়ে বলল মুসা।

চত্বরের শেষ মাথায় চলে গেছে দলটা। প্রায় একসঙ্গে ঘুরে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াল। ক্লাচ চেপে ধরে, এক্সিলারেটর বাড়িয়ে দিয়ে ইঞ্জিনের বিকট গোঁ-গোঁ শব্দ তুলে রাবাতকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করল। তিন কিশোর আর একজন বুড়োর ক্ষমতা কতখানি আন্দাজ করছে।

হাত ধরে টানল মুসা, 'নানা, চলো!'

'ইইইই-ইআআআ!' বলে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল এক আরোহী। দলটার দলপতি।

গর্জে উঠল তার ইঞ্জিন। সোজা ছুটে আসতে লাগল রাবাত আর ছেলেদের লক্ষ্য করে।

'কাছাকাছি থাকো,' ছেলেদের আদেশ দিলেন রাবাত, 'নড়বে না!' আগে চলে গেলেন তিনি, লোকটার আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্যে।

ভয়ে পেটের ভেতরে খামচি দিয়ে ধরল যেন কিশোরের।

নেতার পেছনে ভয়ানক গতিতে ছুটে আসছে বাকি ছয়জন। দাঁত বের করে হাসছে। একটা জিনিস শূন্যে ছুঁড়ে দিল একজন। কাঁটা বসানো একটা বেল্ট। ওটার বাড়ি শরীরে পড়লে কি অবস্থা হবে কল্পনা করে শিউরে উঠল কিশোর।

গোয়েন্দাদের চারপাশে জেটির লোক আর ট্যুরিস্টরা ছুটাছুটি করে সরে যাচ্ছে। কে যেন চিৎকার করে বলল, 'পুলিশকে ফোন করো!'

ইঞ্জিনের গর্জন তুলে রাবাতের পাশ কেটে চলে গেল মোটর সাইকেলগুলো। কয়েক গজ গিয়ে ঘুরে আবার ছুটে আসতে লাগল। আরোহীদের অট্টহাসি তুঙ্গে উঠেছে।

রাবাত আর তিন গোয়েন্দাকে ঘিরে ফেলল ওরা। ঘুরতে ঘুরতে ছোট করে আনছে বৃত্ত। ভেতরে আটকা পড়েছে ওদের শিকার। এক মারাত্মক খেলায় মেতেছে।

আচমকা বৃত্ত ভেঙে দিয়ে রাবাতের দিকে সাইকেলের নাক ঘোরাল দলপতি। তীব্র গতিতে ছুটে এল রাবাতের দিকে। মাত্র হাতখানেক দূরে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল। ওর ফিনফিনে দাড়ির ওপরে চৌকো একটা চোয়াল, বড় বড় দাঁত, কালো কুতকুতে চোখ। সাতটা ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল সে।

নড়ে উঠলেন রাবাত। নড়াটা এত সামান্য, প্রায় চোখেই পড়ল না গোয়েন্দাদের। মনে হলো, কি যেন ছুঁড়ে দিলেন।

পিস্তলের গুলি ফোটার মত টাস্স্ করে শব্দ হলো। দেখা দিল এক ঝলক কালো ধোঁয়া। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে ঢেকে দিতে লাগল মোটর সাইকেল আরোহীকে।

কুতকুতে চোখে ভয় দেখা দিল। হাসির বদলে মুখ থেকে বেরিয়ে এল চিৎকার। মেঘের ভেতর থেকে সরে যাওয়ার জন্যে এত জোরে মোটর সাইকেল ঘোরাতে গেল, চাকা পিছলে পড়ে গেল কাত হয়ে।

আবার নড়ে উঠলেন রাবাত। আবার শোনা গেল তীক্ষ্ণ শব্দ, এবং তারপর ধোঁয়া।

পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল বিমূঢ় আরোহীরা। দিশেহারা হয়ে গেছে যেন। পাগলের মত এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছে অদৃশ্য রহস্যময় পিস্তলধারীকে। কার গায়ে গুলি লেগেছে বোঝার চেষ্টা করছে।

হাইওয়েতে সাইরেন শোনা গেল। পুলিশ আসছে।

ছাতের ওপরে আলো ঘোরাতে ঘোরাতে জেটির দিকে ছুটে এল পুলিশের দুটো গাড়ি।

মোলায়েম হাসি হেসে রাবাত বললেন, 'চলো, ছেলেরা, খিদে পেয়েছে।'

পানির কিনারের একটা রেস্টুরেন্টের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। তাকে অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা।

রেস্টুরেন্টের দরজায় লোকের ভিড়। রাবাত কাছাকাছি হতেই সরে গিয়ে ঢোকার জায়গা করে দিল।

তাঁর কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করল একজন, 'কোথাও লাগেনি তো?'

'ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া উচিত হয়নি আপনার,' আরেকজন বলল। 'নরকের ইবলিস একেকটা! পুলিশ আসাতে বাঁচলেন!'

'পুলিশ আসাতে আমি নই,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন রাবাত, 'ওরা বেঁচেছে। কতটা ক্ষতি যে করতে পারতাম জানেই না!'

আট

রেস্টুরেন্টের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন রাবাত। মোটর সাইকেল গ্যাঙের লোকগুলোকে ধরেছে পুলিশ। লাইসেন্স দেখছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখাতে বাধ্য হচ্ছে আরোহীরা।

'তাড়া না থাকলে ওদের বিরুদ্ধে নালিশ করতাম,' বললেন তিনি। 'জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়তাম ব্যাটাদের। কিন্তু এখন ওসব করার সময় নেই।' খাবারের একটা মেন্যু খুললেন।

একে একে স্টার্ট দিতে আরম্ভ করল লোকগুলো। একসঙ্গে দল বেঁধে পাশাপাশি এগিয়ে চলল পানির কিনার ধরে। গাড়িতে উঠল পুলিশ অফিসারেরা। দলটার পেছনে চলল।

'হাজতে নিয়ে যাচ্ছে নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে হয় না,' রাবাত বললেন। 'শহর থেকে বের করে দিয়ে আসতে যাচ্ছে হয়তো।'

'নানা, শব্দটা কি করে হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

‘শব্দ? কিসের শব্দ?’ মেন্যুতে মনোযোগ রাবাতের, মোটর সাইকেল আরোহীদের কথা যেন ভুলেই গেছেন।

‘ওদের দিকে কিছু একটা ছুঁড়ে দিয়েছিলে তুমি। পিস্তল ফোটার মত শব্দ হয়েছিল। কিসের শব্দ? বাজি?’

‘না না, বাজি হবে কেন! বাজি পোড়ানো অনেক শহরে নিষেধ। আমার খুদে আবিষ্কারগুলোর একটা ব্যবহার করেছি। বাজারে ছাড়লে খুব জনপ্রিয়তা পাবে। চলবে ভাল। অতি সাধারণ একটা জিনিস, অথচ ভয়াবহ শব্দ করে, ধোঁয়া ছড়ায়, কিন্তু শরীরের ক্ষতি করে না; সুতরাং বেআইনী বলতে পারবে না পুলিশ। বরং অপরাধীদের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে নিরীহ মানুষকে। দেখলেই তো, কি করে ভয় ঢুকিয়ে দিলাম শয়তানগুলোর মনে।’

হাসল মুসা। ‘দেখলাম। কিন্তু বাজারে ছাড়লেই তো অপরাধীদের জানা হয়ে যাবে ওটা কি জিনিস, আর ভয় পাবে না। তখন কি হবে?’

‘তখন আমি ওগুলো ডাকপিয়নদের কাছে বিক্রি করব,’ হাসিমুখে জবাব দিলেন রাবাত। ‘কল্পনা করতে পারবি না চিঠি বিলি করতে গিয়ে কি বিপদে পড়ে ওরা। জঘন্য সব কুত্তা পালে আজকাল লোকে।’

আবার মেন্যুতে মন দিলেন তিনি।

পরদিন দুপুর একটা নাগাদ অরিগনের পোর্টল্যান্ড পেরোল ওরা। রাস্তার পাশে সাইনবোর্ড দেখে মুসা বলল, ‘নানা, এখানে থামবে? সেইন্ট হেলেনস পর্বতমালা দেখার ইচ্ছে আমার বহুদিনের।’

‘থামব তো বটেই,’ রাবাত বললেন। ‘একসঙ্গে অতগুলো জীবন্ত আগ্নেয়গিরি দেখার ভাগ্য ক’জনের হয়? সুযোগ যখন পাওয়া গেছে সেটা অবশ্যই কাজে লাগানো উচিত।’

হাইওয়ে থেকে সরে এলেন তিনি। মোচড় খেয়ে খেয়ে উঠে যাওয়া পাহাড়ী পথ ধরে উঠতে আরম্ভ করলেন। আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে আসতে লাগল দিনের আলো। ঝপাঝপ করে যেন গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল মেঘের ভেলা। আকাশময় এখানে উড়ে বেড়াচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ।

শেষ মাথায় উঠে এল ওরা। ভেবেছিল এখানে উঠলেই চোখে পড়বে মাউন্ট সেইন্ট হেলেনস। মেঘের ওপরে উঠে এসেছে, অনেক নিচে ভাসছে মেঘের ভেলাগুলো। পুবে তাকাল। পর্বতমালাটা ওদিকেই থাকার কথা। কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। পর্বত চোখে পড়ল না। কেবল ঘন ধূসর ধোঁয়া ভলকে ভলকে ওপরে উঠছে, ছেয়ে দিয়েছে আকাশ।

‘খাইছে!’ কোনমতে বলল মুসা।

হেসে তার নিরাশা দূর করার চেষ্টা করলেন রাবাত, ‘অত মন খারাপ করছিস কেন? পুরো দেশটাই আমাদের সামনে পড়ে আছে। ভাল ভাল দৃশ্য প্রচুর দেখতে পাবি।’

গাড়ি ঘুরিয়ে আবার নামতে লাগলেন তিনি। কিছুদূর নামার পর হঠাৎ নামল ঝমঝম করে বৃষ্টি। ভিজিয়ে দিল গাড়ির কাঁচ। অস্পষ্ট হয়ে গেল সামনের আর আশপাশের সব কিছু।

হাইওয়ে ফাইভ-এ পৌঁছে দেখা গেল অনেক গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে দিয়ে চলছে। বৃষ্টিতে অন্ধকার হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিলেন রাবাত, সেদিন এর বেশি আর এগোবেন না, ওয়াশিংটনের লঙভিউতে রাত কাটাবেন। নিজের পরিকল্পনা নিয়ে এতই মগ্ন রইলেন, রাস্তার ধারে থেমে থাকা লিংকন গাড়িটাকে শুরুতে খেয়াল করলেন না। আলো জ্বালেনি ওটা। ওয়াইপার চলছে। এগজস্ট থেকে একঝলক সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে মিশে গেল ভেজা বাতাসে।

গাড়িটা চোখে পড়তেই শক্ত হয়ে গেল কিশোর।

লিংকনের ড্রাইভিং হুইলে ঝুঁকে রয়েছে একজন লোক। কে? হ্যারিস মিলার? সান্তা মনিকায় এ রকম একটা গাড়ি দেখেছিল, ওটাই কিনা নিশ্চিত হতে পারল না। এ পথে ধূসর লিংকনের অভাব নেই। তার মধ্যে কোনটা মিলারের কে বলবে? নম্বর প্লেট একবার দেখেই মুখস্থ করে ফেলল নম্বরটা: 111-XTJ.

'মিলার!' আচমকা সবাইকে চমকে দিয়ে হিসহিস করে উঠলেন রাবাত। চোখে পড়ে গেছে লিংকনটা। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলেন। বেজে উঠল একঝাঁক হর্ন। তীব্র প্রতিবাদ জানাতে লাগল পেছনের গাড়িগুলো।

'জলদি চালাও, নানা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

রাস্তার মাঝখানে এ ভাবে ব্রেক কষা মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। ঠিক পেছনের গাড়িটা এসে বাম্পারে গুঁতো মারার আগেই আবার এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়ালেন রাবাত। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বুইক। অল্পের জন্যে গুঁতো খাওয়া থেকে বেঁচে গেল। দুর্ঘটনাটা ঘটল না। গায়ে কাঁপুনি উঠে গেছে ছেলেদের। কিন্তু রাবাতের কোন ভাবান্তর নেই, তিনি স্বাভাবিক রয়েছেন।

'ভয় পেয়েছ! সরি!' বললেন তিনি। 'গাড়িটা দেখে আর সামলাতে পারলাম না···শিওর ওটাতে মিলার বসে আছে।'

ফিরে তাকাল ছেলেরা। রাস্তার পাশে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে লিংকন, বৃষ্টি-ভেজা ধূসরতার মাঝখানে ধূসর একটা অবয়বের মত।

'থাকুক না, আমাদের কি?' কিশোর বলল, 'অনুসরণ তো আর করছে না। রাস্তার ধারে পার্ক করে হয়তো রোড ম্যাপ দেখছে···গাড়ি খারাপ হয়েও থাকতে পারে।'

'আমাদের অনুসরণ করার জন্যে পিছে পিছে আসার দরকার পড়বে না তার। এই রাস্তা ধরে কতদূর যেতে পারব আমরা, জানে। সীটলের বেশি যে যেতে পারব না, তা-ও জানে। এ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হয়তো আমাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করছে, বোঝাতে চাইছে পেছনে আসছে না।'

আর কোন কথা হলো না। উত্তরমুখো গাড়ির ভিড়ে মিশে রাবাতও এগিয়ে চললেন। লংভিউতে পৌঁছে শহরের গভীরে ঢুকে গেলেন। হাইওয়ে থেকে দূরে একটা মোটেলের ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলেন। এখানে উঠলে তাদের খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে মিলারের। অবশ্য যদি সে আদৌ বের

করতে চায়।

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' রাবাত বললেন। 'জীবনে কখনও কোন লড়াই থেকে পালিয়ে আসিনি। এখন যে এড়িয়ে থাকতে চাইছি, সেটাও সামান্য সময়ের জন্যে। শিক্ষা ওকে আমি একটা দিয়েই ছাড়ব, তবে সেটা পরে। আপাতত নিরাপদে নিউ ইয়র্কে পৌঁছতে চাই; আর চলার পথে যতটা সম্ভব আনন্দ। এখনই ঝগড়া বাধিয়ে সব পণ্ড করতে চাই না।'

সমস্যা আর বিপদ থেকে পালানোর স্বভাব তিন গোয়েন্দারও নয়, বরং মুখোমুখি হতেই ওরা ভালবাসে। কিন্তু এই কেসটাতে এখন পর্যন্ত কেবল পালিয়েই চলেছে ওরা। মিলার যদি পেছনে লেগেও থাকে, সামনাসামনি এসে কিছু না করা পর্যন্ত ওদের কিছু করার নেই। আক্রমণটা আগে তার তরফ থেকেই আসতে হবে। মিলার পেছনে লেগেছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনও। কেবল সন্দেহের ওপর নির্ভর করে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে খারাপ আচরণ করাটা ঠিক নয়।

মাঝরাতের পর হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কানে এল পাশের ঘরে রাবুনানার বিকট নাক ডাকানোর শব্দ। তবে এই শব্দ আর এখন বিরক্ত করে না ওকে, গা সওয়া হয়ে গেছে, এর জন্যে ঘুম ভাঙেনি ওর। ভেঙেছে জানালায় হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো পড়ায়। মোটেলের ড্রাইভওয়েতে ঢুকে চলতে চলতে যেন থেমে গেল একটা গাড়ি।

দরজা খোলার শব্দ হলো। ইঞ্জিন বন্ধ করল না ড্রাইভার। দ্রুত পদশব্দ থমকে গেল আচমকা, তারপর আবার শোনা গেল।

বিছানা থেকে নামল কিশোর।

সে জানালার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, বড় একটা গাড়ি ঘুরে নেমে যাচ্ছে রাস্তায়।

লিংকনটাই? নিশ্চিত হতে পারল না।

বিছানায় ফিরে এল আবার সে। বুঝতে পারছে, রাবুনানার মত সে-ও মিলারকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে। অথচ এখন পর্যন্ত মিলার কোন ক্ষতি করেনি ওদের। বুইকটার ক্ষতি করেনি। রাতের বেলা চুপি চুপি ঘরে ঢুকে খোঁজাখুঁজি করেনি। পিছু পিছু আসার ব্যাখ্যা সহজেই দেয়া যায়—হয়তো সে-ও বেড়াতে বেরিয়ে একই দিকে চলেছে।

আচ্ছা, কি জিনিস আবিষ্কার করেছেন রাবুনানা? কি নিয়ে চলেছেন নিউ ইয়র্কে? কোথায় রেখেছেন ওটা? ছোট জিনিসই হবে, যা সুটকেসে ভরে রাখা যায়। বড় কিছু লুকানোর জায়গা নেই, গাড়িটাতেও না, তাহলে ওদের চোখে পড়তই। আর গাড়িতে রাখার জায়গাই বা কোথায়?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। সকালে ঘুম ভাঙলে দেখল তার অনেক আগে উঠে পড়েছে মুসা আর রবিন। কাপড় পরে তৈরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করতে হবে ওকে।

ওয়াশিংটনের ভেতর দিয়ে সেদিন পুবে এগোল ওরা। ওপরে উঠছে পথ। কাসকেড মাউনটেইন রেঞ্জ পার হয়ে এসে পড়ল খোলা অঞ্চলে। দুই পাশে

রুক্ষ ছড়ানো প্রান্তর।

'হায় হায়, এ যে মরুভূমি!' নিরাশা ঢাকতে পারল না মুসা। 'আমি তো ভেবেছিলাম পুরো ওয়াশিংটনটাই শুধু পাইনের জঙ্গল।'

'বোকার মত ভাবলে তো কত কিছুই ভাবা যায়,' নানা বললেন।

স্পোক্যানি পার হয়ে আবার পার্বত্য অঞ্চলে ঢুকল ওরা। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্না রাস্তার পাশ দিয়ে বইছে, থেকে থেকেই দু'পাশ থেকে চেপে আসছে জঙ্গল।

ইডাহোর কয়েউর ডি'অ্যালিনিতে রাত কাটানোর জন্যে থামল ওরা। লংভিউতে শহরের অনেক ভেতরে অখ্যাত ছোট মোটেলটার মতই কোন মোটেলে ওঠার ইচ্ছে। অবশ্যই মিলারের ভয়ে। যাতে সে খুঁজে বের করতে না পারে।

'সারাদিনে অবশ্য ছায়াও দেখিনি,' বললেন তিনি। 'রিয়ারভিউ মিররে পলকের জন্যেও দেখিনি গাড়িটাকে। তবু ঝুঁকি নেব না। লুকিয়েই থাকব। আমাদের খুঁজে না পেলে সে ভাববে হয় আমরা স্পোক্যানিতে রয়েছি, নয়তো আরও এগিয়ে মিসৌলাতে চলে গেছি।'

'যদি আমাদের পিছু নিয়ে থাকে, তবেই,' মিলারের কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না মুসার। মনেপ্রাণে চাইছে লোকটাকে নিয়ে আলোচনা বন্ধ হোক।

খাওয়ার টেবিলে পড়শীর কথা আর তুললেন না রাবাত। খাওয়ার পর গলফ খেলতে বেরোলেন। সামান্য সময় খেললেন। তখনও কিছু বললেন না। সবচেয়ে বেশি স্কোর করলেন তিনি। ছেলেদের নিয়ে মোটেলে ফিরে এলেন। বেশ হাসিখুশি লাগছে তাঁকে।

রাতের বেলা ওদের গভীর ঘুম ভাঙিয়ে দিল সাইরেনের তীক্ষ্ণ চিৎকার। সারা বাড়িতে আলোড়ন তুলে বেজেই চলল, বেজেই চলল।

'খাইছে!' বিছানায় উঠে বসে মুসা বলল, 'ঘটনাটা কি?'

থামছে না সাইরেন। কানের পর্দা ছিদ্র করে দিয়ে যেন ঢুকে যাচ্ছে মগজে।

হঠাৎ জবাবটা পেয়ে গেল সে। চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, রবিন, জলদি ওঠো!' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে নিচে নামল। 'স্মোক অ্যালার্ম! আগুন লেগেছে মোটেলে!'

নয়

রাতের নীরবতা চিরে দিয়ে যেন বেজে চলেছে ধোঁয়ার সঙ্কেত।

লোকের ছুটাছুটি আর হট্টগোল কানে এল গোয়েন্দাদের। দড়াম দড়াম করে বন্ধ হলো গাড়ির দরজা। ধোঁয়ায় ভারী হয়ে গেছে বাতাস।

দমকলকে ফোন করল কিশোর।

পাজামা পরেই ছুটে বেরোল মুসা। নানার দরজায় থাবা দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'নানা! নানা! ওঠো জলদি! মোটেলে আগুন লেগেছে!'

কাশতে কাশতে টলোমলো পায়ে এসে দরজা খুলে দিলেন রাবাত।

সাইরেন বাজছে!

ইতিমধ্যে প্যান্ট পরে ফেলেছে রবিন। বেরিয়ে গিয়ে মোটেলের গেস্টদের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডেকে তুলতে শুরু করল তাদের।

লাল গাউন পরা এক মহিলা দরজা খুলল। চোখ জ্বালা করছে। ডলতে ডলতে জানতে চাইল, 'কি হয়েছে?'

'মোটেলে আগুন লেগেছে,' জানাল রবিন।

যেন ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে গেল মহিলা। ভেতরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'পিটার, জলদি ওঠো! তখনই বলেছিলাম এই খোঁয়াড়ের মধ্যে থাকার দরকার নেই! এটা একটা জায়গা হলো!'

রাবাত আর অন্য দুই গোয়েন্দাও কাপড় পরে ফেলেছে। একপাশ থেকে দরজা ধাক্কাতে শুরু করল সবাই, বোর্ডারদের জাগিয়ে দিতে লাগল। ওদের চারপাশে ধোঁয়া উড়ছে। বাড়িটা U প্যাটার্নে তৈরি। মনে হচ্ছে U-র একটা মাথা থেকে আসছে।

কি যেন পড়ার শব্দ হলো। তারপর ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল। গাড়ির কাঁচ। চত্বরের পার্কিং লটে ইনডিয়ানার নম্বর-প্লেটওয়ালা একটা গাড়ি তাড়াহুড়ো করে পিছাতে গিয়ে ওরিগনের প্লেট লাগানো একটা গাড়িকে গুঁতো মেরে দিয়েছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে উঠল ওরিগনের ড্রাইভার, 'এই গাধা, দেখও না নাকি!'

জবাব দিল না ইনডিয়ানা। গাড়ি সরাতে ব্যস্ত।

ঘর থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে বোর্ডাররা। কাশছে, চোখ ডলছে। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে বিছানার কম্বল তুলেই গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে অনেকে। কেউ কেউ গাড়ির দিকে ছুটছে, গাড়িতে করে নিরাপদ জায়গায় পালাতে চায়। অন্যেরা চত্বরে জড়ো হলো কি ঘটে দেখার জন্যে।

'দমকলকে খবর দেয়া হয়েছে?' জানতে চাইল এক মহিলা।

'দিয়েছি,' জবাব দিল কিশোর, 'আসছে।'

'কিশোর, দেখো,' হাত তুলল মুসা।

বাড়িটার শেষ মাথার একটা দরজায় লেখা রয়েছে: EMPLOYEES ONLY. ধোঁয়া আসছে ওই দরজার ফাঁক দিয়ে।

'ওই ঘরেই লেগেছে,' বলে উঠল কিশোর। 'সরুন, সরুন সবাই; আগুনের কাছ থেকে সরে যান!'

দরজাটার কাছ থেকে সবাইকে সরিয়ে দিতে লাগল মুসা আর রবিন।

দমকলের সাইরেন শোনা গেল। দেখতে দেখতে সেটা বেড়ে গেল, তার সঙ্গে যুক্ত হলো ভারী ইঞ্জিনের শব্দ। এসে গেছে দমকল।

'কোথায় লাগল?' পুরানো বাথরোব পরা টাকমাথা ছোটখাট একজন

লোক জিজ্ঞেস করল। পরিচয় দিল, 'আমি মোটেলের ম্যানেজার।' একহাতে চাবির গোছা, আরেক হাতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র।

'ওই যে দেখুন দরজাটা,' হাত তুলে দেখিয়ে দিল কিশোর।

দ্রুত এগিয়ে গেল ম্যানেজার। খুলে ফেলল তালা। পাল্লা খোলার জন্যে নব চেপে ধরতেই বাধা দিল কিশোর, 'দাঁড়ান! খুলবেন না!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। টান দিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে ম্যানেজার। হাঁ হয়ে খুলে গেল পাল্লা। ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে এল যেন আগুনের চাদর, ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল ম্যানেজার, হাত থেকে খসে পড়ল ফায়ার এক্সটিংগুইশার। দু'হাত উঠে গেল মুখ ঢাকার জন্যে। প্রচণ্ড গরম বাতাসের ঢেউ এসে লাগল গোয়েন্দাদের ওপরও।

লোকটাকে সাহায্য করতে ছুটল মুসা। এক্সটিংগুইশার তুলে নিল রবিন। আগুনের দিকে তাক করে টিপে দিল ট্রিগার। তরল রাসায়নিক ফেনা ফিনকি দিয়ে বেরোল, পড়তে লাগল আগুনের মধ্যে।

দমকলের দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল মোটেলের সামনে। হুড়াহুড়ি করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ফায়ারম্যানেরা মুহূর্তে রবিনকে সরিয়ে দিল একপাশে। একজন একটা হোস তাক করে ধরল, তীব্র বেগে পানি গিয়ে পড়তে শুরু করল ঘরের মধ্যে। নিভে গেল আগুন। যেমন স্বয়ংক্রিয় ভাবে চালু হয়েছিল স্মোক অ্যালার্ম, আগুন নিভে যেতে ওটাও বন্ধ হয়ে গেল আপনাআপনি। ছোট ঘরটা একটা স্টোররুম। তেমন কিছু ছিল না। কয়েকটা পোড়া ন্যাকড়া, ঝাড়ু, একটা প্লাস্টিকের বালতি—পুড়ে গলে বিকৃত হয়ে গেছে, আর একগাদা কম্বল পুড়ে ছাইয়ের স্তূপ হয়ে আছে।

ঘরে ঢুকল একজন ফায়ারম্যান। ভেজা ছাইয়ের স্তূপের দিকে তাকিয়ে রইল একটা সেকেন্ড, তারপর লাথি মেরে ছড়িয়ে দিল। পোড়া কম্বলের একটা টুকরো তুলে নিয়ে শুঁকল। আনমনেই বলল, 'তেল তেল গন্ধ। তারপিন হবে। রঙ করা হচ্ছিল নাকি এখানে?' ম্যানেজারের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সে।

আগুনের আঁচ লেগে ম্যানেজারের একটা ভুরু পুড়ে গেছে। সেখানে হাত বোলাতে বোলাতে জবাব দিল, 'না, রঙ করবে কে! কয়েক মাস ধরে রঙের কাজ হয়নি মোটেলে।'

নাক কুঁচকে আবার শুঁকল ফায়ারম্যান। 'কাঠের জিনিস বার্নিশ করা হয়েছে?'

'না!' প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে এক হাতের সমস্ত আঙুল আরেক হাতে গুঁজে দিল ম্যানেজার। 'আর করলেও এ ভাবে তারপিন ভেজানো ন্যাকড়া এখানে ফেলতে দিতাম না।'

'কি জানি!' অনিশ্চিত শোনাল ফায়ারম্যানের কণ্ঠ। ফেলে দিল পোড়া টুকরোটা।

কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে শুনছেন রাবাত। নাক দিয়ে খোঁত-খোঁত করে বললেন, 'ফারগ্লো ব্যবহার করলেই আর এ সমস্যা হত না।'

'ফারগ্লোটা আবার কি জিনিস?' জানতে চাইল রবিন।

'নানার একটা আবিষ্কার,' মুসা বলল। 'ফেলে দেয়া কাগজের প্যাড দিয়ে তৈরি। কাঠের জিনিস বার্নিশ করতে এর তুলনা হয় না। তারপর যেখানে ইচ্ছে ছুঁড়ে ফেলো, আগুন লাগার ভয় নেই। আগুন ধরে না ওতে।'

'আইডিয়াটা একটা সোপ কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছিলাম আমি,' তিক্তকণ্ঠে বললেন রাবাত। 'ওরা কাজে লাগায়নি, আলমারিতে ভরে রেখে দিয়েছে!' সেই রাগেই যেন দুপদাপ পা ফেলে ঘরে ফিরে এলেন। ঢুকেই এমন চিৎকার দিয়ে উঠলেন যেন বোলতায় হুল ফুটিয়েছে।

'চোর! বদমাশ!' চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন তিনি, 'কিশোর! রবিন! মুসা! দেখে যা! চোরটার কাণ্ড দেখে যা!'

ছুটে এল তিন গোয়েন্দা।

'জলদি গিয়ে নিজেদের ঘর দেখো! কিছু নিয়েছে কিনা!' দরজায় দাঁড়িয়ে নিজের বিছানার দিকে তাকিয়ে আছেন রাবাত। ম্যাট্রেস উল্টে ফেলা হয়েছে। চাদর আর কম্বলগুলো মেঝেতে। ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে তাঁর কাপড়-চোপড়। মোজা আর আন্ডারওয়্যারগুলোও বাদ পড়েনি। শেভ করার আর দাঁত মাজার সরঞ্জাম ছিল যে বাক্সটায়, সেটাও উল্টে ভেতরের জিনিস ঝেড়ে ফেলা হয়েছে।

হাঁ হয়ে গেছে কিশোর। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নড়তে পারল না। তারপর রাবাতের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে বাথরুমে চলে গেল। পেছনের দেয়ালে বাথটাবের বেশ ওপরে একটা জানালা। সেটা খোলা। বাথটাবে জুতোর ছাপ দেখে বোঝা গেল জানালা দিয়ে এটাতে কেউ নেমেছিল।

টাবের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে জানালার হুড়কো পরীক্ষা করল সে। এক জায়গার রঙ চটে গেছে সামান্য।

'হুড়কো সরিয়ে কেউ জানালা খুলে ঢুকেছিল,' পেছনে দরজায় এসে দাঁড়ানো রাবাতকে বলল কিশোর। 'বেরিয়েছেও হয়তো একই পথে। দরজা দিয়েও বেরোতে পারে। আগুনের দিকে খেয়াল ছিল সবার, তাকে কেউ দেখেনি নিশ্চয়।'

পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এল রবিন। 'জানো কি কাণ্ড হয়েছে?'

মুসা বলল, 'জানি, আমাদের ঘরেও ঢুকেছিল, সব তোলপাড় করে ফেলেছে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ। কিন্তু যতটা দেখলাম, কিছু খোয়া গেছে বলে মনে হলো না।'

'মিলার! মিলার! ওই ব্যাটা ছাড়া কেউ না!' চেঁচিয়ে উঠলেন রাবাত। 'এখানেও এসেছে!'

'কি করে, নানা?' প্রশ্ন তুলল মুসা। 'পিছুটা নিল কি করে? কাল রাস্তার ধারে যেটা দেখেছি সেটা কার গাড়ি জানি না। যদি মিলারেরও হয়, কালকের পর আর দেখা যায়নি ওটাকে। পিছে পিছে না এলে আমরা যে এখানে আছি জানবেই বা কি করে?'

'পিছে আসাটা তেমন কঠিন না,' রাবাত বললেন। 'লিংকনটা ভাড়া করা

গাড়ি, ওর নিজের না। যেহেতু আমাদের চেনা হয়ে গেছে, ফেরত দিয়ে অন্য আরেকটা নিয়ে নিতে পারে। আমাদের একেবারে লেজে লেগে থাকলেও তখন আর চিনতে পারব না।'

কিশোরের মনে পড়ল, লংভিউতে মোটেলে রাতে একটা বড় গাড়ি চলে যেতে দেখেছিল। কিন্তু বলল না রাবাতকে, চেপে গেল। শুনলেই খেপে যাবেন।

ঘরের ছড়ানো জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'নানা, তোমার আবিষ্কারটা খোয়া গেছে কিনা দেখছ না?'

জবাব দিলেন না রাবাত। দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না। যেন তিনি জানেন, খোয়া যায়নি। লম্বা লম্বা পা ফেলে আবার চত্বরে বেরিয়ে এলেন। অনুসরণ করল ছেলেরা।

কিছু বোর্ডার তখনও আছে ওখানে। খেপে যাওয়া ম্যানেজারের লম্ফ-ঝম্প দেখছে। আগুন লাগিয়েছে যে, তাকে হাতে পেলে এখন কি কি করত, গলাবাজি করে বলছে। নিষ্ফল আক্রোশ। রাস্তায় অপেক্ষা করছে দমকলের গাড়ি। ইঞ্জিন চলছে। ড্রাইভওয়েতে ঢুকেছে একটা পুলিশের গাড়ি। ছাতের বাতিটা ঘুরছে। ঝিলিক ঝিলিক করে কমলা আলো ছিটিয়ে দিচ্ছে যেন বাড়িটার সামনের দেয়ালে।

স্টোররুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ অফিসার। কথা বলছে ফায়ারম্যানের সঙ্গে।

গটমট করে সেদিকে এগিয়ে গেলেন রাবাত। বললেন, 'কি করে লাগল সেটা নিয়ে অত মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আগুনটা লাগানো হয়েছে, ইচ্ছে করে।'

ফিরে তাকাল অফিসার আর ফায়ারম্যান। চোখে কৌতূহল। ফায়ারম্যান জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি করে জানলেন?'

'জানি!'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'কিশোর, শুরু হলো আবার!'

'হ্যারিস মিলার লাগিয়েছে ওই আগুন,' বলতে কোন রকম দ্বিধা করলেন না রাবাত। 'লাগিয়েছে যাতে আমার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাঁটতে পারে। আমার আর ওদের,' তিন গোয়েন্দাকে দেখালেন তিনি, 'ঘর দুটোকে তছনছ করে ফেলেছে। আগুন লাগালে যে সারা বাড়িতে লেগে যেতে পারে, এতগুলো লোক বিপদে পড়বে, ভাবলও না একবার; নিজের উদ্দেশ্য সাধনটাই তার কাছে বড়। ভীষণ স্বার্থপর। পুরো বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারত!'

রাবাতের দিকে তাকিয়ে হাসল ম্যানেজার। সব দাঁত বেরিয়ে পড়ল। এই প্রথম একজনকে পেল, তার পক্ষে বলছেন। চেঁচিয়ে বলল, 'সেই তখন থেকেই বলছি, তেল লাগানো ন্যাকড়া আমি ফেলতে দিই না! কাজের লোকদের কড়া হুকুম দেয়া আছে। অসাবধানতার জন্যে লেগেছে এ কথা কিছুতেই বলতে পারবেন না। বাইরে থেকে কেউ এসে যদি লাগিয়ে দেয়, আমি কি করতে পারি বলুন?'

স্টোর রুমে ঢুকল অফিসার। পেছনের দেয়ালে একটা জানালা। রাবাতের বাথরুমের জানালার মতই এটাও বাইরে থেকে খোলা হয়েছে, তবে খুলতে গিয়ে এটার হুড়কোটা ভেঙে ফেলেছে।

'এটা এ ভাবে ভাঙা আছে কদ্দিন?' জানতে চাইল অফিসার।

'ভাঙা থাকবে কেন?' জোর প্রতিবাদ জানাল ম্যানেজার, 'ভাঙা জিনিস আমি থাকতে দিই না! এটা ভাল ছিল। আজ রাতে খোলা হয়েছে। হুড়কো ভেঙেছে জানলে সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করিয়ে ফেলি। একটুও দেরি করি না।'

রাবাতের দিকে তাকাল অফিসার, 'আপনার ঘরটা দেখব।'

সানন্দে দেখাতে রাজি হলেন তিনি। নিয়ে এলেন অফিসারকে। তাঁর ঘরটা দেখার পর গোয়েন্দাদেরটাও দেখল সে।

নোটবুকে লিখে নিল অফিসার। গাড়ি থেকে নেমে এসে দরজায় নক করল তার সহকারী। দু'জনে মিলে তখন বোর্ডারদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তদন্ত শেষ করার পর জানা গেল, কেবল রাবাত আর গোয়েন্দাদের ঘরেই ঢুকেছিল চোর।

'হোটেলের লোকও হতে পারে,' অবশেষে অফিসার বলল। 'কিন্তু এ ভাবে ঢুকে কোন কিছু না নিয়ে চলে গেল কেন...'

অফিসারের কথা শুনে রেগে গেলেন রাবাত। খসখসে গলায় বললেন, 'কারণ হোটেলের লোক নয় ও! আমি বলছি, হ্যারিস মিলার! রকি বীচ থেকে আমাদের অনুসরণ করে এসেছে ও!'

'রকি বীচ?'

'কেন, চেনেন না? নাম শোনেননি? ক্যালিফোর্নিয়াতেই তো। শুনুন, পিজমো বীচে ওর সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে আমাদের, তারপর মনটিরেতে। আমি এখন শিওর, মোটর সাইকেলওয়ালা গুণ্ডাবাহিনীকেও সে-ই আমাদের পেছনে লাগিয়েছিল। ওকে গিয়ে গ্রেপ্তার করুন। ভয়ানক লোক ও!'

'তাই নাকি! কিন্তু সে আপনাদের ফলো করবে কেন? আপনাদের ঘর তল্লাশি করবে কেন? কি খুঁজেছে?'

'আমার আবিষ্কার।'

'তাই সেটা কি?'

সতর্ক হয়ে গেলেন রাবাত। চোখের তারায় ধূর্ত একটা হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'সে-কথা তো আপনাকে বলা যাবে না। কাউকেই বলা যাবে না এখন।'

'ও!' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অফিসার বলল, 'ঠিক আছে, হ্যারিস মিলারের চেহারার বর্ণনা দিন। কি গাড়িতে করে এসেছে...'

'প্রথম একটা লিংকনে করে পিছু নিয়েছিল। এখন সম্ভবত গাড়িটা বদলে ফেলেছে। তবে এখন আর ওসব আলোচনা করে লাভ নেই। ওকে ধরতে পারবেন না। পালানোর ইচ্ছে থাকলে বহুদূরে চলে গেছে!'

মাথা ঝাঁকাল অফিসার। মসৃণ হাসি ফুটল ঠোঁটে। রাবাত আর তিন গোয়েন্দার নাম আর বাড়ির ঠিকানা লিখে নিল। কিশোরের কাছ থেকে

লিংকন গাড়িটার লাইসেন্স নম্বরও লিখে নিল। তারপর সহকারীকে নিয়ে গিয়ে পুলিশ কারে উঠল।

'গাধা কোথাকার!' বলে উঠলেন রাবাত। 'অহেতুক সময় নষ্ট করে গেল! কিচ্ছু করবে না ও! করার চেষ্টাও করবে না!'

'করবে কি, ও তো তোমাকে পাগল ভেবে গেছে!' মুখ ফসকে বলে ফেলল মুসা। নানা রেগে যাচ্ছেন বুঝে তাড়াতাড়ি সামাল দিল, 'কারোর কিচ্ছু করা লাগবে না। মিলার যদি পিছু নেয়, আমরাই ওর ব্যবস্থা করব!'

দশ

দুই দিন পর। ইডাহোর ভেতর দিয়ে চলেছে ওরা, মনটানার লিভিংস্টোনের দিকে। আরও দক্ষিণে এগোলে পড়বে ওয়াইয়োমিঙের ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক। ট্যুরিস্ট মৌসুম এখনও শুরু হয়নি। রাস্তায় যানবাহনের ভিড় তাই কম।

ইয়োলোস্টোনে পৌঁছে মাটিতে ফাটল থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখল ওরা। এখানে ওখানে ফোয়ারার মত পানি ছিটকে উঠছে ওপরে, কোন কোনটা একশো ফুটের বেশি ওপরে উঠে যাচ্ছে। পানির রঙ লোহার মরচের মত লাল। তাজ্জব হয়ে দেখল, রাস্তার ধারে ডোবা, তাতে গলিত কাদা থেকে বুদ্বুদ উঠছে—যেন ওগুলোর তলায় বিশাল সব চুল্লিতে আগুন জ্বলছে, কাদা ফুটতে শুরু করবে খানিক পরই। সুন্দর সুন্দর লেক আর ঝর্নার ছড়াছড়ি। এক সময় এটা ছিল আগ্নেয়গিরির এলাকা, এখন সেগুলো মরে গেছে। এত সুন্দর দৃশ্য কিছুক্ষণের জন্যে মিলারের ভাবনা ওদের মন থেকে মুছিয়ে দিল।

তারপর পার্ক রোড ধরে এগোতে গিয়ে পেছনে ফিরে তাকাল রবিন আর মুসা। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। নীরবে শত্রু খুঁজছে মুসার চোখ।

'মাউন্ট সেইন্ট হেলেন পেরোনোর পর থেকে সন্দেহজনক আর কিছু দেখিনি,' রবিন বলল।

জানানোর সময় এসেছে, ভাবল কিশোর। লংভিউর মোটেলে ড্রাইভওয়েতে বড় গাড়িটা দেখার কথা বলল সে। 'হ্যারিস মিলারই গাড়িটা চালাচ্ছিল কিনা, বলতে পারব না।'

'হয়তো এতক্ষণে রকি বীচে চলে গেছে মিলার,' রবিন বলল, 'অর্কিড গাছে পানি দিচ্ছে। মোটেলে আগুন লাগাটা হয়তো নেহায়েত কাকতালীয় ঘটনা। কোন ছিঁচকে চোর স্টোর রুমে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ঘর থেকে আমাদের বের করেছিল...'

'আরে দূর!' মুসা যে ভঙ্গিতে বলে, সে-ভাবে বলে উঠলেন রাবাত। 'সাধারণ চোর হতেই পারে না। হলে চুরি করল না কেন? প্রচুর জিনিস ছিল, সুযোগও ছিল। আমার মানিব্যাগটাই তো পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। ছুঁয়েও দেখেনি। তোমার ক্যামেরাটা দামী, ওটাও নিতে পারত।'

'পেলে হয়তো নিত। কাল রাতে গাড়িতে ছিল ওটা। ঘরে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু টাকা? সামনে পেলে টাকা নেয় না এমন চোরের কথা শুনিনি। চালাকি করে স্টোর রুমে আগুন লাগিয়ে বোর্ডারদের বের করে জিনিস চুরি করার কথাও ভাবে না সাধারণ চোর। সুযোগ পেলে চট করে ঘরে ঢুকে পড়ে। কিছু পেলে নিয়ে চলে যায়।'

পুরানো হয়ে এল ফোয়ারা। প্রথম দেখার পর যেমন লেগেছিল, অতটা ভাল লাগছে না আর। উত্তেজনাও কমে গেল।

রাবাত বললেন। 'জায়গাটা বেশি খালি! অত শূন্যতা ভাল লাগে না!'

নানার অস্বস্তিটা মুসার মাঝেও সঞ্চারিত হলো। মনে করিয়ে দেয়ার পর এখন কেমন ভূতুড়েই লাগছে এলাকাটা তার কাছে। বলল, 'তাড়াতাড়ি করো, নানা, সরে যাই! দেখার কিছু আর নেই এখানে!'

শেষ বিকেলে মনটানা-ওয়াইয়োমিং সীমান্তের কাছে একটা ছোট শহরে ঢুকল ওরা। মোটেল খুঁজে বের করল। মালপত্র ঘরে রাখার পর বুইকটা নিয়ে চলে গেলেন রাবাত। পার্কিং লট থেকে দূরে রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে এলেন। ইচ্ছে করেই রাখলেন, মিলারের জন্যে টোপ। দেখতে চান, সে আসে কিনা, খোলার চেষ্টা করে কিনা। বাকি বিকেলটা কাটালেন গাড়ির কাছে যাতায়াত করে।

পঞ্চমবার যখন গাড়িটা দেখতে চললেন তিনি, আর থাকতে পারল না মুসা। বলল, 'এ ভাবে গিয়ে লাভটা কি হচ্ছে? ক্ষতি করছ আরও। মিলার এলে তোমার এই ঘনঘন যাওয়া-আসা দেখলে সতর্ক হয়ে যাবে। জেনে যাবে আমরা কোথায় উঠেছি। রাতে এসে হানা দেবে।'

মুসার কথায় যুক্তি আছে। আর গেলেন না রাবাত। ঘরে ফিরে এলেন। খানিক পরই তাঁর নাক ডাকানোর শব্দ কানে এল।

জেগে রইল তিন গোয়েন্দা। কয়েউর ডি'অ্যালিনির মোটেলে আগুন লাগার ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

'মিলারকে সন্দেহ করতে পারছি না আমি,' মুসা বলল। 'সে এল কি করে মোটেলে? জানল কি করে আমরা ওটাতে উঠেছি? আমাদের পিছে আসতে দেখিনি তাকে। অন্য গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করলেও চোখে পড়ে যেত আমাদের। এত দীর্ঘ পথ কিছুতেই লুকিয়ে থাকতে পারত না।'

'আচ্ছা, হেলিকপ্টারে করে আসেনি তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'নাহ্!' সম্ভাবনাটা একেবারেই ঝেড়ে ফেলে দিল মুসা। 'হেলিকপ্টার পাবে কোথায়? ভাড়া করতে অনেক টাকা লাগে। তা ছাড়া অতিরিক্ত শব্দ করে হেলিকপ্টার। নিঃশব্দে অনুসরণ করা একেবারে অসম্ভব।'

চুপ হয়ে গেল রবিন।

হঠাৎ বিছানায় সোজা হয়ে বসল কিশোর। 'ওকে ফোন করব! ইস্, আরও আগে এ কথাটা ভাবলাম না কেন? রকি বীচে ওর বাড়িতে ফোন করলে যদি জবাব দেয় তাহলে বুঝব আমাদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাওয়াটা

কাকতালীয় ঘটনা ছিল। আবার ফিরে গেছে। আমাদের দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।'

'কি করে করবে? নম্বর জানো?' রবিনের প্রশ্ন।

'না। তবে আনলিস্টেড নাম না হলে ডিরেক্টরি এনকয়ারিতে ফোন করলেই বলে দেবে।'

বিছানার পাশে টেবিলে রাখা ফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। মিনিট খানেকের মধ্যেই জেনে নিল মিলারের নম্বর। ফোন করল।

ও পাশে ফোন বাজতে লাগল।

'এত রাতে বিছানা থেকে ডেকে তুলছ,' হেসে বলল রবিন, 'রেগে আগুন হবে।'

'রকি বীচে এখন রাত এক ঘণ্টা কম। পার্বত্য এলাকায় রয়েছি আমরা, এখানে ওখানকার তুলনায় সময় বেশি।'

তিনবার রিঙ হওয়ার পর খুট করে একটা শব্দ হলো, যেন কেউ রিসিভার তুলেছে ওপাশে। কয়েকটা মুহূর্ত সব শূন্য, তারপর আবার খুট। রেকর্ড করা একটা কণ্ঠ বলল, 'হ্যারিস মিলার বলছি। সরি, এখন ফোনের কাছে আসতে পারছি না। আপনার নাম আর ফোন নম্বর রেখে দিন। পরে যোগাযোগ করব। মেসেজ দেয়ার আগে টোন আসার অপেক্ষা করুন।' কথা শেষ হওয়ার পর পরই ভেড়ার ডাকের মত একটা চিৎকার শোনা গেল।

ঝট করে কানের কাছ থেকে রিসিভার সরিয়ে ফেলল কিশোর। 'উফ্, আরেকটু হলেই কান ফাটিয়ে দিয়েছিল! যন্ত্র! অ্যানসারিং মেশিন জবাব দিয়েছে।'

'তারমানে আছে কি নেই জানা গেল না,' মুসা বলল।

'সকালে আবার করব। দেখা যাক, তখন কি বলে?'

সকাল আটটায় আবার মিলারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল কিশোর। সেই একঘেয়ে জবাব দিল অ্যানসারিং মেশিন। হাল ছেড়ে দিল কিশোর। মিলার বাড়ি আছে কিনা, বোঝা গেল না।

সেদিন ওয়াইয়োমিঙের ভেতর দিয়ে চলল ওরা। পরিষ্কার, সুন্দর দিন, যদিও নীল আকাশের এখানে ওখানে পেঁজা মেঘ ভাসছে। সেই মেঘে বৃষ্টি হবে না। দু'ধারে ঘাসে ঢাকা মাঠ, তাতে গরু চরছে। দক্ষিণ ডাকোটার র‍্যাপিড সিটিতে পৌছে রাবাত ঘোষণা করলেন, তাঁদের ছুটি মাটি করতে দেবেন না মিলারকে।

'ওই ড্রামটার কথা মাথায়ই আনব না আর,' বললেন তিনি। 'ওর কথা ভেবে দুশ্চিন্তা আর টেনশনের মধ্যে থেকে দেখার আনন্দ মাটি করব না।'

এতে অস্বস্তি কমল্ল ছেলেদের। র‍্যাপিড সিটিতে লাঞ্চ খাওয়ার সময় অনেক হই-হুল্লোড় করল। সেখান থেকে দক্ষিণে এগোনোর সময় একটিবারও আর পেছনে ফিরে তাকাল না। তবে কিশোর লক্ষ করল, বার বার রিয়ারভিউ মিররের দিকে চোখ যাচ্ছে রাবাতের।

মাউন্ট রাশমোরে পৌছল ওরা। পাহাড়ের ওপরে খানিকটা জায়গা

সমতল করে চারপাশের দৃশ্য দেখার জন্যে পর্যবেক্ষণ মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ী পথ। কয়েক মাইল পেরিয়ে এসে পার্কিং লট দেখা গেল। ওখানে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। চওড়া পথ। সিকি মাইল পর রয়েছে মঞ্চ। সহজেই পৌঁছানো যায়। পঞ্চাশটা রাজ্যের পতাকা উড়ছে ওখানে।

মঞ্চে এসে দাঁড়াল ওরা। পাইনে ছাওয়া ঢাল নেমে গেছে নিচে। গাছের ফাঁকে মাথা তুলে আছে আমেরিকার মহান চার প্রেসিডেন্ট— ওয়াশিংটন, জেফারসন, লিংকন, থিয়োডোর রুজভেল্ট। দক্ষিণ ডাকোটার পর্বতের পাথর কেটে তৈরি হয়েছে ওই বিশাল মুখগুলো।

'খাইছে! কি জিনিস বানিয়েছে!' অবাক হয়ে দেখতে দেখতে বলল মুসা।

সঙ্গে গাইডবুক এনেছে কিশোর। কিন্তু সেটা দেখার প্রয়োজন হলো না। আগেই পড়ে নিয়েছে। বলল, 'গুটজন বরগ্লুমের নির্দেশে তৈরি হয়েছে ওগুলো। একেকটা মুখ ষাট ফুট উঁচু।'

হেসে ফেলল মুসা, 'গ্লুম যখন ছোট ছিলেন, নিশ্চয় তাঁর মা বলেছিলেন—বড় হয়ে বিশাল কোন কাজ করবে বাবা, যা তোমাকে স্মরণীয় করে রাখবে। সেই বিশাল কাজটাই করেছেন তিনি।'

'বাহ্, খুব মজার কথা বলে তো ছেলেটা!' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল মুসা।

রাবাতও তাকালেন।

মোটাসোটা, মাঝবয়েসী এক মহিলা। পরনে আঁটো জিনসের প্যান্ট। রাবাতের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'এরা আপনার নাতি?'

'একজন।'

'বাচ্চারা বড় মজার জিনিস!' ঝর্নার বহমান পানির মত কলকল করে হাসল মহিলা। 'সব সময় তাজা। নতুন নতুন কথা খেলে মাথার মধ্যে, কখনও পুরানো হয় না।'

এমন ভঙ্গিতে ওদের দিকে তাকালেন রাবাত, যেন তাজা আর নতুনত্ব সত্যি আছে কিনা দেখতে চাইছেন। মুসার চোখ উজ্জ্বল। রবিন লাল হয়ে গেল।

নিজেকে বাচ্চা ভাবতে মোটেও ভাল লাগে না কিশোরের। কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল মহিলার দিকে। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের শার্টে এমব্রয়ডারি করা বড় বড় গোলাপী রঙের ফুল। কানে ম্যাচ করা গোলাপী রঙের দুল, ঠোঁটে গোলাপী লিপস্টিক। হেসে রাবাতের দিকে দুই কদম এগিয়ে এল।

'কখনও সন্তান হয়নি আমার,' মহিলার কণ্ঠে খুব হালকা হতাশা আছে কি নেই। 'সবাই বলে, ডরোথি, খুব ভাল মা হতে পারতে তুমি। কিন্তু কারও কথায় কান দিইনি। অন্যের বাচ্চাকে আদর করতেই ভাল লাগে আমার।'

সরাসরি মহিলার চোখের দিকে তাকালেন রাবাত। তাঁর চোখের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে চোখজোড়া। মহিলার অন্তর ভেদ করে ঢুকে গেল তাঁর দৃষ্টির ছুরি। এক পা পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। টান লাগল হাতে। দেখেন, শার্টের হাতা আঁকড়ে ধরেছে মহিলার আঙুল। বড় বড় নখে গোলাপী রঙের নেলপলিশ।

নানার বিপদ বুঝতে পারল মুসা। ঘড়ি দেখল। খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল। বলল, 'নানা, জলদি চলো। ভুলে গেছ, নানীকে বসিয়ে রেখে এসেছ মোটেলে? দেরি দেখলে রেগে কাঁই হবে, আস্ত রাখবে না আর।'

চমৎকার একটা মিথ্যে বলেছে মুসা। মনে মনে বাহবা না দিয়ে পারল না কিশোর। এই মুহূর্তে নানাকে বাঁচানোর এর চেয়ে ভাল কোন বুদ্ধি সে-ও বের করতে পারত না। পলকে উধাও হয়ে গেল মহিলার গোলাপী হাসি। রাবাতের হাত ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল, যেন বিদ্যুতের শক খেয়েছে। শুকনো গলায় বলল, 'ও, তাই নাকি, তাই নাকি! যান, তাড়াতাড়ি যান! আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল!'

'হুঁ, আমারও!' ভদ্রতা করার জন্যে কোনমতে বলে তাড়াতাড়ি পার্কিং লটের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন রাবাত। তাঁর তিন পাশে বডিগার্ড হয়ে এগোল তিন গোয়েন্দা।

গাড়িতে উঠে মুসা যখন বুঝল এতক্ষণে নিরাপদ, নানার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'নানা, মহিলা তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা করছিল। আমরা না থাকলে মরতে! সোজা ধরে নিয়ে যেত।'

'নিলে নিত,' রসিকতার জবাব রসিকতা দিয়েই দিলেন রাবাত, 'আরেকটা নানী পেয়ে যেতি।' চিবুকটা সামনে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'তাহলে বুঝলি তো, এখনও বুড়ো হইনি। মেয়েরা তাকায়।'

'হ্যাঁ, পঞ্চাশ বছরের মেয়ে।'

এ কথার আর জবাব দিলেন না নানা।

পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে এল আবার ওরা। গাড়ি ঘুরিয়ে কাস্টার স্টেট পার্কের দিকে এগোলেন রাবাত।

'কাস্টার পার্কে বাইসন থাকে,' কিশোর বলল। 'একসঙ্গে এত নাকি খুব কমই দেখা যায়। চিড়িয়াখানার বাইসন আর বুনো বাইসনে অনেক তফাৎ। বুনোগুলো অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। এড়িয়ে চলা ভাল।'

হেসে রাবাত বললেন, 'কিশোর, বেরোনোর আগে গাইড-বুকটাকে গুলে খেয়েছ নাকি? রাতে বসে বসে পাতা মুখস্থ করো?'

'মুখস্থ করা লাগে না,' রবিন বলল, 'একবার পড়লেই যথেষ্ট। কম্পিউটারের মেমোরি ওর, কখনও ভোলে না।'

'আমারও এ রকম থাকলে ভাল হত। কাজে লাগত। মাঝে মাঝে তো মনে হয় নিজের নামই ভুলে যাচ্ছি।' বললেন রাবাত।

'বেশি ব্যস্ত থাকো বোধহয়,' ফোড়ন কাটল মুসা। 'মহিলার কথা দিয়েই বলি—সব সময় তাজা, নতুন নতুন বুদ্ধি খেলে মাথার মধ্যে। সেজন্যে পুরানো

কথা আর ধরে রাখতে পারো না, ভুলে যাও।'

মেজাজ ভাল আছে নানার। মুসার কথায় কিছু মনে করলেন না।

ঢালু হয়ে গেছে এখন পথ। পথের মাথায় গেট পেরিয়ে কাস্টার স্টেট পার্কে ঢুকল গাড়ি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন রাবাত, 'আরি, ওগুলো কি!' গাড়ি থামিয়ে দিলেন।

রাস্তার ধারে জটলা করছে কতগুলো বুনো গাধা। গাড়িটাকে দেখে পাকা রাস্তায় খুরের খটাখট আওয়াজ তুলে এগিয়ে এল। নাক বাড়িয়ে দিল জানালার কাছে।

'মনে হয় খাবার চায়!' মুসা বলল।

রাবাত বললেন, 'খাবার দিয়ে দিয়ে অভ্যাস খারাপ করে ফেলেছে লোকে। বাইসনেরাও এসে চাইবে না তো? তাহলেই সর্বনাশ। না দিলে হয়তো রেগেমেগে শিং দিয়ে গুঁতানোই শুরু করবে।'

কিন্তু গাধার মত হ্যাংলামি করল না বাইসনেরা। রাস্তা থেকে বেশ দূরে রইল। গাড়ি থামিয়ে ভাল করে দেখার জন্যে নামলেন রাবাত, তখনও ফিরে তাকাল না জানোয়ারগুলো। আপনমনে ঘাস খেতে থাকল।

'এক সময় এত বাইসন ছিল এখানে, মাঠই দেখা যেত না, কালো হয়ে থাকত,' কিশোর বলল। 'দল বেঁধে রেললাইনের কাছে চলে আসত। দাঁড়িয়ে থাকত লাইনের ওপর। গাড়ি আটকে দিত।'

ক্যামেরা তুলে খটাখট শাটার টিপে যাচ্ছে রবিন। 'যতটা কাছে যাওয়া সম্ভব, যাব।' এতদূর থেকে লম্বা ঘাসের মধ্যে বাইসনগুলোকে আর বাইসন মনে হচ্ছে না, পাথরের চাঙড়ের মত লাগছে।

'খবরদার,' সাবধান করল মুসা, 'ওই কাজও কোরো না। সাংঘাতিক বদমেজাজী জানোয়ার।'

'হ্যাঁ,' মুসার কথায় সুর মেলালেন রাবাত, 'প্রায়ই অ্যাক্সিডেন্টের খবর শোনা যায়। সাহস দেখিয়ে ওগুলোর কাছে চলে যায় লোকে, বোকামির জন্যে মরে। শিঙের গুঁতোয় ভর্তা হয়। যে ভাবে আছে ওভাবেই থাকতে দাও, বিরক্ত করার দরকার নেই। কোন বুনো জানোয়ারকেই অতটা বিশ্বাস করা উচিত না।'

বাইসনের পালকে পেছনে ফেলে এল ওরা। পথের পাশে গাড়ি রাখার জায়গা পাওয়া গেল।

রাবাত বললেন, 'আমি একটু ঘুরে আসতে চাই।' একটা রাস্তা দেখালেন তিনি। পাইন-ছাওয়া পাহাড়ের ঢালের দিকে চলে গেছে। 'পথের মাথায় কোন রাজপুরী, দেখার ইচ্ছে আছে কারও? এতদূর এসে না দেখে চলে যাওয়াটা বোকামি হয়ে যাবে।'

'আপত্তি নেই,' জবাব দিল রবিন, 'যদি রাজপুরীতে রাক্ষস না থাকে।'

ইগনিশন থেকে চাবি খুলে নিলেন রাবাত। কিশোরের দিকে তাকালেন, 'তুমি?'

'আমার হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। এখানেই থাকি।'

রবিন আর মুসাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন রাবাত। কয়েক মিনিটেই হারিয়ে গেলেন ঘন বনের মধ্যে।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে কান পাতল কিশোর।

আরেকটা গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়েছে। এগিয়ে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর। মনে হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে গাছপালার ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসবে একটা ধূসর লিংকন।

কিন্তু লিংকন নয়, এল একটা ক্যাম্পার। হুইলে বসা একজন বুড়ো লোক। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কিশোরের উদ্দেশে হাত নাড়ল।

হাসল কিশোর। অতি-কল্পনা করে ফেলেছিল। কেউ অনুসরণ করছে না ওদের। মিলার পিছু নিয়ে থাকলে সারাক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারত না, এক না একসময় বেরিয়ে আসতেই হত। দেখা দিত। কিন্তু গত কয়েকশো মাইলের মধ্যে মিলারের চেহারাও দেখেনি ওরা। তারপরেও লোকটার কথা কেন যে মন থেকে তাড়াতে পারছে না, কে জানে! আসলে সন্দেহ করার মত আর কেউ নেই বলেই হয়তো এ রকম হচ্ছে।

কিশোরের মাথার ওপরে একটা গাছে পাখি ডেকে উঠল, ডানার শব্দ তুলে বেরিয়ে এল ওটা। বসতে বসতে বিরক্ত হয়ে গেল কিশোর। আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। থেকেছে আসলে দেখার জন্যে, ওদের গাড়িটার কাছে কেউ আসে কিনা। সেই 'কেউটা' আর কেউ নয়, মিলার। কিন্তু এখন ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হচ্ছে। প্রয়োজন ছিল না। এই অতি সন্দেহের কোন মানে নেই। মুসার আসতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। তাড়াতাড়ি গেলে এখনও ওদের ধরা যায়।

প্রায় দৌড়াতে শুরু করল কিশোর। চারপাশ থেকে ঘিরে এল জঙ্গল। প্রথম মোড়টার কাছে এসে ফিরে তাকাল। পেছনে রাস্তাটা দেখা যায় না। হারিয়ে গেছে গাছের ওপাশে।

আবার কানে এল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। থামল গাড়িটা। দরজা খুলে বন্ধ হলো। রাস্তার পাশে বুইকটার কাছে গাড়ি রেখেছে কেউ।

তবে কি তার সন্দেহই ঠিক ছিল? মিলারই এসেছে? শ্বাস টানা বেড়ে গেল কিশোরের। ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেছে। খানিকটা পিছিয়ে পাশে সরে গেল সে। এখন দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা। রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে আগন্তুক। ভয় পেয়ে গেল কিশোর। মনে হলো খামচি দিয়ে ধরেছে কেউ হৃৎপিণ্ডটাকে। লুকিয়ে পড়তে হবে।

গাছপালার কারণে পাহাড়ের গোড়ায় বেশ ছায়া, অন্ধকারই বলা চলে। প্রচুর ঝোপঝাড় আছে। তবে ওগুলো বেশ দূরে। সে যেখানে রয়েছে সেখানে পথের ডান পাশে কয়েক গজ দূরে ম্যানজানিটা জাতীয় একধরনের গাছের ঝোপ দেখতে পেল। বেশি বড় না। কাছাকাছি আর কিছু না দেখে ওটার দিকেই দৌড় দিল সে। প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। লুকিয়ে গেল ডালপাতার আড়ালে। আস্তে করে ডাল সরিয়ে ফাঁক করে উঁকি দিল

রাস্তার দিকে।

লোকটার মুখ দেখতে পেল না। পা চোখে পড়ল কেবল। শোনা যাচ্ছে নিঃশ্বাসের খসখসে শব্দ। দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। পাহাড়ের দিকে মুখ। পায়ে বাদামী রঙের লোফার, পরনে জিনস। পাহাড়-জঙ্গলে আসার অভিজ্ঞতা নেই বোধহয়—অনুমান করল কিশোর, তাহলে এই পোশাক পরে আসত না। লোফারটা নতুন, জিনসেও ভাঁজ নেই তেমন, রঙ জ্বলেনি।

এখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল কেন? এগোচ্ছে না কেন? কিছু দেখেছে? রাস্তা থেকে সরে আসার আগে কোন চিহ্ন রেখে এসেছে কিশোর?

ঘাবড়ে গেল সে। মনে হতে লাগল, বড় বেশি খোলামেলা জায়গায় রয়েছে। কেউ আছে সন্দেহ করে যদি ঘুরে ভাল করে ঝোপের দিকে তাকায় লোকটা, তাকে দেখে ফেলবে।

বাঁ পাশের ঝোপের ভেতর শব্দ হলো। ঘুরে তাকাল লোকটা। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল একটা বুনো জানোয়ার।

কি বেরোল দেখতে পেল না কিশোর, তবে সুযোগটা কাজে লাগাল। হাতের থাবা আর হাঁটুতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করল লোকটাকে দেখার জন্যে।

ধক করে উঠল বুক। দম বন্ধ করে ফেলল। লোকটার হাতে পিস্তল!

'হাই!' ডাকল কে যেন রাস্তা থেকে।

পথের দিকে তাকাল আগন্তুক। চওড়া কানাওয়ালা স্ট্র হ্যাটের নিচে তার চেহারা এখন দেখতে পাচ্ছে কিশোর। হ্যারিস মিলারকে চিনতে ভুল করল না।

মাথা নামিয়ে ফেলল কিশোর। আগের চেয়ে বেশি। মাটিতে শরীর মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করল, যাতে মিলারের চোখে না পড়ে। ঘামছে। উঠে দৌড় দেবে? না, উচিত হবে না। বেরোলেই তাকে দেখে ফেলবে মিলার।

'হাই,' আবার বলল মহিলা, 'আমাকে মনে আছে?' কাছে চলে এসেছে।

নীরবে হাসল কিশোর। গলা শুনেই চিনতে পেরেছে। সেই মহিলা, ডরোথি, মাউন্ট রাশমোরে রাবাতকে পাকড়াও করেছিল যে।

'আমি ভেবেছি আর দেখা হবে না আপনার সঙ্গে,' মহিলা বলছে। 'লাঞ্চের পর দেখি আপনি নেই! কত খোঁজা খুঁজলাম। নেই তো নেইই। যেন হাওয়া! এখানে কি করছেন? পাহাড় দেখতে এসেছেন বুঝি?'

মিলারের হাত দেখতে পাচ্ছে না কিশোর। পিস্তলটা কি করেছে বুঝতে পারল না। নিশ্চয় পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে। মহিলা দেখেনি। দেখলে প্রশ্ন শুরু করে দিত। বিড়বিড় করে কি যেন বলল মিলার, ঠিক বোঝা গেল না—পেট্রল ফুরিয়ে গেছে, এ রকমই কি যেন বলল। মহিলা বকবক করতে লাগল। মিলারকে আবার খুঁজে পাওয়ার আনন্দে বিভোর। নিজের গাড়িতে তাকে লিফট দেয়ার প্রস্তাব দিল। মিলার যদি পাহাড়ের দিকে হাঁটতে যেতে চায়, তাহলে সঙ্গ দেবে। হাঁটার ব্যাপারেই আগ্রহ বেশি মহিলার।

রাজি হলো না মিলার। বলল, অনেক ঘোরাফেরা করেছে, এবার ফিরে যেতে চায়। গাড়ির দিকে এগোল সে। মহিলা ছাড়ল না। সঙ্গে সঙ্গে চলল।

কথা বলার নেশায় পেয়েছে যেন। অনর্গল বকছে।

আবার মাথা তুলল কিশোর।

মিলারের হাত চেপে ধরেছে মহিলা। শক্ত করে ধরেছে, যেন আর হাওয়া হতে না পারে মিলার।

হাসি পেল কিশোরের। মিলারের মনের অবস্থা কল্পনা করে হাসিটা বাড়ল। ভাল বিপদেই পড়েছে বেচারা। ওই মহিলার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার।

গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জনে।

মিনিট দুই পরে প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ কানে এল। চলে গেল গাড়ি দুটো।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। মুসাদের পিছু নেয়ার সময় নেই আর এখন। একটা পাথর দেখে তাতে বসে পড়ল। সঙ্গীদের আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

এগারো

মুসারা এসে তাকে ওভাবেই পথের পাশে বসে থাকতে দেখল।

'কি ব্যাপার, এ ভাবে বসে আছ কেন?' মুসার প্রশ্ন।

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'কিছু ঘটেছে? তোমার মুখ অমন শুকনো কেন?'

'পিস্তল নিয়ে ও আমাদের পিছে পিছে আসবে কল্পনাও করতে পারিনি,' মাথা নাড়তে লাগল কিশোর। 'প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। রাবুনানা, আপনার কাছে আমাদের সবার মাপ চাওয়া উচিত।'

'তাই নাকি? কেন?'

'এখানেও এসে হাজির হয়েছে মিলার। পিস্তল আছে তার কাছে। একটু আগেও আপনার কথায় বিশ্বাস ছিল না আমার। কিন্তু এখন হয়েছে। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের পিছু নিয়েছে সে।'

সব খুলে বলল কিশোর।

মহিলার কথায় আসতেই হাসতে শুরু করলেন রাবাত। 'চমৎকার! অচেনা কাউকে দেখলেই খাতির করতে আসে মেয়েমানুষটা। যাক, কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত, মিলারকে আটকে রাখবে সে।'

নানার দিকে তাকাল মুসা। 'নানা, অত হাসার কিছু নেই। ওর কাছে পিস্তল আছে। পেছন থেকে গুলি মেরে দিলে গেছি। পুলিশকে জানানো দরকার।'

'আরও যাব পুলিশের কাছে!' মাথা নাড়লেন রাবাত। 'মোটেলে আগুন লাগলে যে অফিসারটা এসেছিল, মনে নেই? কি ভঙ্গিটাই না করল? যেন আমি একটা পাগল! নিজের চামড়া নিজেদেরই বাঁচাতে হবে আমাদের, কারও

সাহায্য পাব না। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে অহেতুক আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চল, যাই।'

বড় করে দম নিলেন তিনি। বনের তাজা বাতাস টানলেন বুক ভরে। এই প্রথম তাঁকে নিশ্চিন্ত মনে হলো। 'এতদিনে ভার নামল আমার। মিলার যে পিছু নিয়েছে, এখন আমরা শিওর। তোদের সবার হাবভাব দেখে আমিও কিন্তু ভয় পেতে আরম্ভ করেছিলাম, সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো!'

পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর কিশোর। দু'জনের চোখেই বিস্ময়।

আগে আগে চললেন রাবাত। পেছনে ছেলেরা।

গোধূলি বেলায় র‍্যাপিড সিটিতে পৌঁছল ওরা। একটা মোটেলে ঘর নিল। কাছের একটা ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে বার্গার খেয়ে এসে বিছানায় শুয়ে মহা আনন্দে নাক ডাকাতে শুরু করলেন রাবাত।

বিছানায় চিত হয়ে ছাতের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'কি করে কাজটা করছে?'

'কার কথা বলছ?' জানতে চাইল মুসা, 'মিলার, না নানা?'

'মিলার। যেখানেই যাচ্ছি ঠিক পিছে পিছে লেগে আছে। বের করে নিচ্ছে কোথায় আছি আমরা। কি ভাবে?'

জবাব দিতে পারল না কেউ।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

পরদিন সকালে সবাই উত্তেজিত হয়ে রইল। রাস্তায় কড়া নজর। সামনে পেছনে দু'দিকেই চোখ রেখেছে। সাউথ ডাকোটা ব্যাডল্যান্ড ধরে চলার সময় পথে দর্শনীয় কিছু দেখার জন্যে যেখানেই নামছে, গাড়ির কাছাকাছি থাকছে ওরা, চোখে চোখে রাখার জন্যে। ব্যাডল্যান্ডের নানা রকম পাথরের স্তূপ মুসার অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। তার মনে হচ্ছে, অন্য কোন গ্রহে এসে হাজির হয়েছে, এটা পৃথিবী হতে পারে না! সব কিছুতেই যেন ভূতের ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছে সে। অস্বস্তির আরও একটা বড় কারণ, তার সন্দেহ, ওসব পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে গুলি চালাতে পারে মিলার।

'নানা, কি এমন আবিষ্কার করলে, যার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে সে?' এই নিয়ে শতবার প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছে মুসা।

'খুব জরুরী জিনিস,' একই জবাব দিলেন রাবাত। 'না জানবি যতক্ষণ, ততক্ষণ নিরাপদ। নইলে বলতে আর অসুবিধে কি ছিল।'

ছোটবড় নানা আকারের নানা ধরনের পাথরের চাঙড় আর আলগা পাথরের স্তূপ পেরিয়ে এল গাড়ি। প্রেইরি ডগ নামে এক ধরনের প্রাণীর এলাকায় এসে ঢুকল। মাটিতে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ওদের গর্ত। মুখের কাছে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে বিশাল ইঁদুরের মত দেখতে প্রাণীগুলো। গাড়িটাকে আসতে দেখলে বিচিত্র ভঙ্গিতে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে সটান সোজা করে দিচ্ছে শরীরটাকে, তীক্ষ্ণ টিইং টিইং ডাক ছেড়ে সতর্ক করছে একে অন্যকে, গাড়ি বেশি কাছে চলে এলে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ছে গর্তের ভেতর। পরক্ষণেই আবার মাথা বের করে উঁকি দিচ্ছে।

বেলা বারোটার মধ্যেই ব্যাডল্যান্ড দেখা হয়ে গেল ওদের। হাইওয়েতে ফিরে এসে পুবে রওনা হলো। ভূমি এখন সমতল। সামনে মাইলের পর মাইল রাস্তা লম্বা হয়ে পড়ে আছে। বাঁক নিয়েছে খুবই সামান্য, ওঠানামা নেই বললেই চলে। সামনেও গাড়ি আছে প্রচুর, পেছনেও আসছে অনেক, কিন্তু লিংকনটাকে দেখা গেল না। দ্রুত চালাচ্ছেন রাবাত। একের পর এক গাড়িকে ওভারটেক করে পিছে ফেলে আসছেন। পাশ কাটানোর সময় দেখছেন ড্রাইভারের চেহারা।

বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে গতি কমিয়ে দিলেন তিনি। পেছনের গাড়িগুলোকে আগে চলে যেতে দিলেন। ড্রাইভারদের চেহারা দেখলেন। ওদের মধ্যে হ্যারিস মিলার নেই।

'বুঝলাম না,' অবশেষে বললেন তিনি, 'সামনেও নেই, পেছনেও নেই; আমরাও ওর পাশ কাটিয়ে আগে যাইনি, সে-ও আমাদের পাশ কাটিয়ে পেছনে যায়নি। কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি আশেপাশেই কোথাও আছে। কোথায়?'

পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে মুসা। হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। 'খাইছে! মোটরসাইকেল! নানা, ক্রিসেন্ট সিটির সেই গ্যাঙটা আসছে!'

রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকালেন রাবাত। 'ক্রিসেন্ট সিটি এখান থেকে বহুদূর। কোথায় চলেছে ওরা? বখাটেদের সভা হচ্ছে নাকি কোথাও, যোগ দিতে চলেছে?'

সামরিক শৃঙ্খলায় দুই সারিতে এগিয়ে আসছে ওরা। পিঠ সোজা, দৃষ্টি সামনে স্থির। ক্রিসেন্ট সিটির সেই দলটাই। পরনে কালো চামড়ার পোশাক, বেল্ট আর দস্তানায় কাঁটা বসানো।

দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা। বুইকটাকে ধরে ফেলছে।

'নানা, জোরে চালাও না কেন?' উদ্বিগ্ন হয়ে বলল মুসা।

'কারও ভয়ে পালাতে যাচ্ছি না আমরা,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন রাবাত।

এত সাহস কেন? আগের বার দলটাকে কি করে নাকানি-চোবানি খাইয়েছেন রাবাত, মনে করে হাসল রবিন। এবারও তেমন কোন খেল দেখানোর অপেক্ষায় আছেন নাকি?

'আমাদের ক্ষতি করতেই আসছে, এমন ভাবার কোন কারণ নেই,' রাবাত বললেন। 'ক্রিসেন্ট সিটির দলটা হলেও এতদিনে নিশ্চয় আমাদের কথা ভুলে গেছে।'

কাছে চলে এল বাইকগুলো। ইঞ্জিনের গর্জন শোনা যাচ্ছে। বুইকটাকে পাশ কাটানোর জন্যে বাঁয়ে সরল দলপতি।

'নানা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'এই লোকটাই তোমাকে সেদিন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল!'

নাক দিয়ে শব্দ করলেন রাবাত। 'হুঁ! চেহারাটা কি করে রেখেছে! সারামুখে দাড়িগোঁফ! এগুলো মানুষ না বনমানুষ, তাই কেবল ভাবি!'

গাড়ির পাশ কাটানোর সময় ফিরে তাকাল দলপতি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার দিকেও তাকালেন রাবাত। চোখে চোখ আটকে গেল দু'জনের। চোখ বড় বড় হয়ে গেল লোকটার। গোল হয়ে গেল মুখ। ধীরে ধীরে বিকৃত হাসিতে রূপ নিল সেটা। রাবাত আর ছেলেদের দেখিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কিছু বলল।

'হয়েছে কাজ,' বলে উঠল রবিন, 'ধরবে এবার আমাদের! সেদিন হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ নেবে আজ!'

বুইকটাকে ঘিরে ফেলল সাইকেলগুলো। গতি কমিয়ে ফেলেছে।

আচমকা গতি বাড়িয়ে দিলেন রাবাত। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বুইক। তোয়াক্কাই করল না সামনের সাইকেলগুলো। গতি বেড়ে গেল ওদেরও। আগে আগে চলেছে। যেন ওদেরকে ধরার চ্যালেঞ্জ করেছে গাড়িটাকে।

'ওরা জানে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারব না ওদেরকে,' তিক্তকণ্ঠে বললেন রাবাত, 'ঠিকই আন্দাজ করছে।'

ব্রেক চেপে গতি কমিয়ে ফেললেন তিনি। বাঁয়ে তাকালেন। ধীরে ধীরে পাশে সরতে লাগলেন। জায়গা করে দিল পাশের সাইকেলটা। আরও সরালেন তিনি। আরেকটু জায়গা দিল সাইকেল। তাঁর মতলব বুঝতে পারল না।

হাইওয়ের পাশে মাঠ থেকে ধোঁয়া উঠছে। শুকনো ঘাস পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। বাতাস প্রায় নেই, তাই উড়ে না গিয়ে জমির ওপরই স্থির হয়ে আছে ধোঁয়া, রাস্তার ওপরেও উঠে এসেছে একটা অংশ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার ভেতরে ঢুকে যাবেন রাবাত। ছেলেদের বললেন, 'শক্ত হয়ে বোসো!'

কি করতে যাচ্ছেন বলার সময় নেই। ধোঁয়ার মধ্যে ঢুকে গেল গাড়ি। অদৃশ্য হয়ে গেল মোটরসাইকেল আরোহীরা। চারপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না কেবল কুণ্ডলী পাকানো ধূসরতা ছাড়া। এক মোচড়ে স্টিয়ারিঙের অনেকখানি বাঁয়ে ঘুরিয়ে দিলেন রাবাত।

রাস্তা থেকে প্রায় উড়ে সরে এল গাড়িটা। একটা মুহূর্তের জন্যে শূন্যে ঝুলে রইল যেন। তারপর প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। রাস্তার ডিভাইডারের মাঝে নেমে এসেছে গাড়ি। মুসার মনে হলো, উল্টে যাবে। চিৎকার করে উঠল সে। কিন্তু অহেতুক ভয় পেয়েছে। গাড়ি ওল্টাল না। নিরাপদেই নেমে দাঁড়িয়ে গেল।

ভারী দম নিলেন রাবাত। পায়ের চাপ বাড়ালেন অ্যাক্সিলারেটরে। বনবন করে ঘুরতে লাগল চাকা। কয়েকবার পিছলে গিয়ে অবশেষে মাটি কামড়ে ধরল। ডিভাইডারের সমান্তরালে খাদের পাড় ধরে ছুটতে শুরু করল নাক বরাবর। ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

আবার স্টিয়ারিং অনেকখানি ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। ঝাঁকুনি খেতে খেতে রাস্তায় উঠে এল গাড়ি। আগের রাস্তা থেকে সরে চলে এসেছে আরেকটা রাস্তায়।

চিৎকার করে বলল মুসা, 'নানা, তুমি একটা জিনিয়াস!'

'এখনই চেঁচাবি না,' সতর্ক করলেন রাবাত, 'আমরা কি করেছি বুঝতে

দেরি হবে না ওদের। চলে আসবে তখন।'

সামনে একটা এগজিট র‍্যাম্প দেখা গেল। সেটার দিকে ছুটলেন তিনি। সোজা নিচে নেমে এসে ছুটলেন আধ মাইল দূরের একটা গাছের জটলার দিকে। জটলার কাছে পৌঁছে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলেন ভেতরে। রাস্তা থেকে আর দেখা যাবে না এটাকে।

'আমাদের দেখবে না ওরা,' বললেন তিনি। 'ওরা ভাববে ধোঁয়া পার হয়ে সোজা সামনে চলে গেছি আমরা, সেদিকেই নজর দেবে।'

ভারী হয়ে এসেছে তাঁর নিঃশ্বাস। তবে মৃদু হাসি ফুটেছে ঠোঁটের কোণে। হাইওয়ের দিকে চোখ।

মিনিটখানেক পরেই দেখা গেল ওদের। সারি দিয়ে চলেছে পশ্চিমে। নজর সামনের দিকে। বুইকটাকে খুঁজছে।

'খুব খারাপ লোক,' রাবাত বললেন। 'আরও জ্বালাবে মনে হচ্ছে!'

'কিন্তু আমাদের পেছনে লেগেছে কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'বর্ণবাদী হতে পারে,' অনুমানে বলল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার তা মনে হয় না। ওদের দলে কালো লোকও আছে। শিওর, মিলার লাগিয়েছে। আমাদের কাবু করতে বলেছে ওদের। তারপর সে এসে ফর্মুলাটা কেড়ে নেবে। এর জন্যে নিশ্চয় টাকাও দিয়েছে ওদেরকে।'

দূরে হারিয়ে গেল দলটা।

হঠাৎ হাত তুলল কিশোর, 'ওই, দেখুন! বললাম না, সব শয়তানি মিলারের!'

ধূসর একটা লিংকন গাড়ি। কিশোর বলার মুহূর্ত পরই গতি কমিয়ে ফেলল।

'বাহ্, এসে গেছে,' রাবাত বললেন।

রবিন বলল, 'আর কোন সন্দেহ নেই, গ্যাঙকে টাকা খাইয়েছে মিলার!'

'তাকে সামনে চলে যেতে দেয়া উচিত,' মুসা বলল। 'ও এগিয়ে গেলে আমরা এগোব। পেছনে থেকে যাব তখন।'

কিন্তু তাকে সে-সুযোগ দিল না লিংকন। গেল না। পথের ধারে কাঁচা জায়গায় নেমে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। মুসারা যেখানে রয়েছে তার থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

বারো

পার্কিং লাইট জ্বেলে দিয়ে অপেক্ষা করছে লিংকন।

'শয়তানটা জানে আমরা এখানে আছি,' রাবাত বললেন। 'কি করে জানল?'

একটা পেট্রল কারকে আসতে দেখা গেল। লিংকনের কাছে গিয়ে থামল গাড়িটা। ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশ অফিসার বেরিয়ে এল। দরজা খুলল মিলার। অফিসারের সঙ্গে কথা বলল। দু'জনে এগিয়ে গেল লিংকনের সামনের দিকে। হুড তুলে ইঞ্জিন দেখতে লাগল।

'ওসমস্ত অভিনয়,' কিশোর বলল। 'গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার ভান করছে মিলার।' গাড়ি থেকে বেরোল সে। 'কি করে আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে, বোঝা দরকার।'

'কি করে?' মুসার প্রশ্ন।

'কোন ধরনের যন্ত্র রয়েছে আমাদের গাড়িতে, যেটা সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। সেই সঙ্কেত ধরে জেনে যাচ্ছে সে, আমরা কোথায় আছি। সামনে না এসে আড়ালে থেকেও আমাদের অনুসরণ করতে পারার এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

কিশোরের কথা বুঝে ফেললেন রাবাত। 'তারমানে বলতে চাইছ কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্র লাগিয়ে দিয়েছে গাড়িতে!'

সোজা গাড়ির ট্রাংকের দিকে রওনা দিলেন তিনি। সুটকেসগুলো বের করে এনে মাটিতে ফেললেন। হ্যাঁচকা টানে সীটগুলো সরিয়ে নিয়ে এলেন সামনের দিকে।

সামনের সীটের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। তারপর হাত দিল ড্যাশবোর্ডের নিচে।

জিনিসটা খুঁজে বের করল অবশেষে রবিন। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল গাড়ির নিচে। সাবানের সমান একটা প্লাস্টিকের বাক্স বের করে আনল। পেট্রোল ট্যাংকে টেপ দিয়ে আটকানো ছিল।

'ওর একটা দাঁতও রাখব না আমি!' ভীষণ রাগে একটা পাথর তুলে নিলেন রাবাত। 'আমার ওপর গুপ্তচরগিরি!'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' বাধা দিল কিশোর। একটা গাছের ডালে রেখে দিল যন্ত্রটা। হেসে বলল, 'থাক এটা এখানে, সঙ্কেত পাঠাক।' মিলারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'থাকুক ব্যাটা ওখানে বসে।'

সুটকেসগুলো আবার আগের জায়গায় তুলে রাখল তিন গোয়েন্দা। গাড়ি স্টার্ট দিলেন রাবাত। রাস্তায় উঠলেন না। মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললেন উত্তরে। ক্রমে সরে যেতে থাকলেন হাইওয়ে থেকে।

ফিরে তাকাল রবিন। এখনও অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে মিলার। মাথা চুলকাচ্ছে অফিসার। মনে হচ্ছে, কোন কিছু অবাক করেছে তাকে।

কিছুদূর এগিয়ে একটা রাস্তা দেখা গেল। সেটাতে উঠে পড়লেন রাবাত। কয়েকটা গাঁয়ের ভেতর দিয়ে গেছে পথটা। দুই ধারে মাঝে মাঝেই পড়ছে বিস্তৃত পশুচারণভূমি। গরু-ঘোড়া চরছে। দক্ষিণ ডাকোটার পিয়েরিতে পৌঁছে মিসৌরি নদী পার হয়ে এল ওরা তারপর কয়েকটা ছোট ছোট শহর। পশুচারণভূমি অনেক আছে এখানেও।

মিনেসোটা সীমান্তের মাইল পঞ্চাশেক দূরে একটা ছোট সরাইয়ে রাত কাটাতে উঠল ওরা। গ্যারেজ আছে। তাতে তালা দেয়ার ব্যবস্থাও আছে।

গাড়ি ঢুকিয়ে রাখলেন রাবাত। সরাইয়ের মালিক এক হাসিখুশি মহিলা। নাম মিসেস আরগন। প্রচুর কথা বলে। সারাক্ষণ বকবক করে গেল। একাই কথা বলল। তার প্রশ্নের জবাব দিল কিনা কেউ, সেটাও লক্ষ করল না।

রাতে চমৎকার রান্না করে খাওয়াল মহিলা। সকালে দিল আঞ্চলিক নাস্তা।

আবার বেরিয়ে পড়ল ওরা। বাতাস কোমল, ভেজা ভেজা। গালে এসে লাগছে।

মিনেসোটা পেরোনোর সময় হাইওয়ে থেকে দূরে রইল। তবে রোচেস্টারে এসে আবার হাইওয়েতে উঠল। উইসকনসিনের লা ক্রসের দিকে এগোল।

রাবাতের মেজাজ ভাল। বললেন, 'মিলার আসুক আর না-ই আসুক, লা ক্রসে থামব আমরা। এখানে বড় হয়েছিল মুসার নানী। এত সুন্দর শহর খুব কমই আছে।'

'তা থাকা যায়। মিলারের চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিলেই পারি,' মুসা বলল। 'তার যন্ত্রটা খুলে ফেলে দিয়েছি। আর পিছু নিতে পারবে না সে।'

'ওই শেয়ালটাকে বিশ্বাস নেই। আরেকটা বুদ্ধি বের করে ফেলতে পারবে। পিছু নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েই বেরিয়েছে সে। আমার বাড়িতেও নিশ্চয় ওধরনের যন্ত্র অনেক লাগিয়েছে। তাতে করে জেনে গেছে, আমি কি করছি।'

আগে হলে এ সব কথায় গুরুত্ব দিত না কিশোর। কিন্তু এখন বিশ্বাস করল। মিলার ওদের পিছু নিয়েছে রাবাতের আবিষ্কৃত জিনিসটা ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই।

জিনিসটা কি? অনুমানও করতে পারল না কিশোর। কারণ করার মত কোন সূত্রই নেই তার হাতে। যন্ত্রটা খোঁজার সময় আবিষ্কারটাও পাওয়ার আশায় ছিল সে। নজর রেখেছিল। কিছুই চোখে পড়েনি। তবে কি রাবাতের পকেটে আছে? নাকি মাথায়? মাথায় থাকলে মিলার ওটা চুরি করবে কি করে?

মনটিরেতে ওই লোকটার সঙ্গে কি জন্যে দেখা করেছিল মিলার? ফিশারম্যান ওআর্ফে সেই যে লোকটা, দামী পোশাক ছিল যার পরনে, গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখেই যে কেটে পড়েছিল, উধাও হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তে। রাবাতের প্রতি তার তেমন নজর ছিল বলে মনে হয়নি, কোন আকর্ষণ ছিল না। মিলারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কেন?

'ওই যে!' রাবাতের আচমকা চিৎকারে ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল কিশোর।

সামনে একটা নদী। ওপরে ব্রিজ। রাবাত জানালেন, নদীটা মিসিসিপি। নদীর মাঝখানে অনেক চড়া, দ্বীপের মত হয়ে আছে। ঘন গাছে ছাওয়া। নদীর অন্য পাড়ে একটা শহর।

'ওইটাই লা ক্রস,' বললেন তিনি। 'আজ রাতে ওখানে থাকব।'

বিকেলে সেদিন নদীর পাড়ের একটা রেস্টুরেন্টে খাবার খেলো ওরা।

বেরিয়ে এল আশপাশের অঞ্চল ঘুরে দেখার জন্যে। কাদার মধ্যে খোঁচাখুঁচি করছে ম'ড সোয়ালো পাখি। একটা দ্বীপের ধারে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে একটা বড় বক।

'মার্ক টোয়েনের সময়ও নিশ্চয় এমনই ছিল মিসিসিপি,' রাবাত বললেন। 'মনে আছে, হাকলবেরি ফিনের সঙ্গে একটা দ্বীপে গিয়ে লুকিয়েছিল টম সয়্যার? নিশ্চয় ওরকমই কোন দ্বীপ ছিল সেটা।'

'একটা কাজ করলে তো পারি,' রবিন বলল, 'একটা জাহাজে চড়ে বসি। মোটেলের ডেস্কে লেখা দেখলাম এক ঘণ্টা পর পরই লা ক্রস থেকে বোট ছাড়ে, ভাটির দিকে যায়।'

'ঠিক!' তুড়ি বাজালেন রাবাত। 'আমরাও যাব! তবে রাতে নয়, কাল সকালে।'

পরদিন সকাল পৌনে এগারোটায় লা ক্রস কুইন নামে একটা জাহাজে চড়ে বসল ওরা। ওটা ডিজেল ইঞ্জিনে চলবে শুনে হতাশ হলেন রাবাত। তিনি আশা করেছিলেন, পুরানো ধরনের বাষ্পীয় ইঞ্জিনে দুই পাশে বড় বড় গরুর গাড়ির চাকার মত হুইল দিয়ে চালানো হবে। মিসিসিপির পুরানো ঐতিহ্য। যাত্রাটাই না বাতিল হয়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি মুসা বোঝানোর চেষ্টা করল, ডিজেল ইঞ্জিন অনেক বেশি নিরাপদ। আগের বাষ্পীয় ইঞ্জিনগুলো তো দুর্ঘটনা ঘটাত। বিস্ফোরিত হয়ে গিয়ে কত বোট ডুবিয়ে দিয়েছে নদীতে।

খুশি করা গেল না রাবাতকে। তবে জাহাজ থেকে নেমেও গেলেন না। ছেলেদের নিয়ে ওপরের ডেকে রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়ালেন। বন্দরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। প্রচুর লোকজন নানা কাজে ব্যস্ত। একটু দূরের একটা পার্কে খেলা করছে বাচ্চারা। খুব উপভোগ করছিলেন তিনি। হঠাৎ একটা দৃশ্য রাগিয়ে দিল তাঁকে।

হাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখো! দেখো, ওই দ্বিতীয় লোকটা!'

তার নির্দেশিত দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। বন্দরে জেটির কাছে রেখে আসা বুইকটা দেখা যাচ্ছে। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। কৌতূহলী হয়ে গাড়িটা দেখছে।

চোখ বড় বড় করে ফেলল কিশোর। সেই লোকটা, মনটিরেতে যার সঙ্গে দেখা করেছিল মিলার।

'ওই ব্যাটাই, তাই না?' রাবাত বললেন। 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!'

মেইন ডেকে নামার সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলেন তিনি। কিন্তু লোকজন ভিড় করে উঠে আসছে। ইঞ্জিনও চালু হয়ে গেছে। কাঁপতে শুরু করেছে লা ক্রস কুইন। রাবাত মেইন ডেকে নেমে আসার আগেই চলতে শুরু করল জাহাজ। দূরত্ব বাড়ছে জেটির সঙ্গে।

তেরো

জাহাজটার আবার জেটিতে ফিরতে এক ঘণ্টার বেশি লেগে গেল। সবার আগে নামলেন রাবাত আর তিন গোয়েন্দা। দৌড় দিলেন বুইকের দিকে।

গাড়ির কোন ক্ষতি করা হয়নি। তালা ভেঙে দরজা খোলারও চিহ্ন নেই। হামাগুড়ি দিয়ে নিচে ঢুকে গেল মুসা, আবার যন্ত্রটন্ত্র কিছু লাগিয়ে দিয়েছে কিনা দেখার জন্যে। ট্রাংক খুলে সুটকেসগুলো বের করে আনল রবিন আর কিশোর। ওগুলোর ভেতরও দেখল। রাবাত দেখলেন সীট আর ড্যাশবোর্ডের নিচে। হুড তুলে ইঞ্জিনের চারপাশের খালি জায়গায়ও দেখলেন।

'নেই!' ঘোষণা করলেন তিনি। 'তাহলে ওই ইবলিসটা এসেছিল কেন? আবার আমাদের খুঁজে বের করল কি ভাবে? যন্ত্রটা তো খুলে ফেলে দিয়েছি!'

'হয়তো অপেক্ষা করে করে,' রবিন বলল।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল অন্যেরা।

'আমার কথাই বলি। ধরা যাক, যাকে ধরতে চাই তার গন্তব্য জানা আছে আমার। পথের মাঝে তাকে হারিয়ে ফেললাম। বুঝলাম অন্য কোন ঘুরপথে পালিয়েছে। তখন তাকে ধরতে হলে কি করব? তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে এমন কোথাও বসে থাকব, যেখান দিয়ে ট্যুরিস্ট যাতায়াত করে। ট্যুরিস্ট স্পট। অপেক্ষা করতে থাকব'। নজর রাখব। লা ক্রসে এসে অবশ্যই আমি জাহাজঘাটায় খোঁজ নেব, আমার লোকটা জাহাজে উঠে বেড়াতে যাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে। কারণ বেশির ভাগ ট্যুরিস্টই এখানে এসে এই কাজ করে।'

মাথা ঝাঁকালেন রাবাত। 'ঠিক। এটাই ঘটেছে। চালাক ছেলে তুমি, রবিন। তোমরা তিনজনই খুব চালাক।'

'এখান থেকে কেটে পড়া উচিত আমাদের,' রবিন বলল। 'এখন থেকে ট্যুরিস্টরা যে সব জায়গায় যায়, সে-সব এড়িয়ে চলব আমরা। মেইন রোডে যাব না পারতপক্ষে। তাহলেই আর খুঁজে পাবে না আমাদের।'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে। তাড়াতাড়ি কেটে পড়া উচিত এখন। একবার নিউ ইয়র্কে পৌঁছে গেলে আর কিছু করতে পারবে না মিলার। ওর সুযোগ শেষ হয়ে যাবে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই লা ক্রস থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বেশ কিছু ছোট ছোট রাস্তা দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে গেছে। সেগুলো ধরে এগোল। রাত কাটাল ইলিনয় রাজ্যের রকফোর্ড শহরের বাইরে একটা সরাইখানায়।

পরদিন সকালে শিকাগো শহরে পৌঁছল ওরা। ছেলেদের লেক শোর ড্রাইভ দেখাতে নিয়ে গেলেন রাবাত। লেক মিশিগানের দিকে মুখ করা প্রচুর দামী দামী সৌখিন বাড়ি আর বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং দেখা গেল।

'বাড়ি ফিরে বলতে পারবে এখন, মিশিগান হ্রদ দেখতে গিয়েছি নাম,'

হেসে বললেন রাবাত।

শহরের সবচেয়ে লম্বা একটা বাড়ির ওপরের তলার রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়া সারল ওরা। তারপর গাড়ি জমাল ইনডিয়ানার ভেতর দিয়ে।

রাত কাটাতে থামল স্টারজিসে। রবিনের ক্যামেরার ফিল্ম ফুরিয়ে গেছে। শহরের প্রধান সড়কের ধারে ক্যামেরার দোকান আছে, তবে বন্ধ হয়ে গেছে সেটা। সুপারমার্কেটে গেল রবিন।

দোকানে ঢুকে কোণের দিকে একটা কাউন্টার দেখতে পেল। যে লোকটা তার কাছে ফিল্ম বিক্রি করল, সে অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার। টাকা দিয়ে দরজার দিকে এগোল রবিন। হঠাৎ পথরোধ করা হলো তার।

সেই সুবেশী লোকটা, মনটিরেতে মিলারের সঙ্গে দেখা করেছিল যে, লা ক্রস বন্দরে ওদের গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল।

চোখে চোখে তাকিয়ে রইল রবিন। কথা বেরোল না। নড়তে পারল না।

'তোমার সঙ্গে নেই ওটা,' ভোঁতা, খসখসে গলায় বলল লোকটা। 'তবে অসুবিধে নেই। আদায় করে নিতে পারব।'

রবিনের হাত চেপে ধরল সে। 'এসো।' ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

সরে যাওয়ার চেষ্টা করল রবিন। পারল না। কব্জিতে ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে চেপে বসেছে লোকটার আঙুল। স্বয়ংক্রিয় দরজার দিকে ওকে টেনে নিয়ে চলল লোকটা। দরজার কাছাকাছি আসতেই হুশ করে খুলে গেল পাল্লা। দরজার ওপাশে পার্কিং লট, তার ওপাশে...

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে রবিনের মাথায়। লোকটার সঙ্গে নিশ্চয় মিলারও এসেছে। লুকিয়ে আছে কোথাও। রবিনকে আটকে রেখে দু'জনে মিলে মুক্তিপণ হিসেবে রাবাতের কাছ থেকে তাঁর আবিষ্কারটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। যদি দিতে অস্বীকার করেন রাবাত? ওকে কি করবে ওরা?

চিৎকার করে উঠল রবিন। লোকটার পায়ে গোড়ালি দিয়ে লাথি মেরে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। লাগাতে পারল না। ঝট করে পা সরিয়ে নিয়েছে লোকটা। তারমানে জুডো-কারাত জানা আছে তারও। সহজ লোক নয়।

দরজার কাছে একটা ওয়াটার কুলার দেখতে পেয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রবিন। পানি বের করার হাতলটা চেপে ধরল। তাকে সরানোর জন্যে টানাটানি শুরু করল লোকটা। পারল না। টান লেগে পানি বেরিয়ে আসতে লাগল। পানি পড়তে লাগল রবিনের মুখে, গলায়; শার্ট ভিজে গেল। কিন্তু বোতাম ছাড়ল না। চিৎকারও বন্ধ করল না।

'দেখো,' ধমক দিয়ে বলল লোকটা, 'বন্ধ করো এ সব!' জোরে বলল না সে, কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখল। যেন অবাধ্য ছেলেকে শাসন করছে বাবা।

চেঁচামেচি শুনে সেখানে এসে হাজির হলো অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার। 'কি হয়েছে?'

'না, কিছু না,' শান্তকণ্ঠে বলল লোকটা। রবিনের কব্জি ছাড়েনি। তার

হাতল ধরা হাতটাও ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। ম্যানেজারকে বলল, 'রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে ছেলেটা...'

'মিথ্যে কথা!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'এই লোক আমার বাবা নয়! জীবনে চোখেও দেখিনি একে! ও একটা ডাকাত! হোটেলে আগুন লাগিয়েছে! কিডন্যাপার! জলদি পুলিশ ডাকুন!'

ছোটখাট ভিড় জমে গেল। চার-পাঁচজন দোকান-কর্মচারী ছোট ঠেলাগাড়িতে করে মাল নিয়ে চলেছিল, দাঁড়িয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন তরুণ ক্লার্কও রয়েছে, লাল জ্যাকেট পরা।

'হ্যারি,' ওকে বলল ম্যানেজার, 'যাও তো, শেরিফের অফিসে ফোন করো। এখানে কি হয়েছে বলবে। ওরা এসে যা করার করুক।'

'আশ্চর্য!' ধমকে উঠল মিলারের সঙ্গী। 'এর মধ্যে আবার পুলিশ ডাকাডাকি কেন?' গলার স্বর খাদে নামিয়ে ম্যানেজারকে বলল, 'আসল কথা কি জানেন? নেশা ধরেছে ও। বাড়ি থেকে পালিয়েছে। শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই ছেলেটাকে...'

'ও আমার বাবা নয়!' জোরে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'আমার নাম পর্যন্ত জানে না, জিজ্ঞেস করে দেখুন?'

লোকটার দিকে তাকাল ম্যানেজার।

'জিজ্ঞেস করুন ওকে!' আবার বলল রবিন। 'আমার নাম বলতে বলুন। বলতে পারবে না।'

মসৃণ হাসি হাসল লোকটা। 'নিজের ছেলের নাম আবার বলতে পারে না কেউ? বনেট। ওর নাম বনেট।'

কুলারের হাতল ছেড়ে দিল রবিন। পকেট থেকে বের করে আনল মানিব্যাগ। তার ভেতর থেকে স্টুডেন্ট আইডেনটিটি কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল ম্যানেজারের দিকে, 'দেখুন, আমার নাম আসলে কি? ছবিও আছে। চিনতে অসুবিধে হবে না আপনার।'

কার্ডটা হাতে নিল ম্যানেজার।

মিলারের সঙ্গী ভাবেনি রবিনের সঙ্গে কার্ড আছে। আর একটা মুহূর্ত দাঁড়াল না সে। দোকান থেকে বেরিয়ে পালাল।

চোদ্দ

সুপারমার্কেটের ডেইরি সেকশনের পেছনে সেঁতসেঁতে ছোট ঘরটায় বসে ডেপুটি শেরিফের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে রবিন। কিন্তু বোঝানো সহজ হচ্ছে না।

'কেন তোমাদের পেছনে লোক লাগবে?' জিজ্ঞেস করল অফিসার।

'মিস্টার রাবাত বলেছেন, তার আবিষ্কৃত একটা জিনিসের ফর্মুলা নিয়ে চলেছেন। সেটাই ছিনিয়ে নিতে চাইছে লোকটা।'

রাবাত কে জানতে চাইল অফিসার। তার বন্ধুর নানা, জানাল রবিন। কি জিনিস আবিষ্কার করেছেন রাবাত, জানে না সে। তাদেরকে বলেননি তিনি। নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাবেন। বিশেষ কারও কাছে বিক্রি করবেন ওটা। সেই বিশেষ লোকটি কে, তা-ও জানে না সে। শেষে বলল, 'মিস্টার রাবাত বলেন, আমাদের জন্যে জানাটা নাকি বিপজ্জনক। না জানলেই ভাল।'

'কিন্তু বিপদটা তো এড়াতে পারলে না,' অফিসার বলল।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। অফিসার তাকে মোটেলে পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব দিলে খুশি হয়েই রাজি হলো।

গাড়িতে করে তাকে পৌঁছে দিল অফিসার।

কি ঘটেছে শুনে রেগে আগুন হলেন রাবাত। কি আবিষ্কার করেছেন, অফিসারকে জানাতে রাজি নন মোটেও। রকি বীচ থেকে যে তাঁদের পিছু নেয়া হয়েছে, সব খুলে বললেন। কোন কথা বাদ দিলেন না। মোটেলে আগুন লাগার কথাও নয়। পেট্রোল ট্যাংকের নিচে যন্ত্র আটকে দেয়ার কথা বললেন। এমনকি লা ক্রসে লোকটা যে বুইকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সে-কথাও।

চুপচাপ শুনল অফিসার। শেষ দিকে অবিশ্বাসের ভঙ্গি দেখা দিল তার চোখেমুখে। বলল, 'তাই নাকি? আর কিছু ঘটেছে?'

'কেন, যথেষ্ট হয়নি? আরও কিছু ঘটুক, চান নাকি?' রেগে উঠলেন রাবাত।

'না না, তা বলিনি।'

মাউন্ট সেইন্ট হেলেনে দেখা গাড়িটার নম্বর অফিসারকে জানাল কিশোর। রিপোর্ট লিখে নিল অফিসার। তার নিচে সই করলেন রাবাত আর রবিন।

বেরিয়ে গেল অফিসার। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ওদের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে।

'ওই দুই ব্যাটাকে ধরতে পারবে না পুলিশ,' রাবাত বললেন। 'এতক্ষণে শহর ছেড়ে পালিয়েছে ওরা।'

তাঁর কথার প্রতিবাদ করল না কেউ।

রাতে বিছানায় শুয়ে কিশোর বলল, 'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না।'

মুসা কেবল গোঙাল। ঘুমে ভারী হয়ে এসেছে চোখ।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'তোমাকে কিডন্যাপ করতে চাইল কেন?'

'রাবুনানার আবিষ্কার আদায় করার জন্যে।'

'সেটা তো বুঝেছি। আমি বলতে চাইছি, তোমাকে কেন? আমাকে আর মুসাকে নয় কেন?'

'কি জানি! হয়তো তক্কে তক্কে ছিল, যাকে একা পেয়েছে তাকেই ধরেছে। আমাদের আগে তোমাদের পেলে তোমাদেরও ধরত।'

তন্দ্রা টুটে গেছে মুসার, 'শান্তশিষ্ট দেখেছে তো, হয়তো ভেবেছে ওকে ধরাটাই নিরাপদ।'

হাসল কিশোর। 'শান্ত যে কি পরিমাণ, সেটা তো বুঝিয়ে দিয়েছে।' চিন্তায় ডুবে গেল সে। আনমনে বিড়বিড় করতে লাগল, 'লোকটা বলেছে—তোমাদের সঙ্গে জিনিসটা নেই। আমরা ধারণা করছি, জিনিসটা রাবুনানার আবিষ্কার। কিন্তু অন্য কিছুও হতে পারে।'

'কিশোর,' রবিন বলল, 'ব্যাপারটা নিয়ে কালও আলোচনা করা যাবে। এখন আর পারছি না। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'আমারও,' মুসা বলল। 'আমি ভেবেছিলাম, ছুটি কাটাতে বেরিয়েছি। কিন্তু ছুটি যে এত টেনশনের, কল্পনাও করিনি।'

এত তাড়াতাড়ি ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা ঘুমাও।'

ঘুমিয়ে পড়ল রবিন আর মুসা। চুপচাপ ছাতের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কোন শব্দ নেই। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে কেবল রাবুনানার নাসিকা গর্জনের শব্দ।

পনেরো

পরদিন ভোর হওয়ার আগেই ওদেরকে ডেকে তুলে বেরিয়ে পড়লেন রাবাত। ভ্রমণটা আর ভ্রমণ নেই এখন ওদের জন্যে, তাড়া খেয়ে পালানোর অবস্থা হয়েছে। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যাওয়া রাস্তা ধরে চলা বাদ দিয়েছে, কারণ, লাভ নেই। যে পথে যত সতর্ক থেকেই ওরা চলুক না কেন, শত্রুরা ঠিক বুঝে ফেলছে। ওদের পিছু নিয়ে চলে আসছে। সুতরাং হাইওয়ে ধরে যাওয়াই ভাল। তাতে ঝামেলা কম হবে, তাড়াতাড়ি চলা যাবে, সময়ও বাঁচবে। আরও একটা ব্যাপার, হাইওয়েতে যানবাহনের ভিড় থাকায় দিনে-দুপুরে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করবে শত্রুরা।

ইনডিয়ানার পর ওহাইওর ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল ওরা। একটানা চালিয়ে সন্ধ্যাবেলা কাহিল হয়ে পড়লেন রাবাত। মেজাজ গেল বিগড়ে। এ সবের জন্যে দায়ী করতে লাগলেন মিলারকে। তাকে এখন পেলে কি করবেন, উষ্মার সঙ্গে সে-কথা বলতে লাগলেন। পেনসিলভানিয়ায় এসে আর চালানোর সাধ্য হলো না। হাইওয়ে থেকে দু'শো গজ দূরে একটা মোটেলে রাত কাটানোর জন্যে থামলেন।

'তোমরা গিয়ে সাঁতার কাটো, টেলিভিশন দেখো, যা ইচ্ছে করো,' বললেন তিনি। 'আমি পেট্রোল আনতে যাচ্ছি। চলে আসব এখনই।'

'আমরাও যাব তোমার সঙ্গে,' মুসা বলল।

'কি দরকার? বডিগার্ড লাগবে না আমার!' ধমকে উঠলেন রাবাত। মেজাজ খারাপ হয়েছে ভালমতই। 'রাস্তার ওপরই একটা পেট্রোল স্টেশন দেখে এসেছি। নিয়ে আসি। যাব আর আসব।'

আর কিছু বলার সাহস পেল না মুসা।

ঘরে এসে টেলিভিশন চালু করে দিল ওরা। পর্দায় চোখ আছে, মন নেই চিন্তিত। রাবুনানার ফেরার অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে রইল।

বিশ মিনিট গেল। আধঘণ্টা।

মুসা বলল, 'এত দেরি! নিশ্চয় কিছু ঘটেছে!'

ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করল কিশোর। জানালার কাছে উঠে গেল রবিন। বাইরে তাকিয়ে রইল। ছোট একটা শহরের প্রান্তে ঠাঁই নিয়েছে ওরা। গাছপালার ভেতর দিয়ে শহরের আলো দেখা যাচ্ছে।

'হঠাৎ করেই হয়তো কোন জিনিস কেনার কথা মনে পড়েছে,' বলল সে। 'শহরে চলে যাননি তো?'

'কিংবা এখানে পেট্রোলের দাম বেশি দেখে অন্য কোন পাম্পে গেছেন,' বলল কিশোর। কিন্তু কেন যেন কথাটা বিশ্বাস হতে চাইল না নিজেরই।

আরও পনেরো মিনিট পেরোল। আর অপেক্ষা করতে পারল না ওরা। জ্যাকেটগুলো আবার গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রাস্তায় নামল।

মোটেলে সবচেয়ে কাছের পাম্পটায় পাওয়া গেল না তাঁকে। কর্মচারী জানাল, ওরকম কাউকে দেখেনি। 'তবে,' বলল সে, 'ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসা একটা গাড়ি দেখেছি। এত দূর থেকে গাড়িতে করে সাধারণত আসে না কেউ। কালেভদ্রে হয়তো দু'একটা চোখে পড়ে।'

পরের স্টেশনটায় চলল গোয়েন্দারা। ঘন হয়ে আসছে তখন অন্ধকার। দ্বিতীয়টাতেও পাওয়া গেল না রাবাতকে। তৃতীয় স্টেশনটা রয়েছে পথের মোড়ে। সেখানকার কর্মচারী ছেলেদের বয়েসী। সে জানাল, বুইক গাড়িওয়ালা একজন বুড়ো মানুষকে দেখেছে।

'আধঘণ্টা আগে,' ছেলেটা বলল, 'কিংবা আরও কিছুটা বেশি হবে, বুড়ো লোকটা তেল নিতে এল। ট্যাংক ভরে তেল নিল। তেল আর পানি চেক করে দিলাম। টায়ারের হাওয়াও।'

'এখান থেকে বেরিয়ে কোনদিকে গেছে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই,' মোটেলের দিকে দেখাল ছেলেটা। 'তারপর কোথায় গেল, খেয়াল করিনি। দুটো মোটর সাইকেল ঢুকল তখন। ওদের তেল দিতে গেলাম।'

'মোটর সাইকেল?'

ভুরু কুঁচকে ফেলল কিশোর। ছেলেটা মুসার প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগেই জিজ্ঞেস করল, 'কয়টা বললে?'

'দুটো। কেন?'

'না···ইয়ে···অনেক পশ্চিমে একটা মোটর সাইকেল গ্যাঙের সঙ্গে গণ্ডগোল বেধেছিল আমাদের। ওরাই কিনা বুঝতে চাইছি। ওরা কোন দিকে গেছে, দেখেছ?'

'ওদিকেই, বুড়ো লোকটা যেদিকে গেল। রাতে এখানে কোথায় ক্যাম্প করলে ভাল হয় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল ওরা। পার্সনস উডের পিকনিক

গ্রাউন্ডের কথা বলে দিলাম। শোনো, একটা কথা বলি,' গোয়েন্দাদের উদ্বেগ দেখে সন্দেহ হয়েছে ছেলেটার, 'তোমাদের কি মনে হচ্ছে লোকগুলো বুড়ো মানুষটার ক্ষতি করবে? বলো তো পুলিশে ফোন করতে পারি।'

দ্বিধা করতে লাগল গোয়েন্দারা। নানার বদমেজাজের কথা ভাবল মুসা। অতি সামান্য কারণেও রেগে ওঠেন অনেক সময়। আজ বিকেলে মেজাজ খুবই খারাপ। ছেলেরা তার জন্যে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করছে ভাবলেই ফেটে পড়বেন।

'থ্যাংকস,' বলল মুসা, 'লাগবে না। সাহায্যের দরকার হলে তোমাকে জানাব।'

'পিকনিক গ্রাউন্ডে কি করে যেতে হয়?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

ছেলেটা জানাল, ওখান থেকে বড়জোর আধ মাইল দূরে। অফিস থেকে একটা শূন্য ওঅর্ক অর্ডারের ফর্ম নিয়ে তার উল্টো দিকের সাদা অংশে নকশা এঁকে দেখাল কি করে যেতে হবে ওখানে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। ফিরে এল হাইওয়েতে। নকশাটা রবিনের হাতে।

মোটেলের দিকে এগোনোর সময় দেখল মেইন রোড থেকে একটা রাস্তা নেমে গেছে বাঁয়ে। নকশায় এই রাস্তাটাই এঁকে দিয়েছে পাম্পের ছেলেটা। সেটা ধরে এগোল ওরা। সামনে বাড়িঘর কিংবা দোকান চোখে পড়ল না। খানিক পর পর ল্যাম্প-পোস্ট আছে রাস্তায়। কিছুদূর গিয়ে আর তা-ও নেই। অন্ধকার। তবে চাঁদ উঠছে। তার ফ্যাকাসে আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

এগোতে থাকল ওরা। খানিক পর সামনে আলো দেখা গেল। পথের বাঁয়ে খোলা জায়গায় ক্যাম্প করেছে কেউ। আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় দুটো লোককে দেখতে পেল ওরা। সতর্ক হয়ে পা টিপে টিপে এগোল। আরেকটু এগোতে বুইকটাও চোখে পড়ল। রাস্তা থেকে নামিয়ে আগুন থেকে সামান্য দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গাড়িটার কাছ থেকে কিছু দূরে, আগুন থেকে কাছে একটা কাঠের টেবিলের সামনে পিকনিক বেঞ্চে বসে আছেন রাবাত। আগুনের কাছে নড়াচড়া করা লোকগুলোর দিকে চোখ।

তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবে পাথরের মত কঠিন যে হয়ে আছে, আন্দাজেই বুঝতে পারছে মুসা। 'ওই মোটর সাইকেল গ্যাঙেরই লোক!' ফিসফিস করে বলল সে। 'নানাকে ধরে নিয়ে এসেছে!'

চুপ থাকতে ইশারা করল তাকে কিশোর।

রাস্তা থেকে খোয়া বিছানো একটা পথ বেরিয়ে চলে গেছে পিকনিক গ্রাউন্ডের ভেতর দিয়ে। ওটা ধরে এগোল তিন গোয়েন্দা। লোকগুলোর দিকে চোখ থাকায় মোটর সাইকেল দুটো দেখতে পায়নি রবিন, আরেকটু হলে ওগুলোর ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। সাইকেল দুটোর আড়ালে বসে পড়ল ওরা।

আগুনের কাছে কথা বলছে লোকগুলো। এখান থেকে স্পষ্ট কানে

আসছে।

'এখনও তোমার কিছুই করিনি আমরা, বুড়ো বাদুড়,' হুমকির সুরে বলল একজন, 'এমন জায়গায় ধরে নিয়ে যাব, এমন অবস্থা করে ছাড়ব, কেঁদে পার পাবে না তখন।'

একটা ক্যান থেকে চোঁ চোঁ করে কিছু গিলল লোকটা—কোন ধরনের ড্রিংকস হবে। শেষ করে ক্যানটা আঙুলে চেপে দুমড়াল, কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল পেছনে। মাটিতে রাখা একটা কাগজের থলে হাতড়ে আরেকটা ক্যান বের করল। আগেরটার মতই টান দিয়ে শেষ করে ফেলল এটাও। ফেলে দিয়ে, গুড়ুক করে ঢেকুর তুলে, শার্টের হাতা দিয়ে ঠোঁট মুছল।

নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করলেন রাবাত। অসহ্য লাগছে তাঁর, বোঝা গেল। আরেক দিকে মুখ ফেরালেন।

'এই বুড়ো,' ধমকে উঠল লোকটা, 'আরেক দিকে তাকাচ্ছ কেন? আমি কথা বলার সময়, আমার দিকে তাকাবে।'

রাগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। হাত ধরে টেনে আবার তাকে বসিয়ে দিল কিশোর।

'অই বাদুড়,' বলল লোকটা, 'পাহাড় বেয়ে দৌড়ে উঠেছ কখনও, এমন পাহাড় যেটাতে চড়ার সাধ্য নেই কারও?'

হেসে উঠল দ্বিতীয় লোকটা। 'খুব ভাল লাগবে তোমার, ভাম—ওঠার আগেই যদি অবশ্য মরে না যাও।'

হাসতে লাগল দু'জনে।

মুসার হাত ছেড়ে দিয়েছিল কিশোর। হঠাৎ খেয়াল করল সে নেই তার পাশে। অন্ধকারে কখন উঠে চলে গেছে! রেগে গেলে মুসার মাথার যে ঠিক থাকে না, কি না কি করে বসে, ভেবে মুখ শুকিয়ে গেল তার।

কিন্তু অঘটন না ঘটিয়ে ফিরে এল মুসা। দু'জনের মাথা টেনে এনে কানে কানে বলল, 'শোনো, ওদের সাইকেলের চাবি লাগিয়ে রেখে গেছে। নানারটাও ইগনিশনেই ছিল, নিয়ে এসেছি।' দেখাল সে। একে একে মোটর সাইকেলের চাবি দুটোও খুলে নিল।

'নানাকে কোথাও আর নিয়ে যেতে পারবে না ওরা,' বলল সে। 'এগুলো নিয়ে পাম্পটায় চলে যাও তোমরা। পুলিশকে ফোন করো। আমি পাহারা দিচ্ছি। নানার গায়ে হাত তোলার চেষ্টা যদি করে···আমি ওদেরকে···আমি ওদেরকে···' ভয়ানক রাগে ফুঁসতে লাগল সে।

অন্ধকারে হাসল কিশোর। আরেকটা চমৎকার বুদ্ধি এসেছে তার মাথায়।

দুটো সেকেন্ড চুপ করে বুদ্ধিটা মনে মনে খতিয়ে দেখল সে। কোন ভুল আবিষ্কার করতে পারল না। তবে এতে কাজ হবে। নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে রাবাতকে। গুণ্ডাদুটোরও খানিকটা শায়েস্তা হবে।

'তার চেয়ে আমার বুদ্ধি শোনো,' ফিসফিস করে বলল সে, 'মোটর সাইকেল চালাতে জানো না?'

প্রশ্নটা করে অন্য কিছু বোঝাতে চাইছে কিশোর। মুসা বলল, 'ওদের একটা বাইক সরিয়ে নিতে বলছ? পাগল নাকি?'

'না।' পরিকল্পনার বাকি অংশটা বলল কিশোর।

সত্যি চমৎকার প্ল্যান, স্বীকার করতেই হলো মুসাকে। খুঁত না থাকলেও বিপদ আছে, তাতে সন্দেহ নেই। সাইকেল সে সরিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে কিশোর আর রবিন কি পেরে উঠবে দুটো বিশালদেহী গুণ্ডার সঙ্গে?

ভাবার সময় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। দেরি করলে হয়তো রাবাতের ওপর অত্যাচার শুরু করে দিতে পারে লোকগুলো।

'বেশ,' উঠে দাঁড়াল মুসা, 'তা-ই করব আমি!'

অন্ধকারে গা ঢেকে ছায়ার মত নিঃশব্দে আবার বুইকের কাছে চলে গেল মুসা। শব্দ না করে ট্রাংক খুলে কয়েকটা যন্ত্রপাতি বের করে আনল। ওগুলো নিয়ে কাজে লেগে গেল তিনজনে।

একের পর এক বিয়ারের ক্যান খালি করছে দুই গুণ্ডা। পেট ঢোল করে ফেলছে। নেশা ধরতে আরম্ভ করেছে। জিভ ভারী হয়ে আসছে। কথা কেমন আড়ষ্ট আর এলোমেলো। মুসা ভাবল, কাজ করতে গিয়ে সামান্য শব্দ যদি হয়েও যায় এখন, খেয়াল করবে না ওরা। তবে শব্দ করল না। খুব সাবধানে কাজ করতে লাগল।

'ভাগ্যিস মাত্র দু'জন এসেছে,' কিশোর বলল। 'সবগুলো একসঙ্গে থাকলে মুশকিল হয়ে যেত। এ সব করতে পারতাম না।'

একটা বাইকের ইগনিশনে চাবি ঢোকাল আবার কিশোর। দ্বিতীয় চাবিটা দিল মুসার হাতে। অন্য বাইকটার সীটের দু'পাশে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে এখন ও।

বাইকটা বিশাল। সন্দেহ নেই, ক্ষমতাও নিশ্চয় সাংঘাতিক। হ্যান্ডেল ধরে ঠেলে স্ট্যান্ড থেকে নামাল ওটাকে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে লম্বা দম নিল। কিক মারল স্টার্টারে।

রেগে যাওয়া জন্তুর মত গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন, পরক্ষণে বন্ধ হয়ে গেল।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা।

চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দুই গুণ্ডা।

আবার কিক মারল মুসা।

আবার গর্জে উঠল ইঞ্জিন। আর বন্ধ হলো না। গিয়ার দিয়েই এক্সিলারেটরে মোচড় দিল মুসা। খেপা ঘোড়ার মত লাফ মারল বাইক। এত শক্তিশালী মোটর সাইকেল আর চালায়নি সে। এতটা যে ক্ষমতা থাকতে পারে কল্পনাই করেনি। হ্যাঁচকা টান লেগে আরেকটু হলেই হাত থেকে ছুটে যাচ্ছিল হ্যান্ডেল। মনে হলো, কাঁধ থেকে বুঝি খসে গেল বাহু দুটো।

অসমান জমিতে ঝাঁকি খেতে খেতে একটা খাদের পাশ দিয়ে ছুটল বাইক, উঠে এল খোয়া বিছানো পথে। উড়ে চলল যেন। ভীষণ উত্তেজনায় গলা ফাটিয়ে জানোয়ারের মত চিৎকার করে উঠল মুসা। শক্তিশালী বাইক

চালানোর মজাই আলাদা—মনে হয় ইঞ্জিন থেকে বাইকের গা বেয়ে আরোহীর শরীরেও এসে ঢোকে প্রচণ্ড ক্ষমতা। উন্মাদনা জাগে রক্তে। এক অদ্ভুত স্বাধীনতা বোধ। সেজন্যেই বোধহয় মোটর সাইকেল গ্যাঙ তৈরি হয়, গাড়ি বা আর কোন যানবাহনের গ্যাঙ হয় না।

পড়িমরি করে ছুটে এল দুই গুণ্ডা। অন্য বাইকটায় চড়ল, একজনের পেছনে আরেকজন। সামনের লোকটা স্টার্টারে কিক দিল। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। অভ্যস্ত হাত ওদের। এক্সিলারেটরে মোচড়ের তারতম্য হলো না, ফলে ইঞ্জিনও বন্ধ হলো না। চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ করল। কিন্তু মাত্র কয়েক গজ। খাদটার কাছে আসতে না আসতেই খুলে গেল সামনের চাকা।

শোনা গেল চিৎকার-চেঁচামেচি, খিস্তি করে গালাগাল। খাদে পড়ে গেছে দুই গুণ্ডা।

দৌড় দিয়েছে ততক্ষণে রবিন আর কিশোর। রাবাতের কাছে চলে এল। দু'দিক থেকে তাঁর দু'বাহু চেপে ধরে প্রায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে ছুটল গাড়ির দিকে। একটা মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে রইলেন তিনি, তারপরই যা বোঝার বুঝে গেলেন। ছেলেদের হাত ছুটিয়ে নিয়ে নিজেই ছুটলেন গাড়ির দিকে। দরজা খুলে উঠে পড়লেন ড্রাইভিং সীটে। অন্য পাশের দরজা খুলে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল কিশোর, চাবি গুঁজে দিল রাবাতের হাতে। রবিন উঠল পেছনে। দরজা পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার আগেই চলতে শুরু করল গাড়ি। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছেন রাবাত। পুরো একটা চক্কর দিয়ে রাস্তার দিকে ঘুরতে গিয়ে আধডজন ছোট ছোট ঝোপকে মাড়িয়ে চ্যাপ্টা করে দিল। অল্পের জন্যে একটা গাছে বাড়ি লাগানো থেকে বেঁচে গেল নাকের একপাশ। দুই গুণ্ডা চমকের ধাক্কা কাটিয়ে কিছু করতে যাওয়ার আগেই রাস্তায় উঠে এল গাড়ি।

সিকি মাইল এসে গতি কমালেন রাবাত। ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দা।

রাস্তায় উঠে এসেছে গুণ্ডারা। হাত মুঠো করে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে প্রচণ্ড রাগে উন্মাদ নৃত্য জুড়েছে। নিষ্ফল আস্ফালন।

মুচকি হাসল কিশোর।

হাসতে লাগল রবিন।

ষোলো

আধঘণ্টা পর ফিরে এল মুসা। কপালে ঘাম। চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল। হেসে বলল, 'বাইকটা ফেলে দিয়েছি একটা ডোবায়। চাবি রেখে এসেছি একটা পিলার বক্সে। কিছু সময়ের জন্যে আটকে দিলাম ব্যাটাদের।'

রাবাতের দিকে তাকাল সে। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নানা, কি হয়েছিল? এত গালাগাল শোনার শখ হলো কেন হঠাৎ? প্রচুর তো

শুনলে—বাদুড়, ভাম! বাড়ি গিয়ে মাকে যদি বলি…' কথা শেষ করতে পারল না হাসির জন্যে। মা এবং নানার কি চেহারা হবে কল্পনা করে হা-হা করে হাসতে শুরু করল।

কিছুটা বিব্রত দেখাল রাবাতকে। 'আগে জানা থাকলে ধরতে পারত না। হঠাৎ করে এসে চমকে দিয়েছিল। যেটা থেকে তেল নেব বলেছিলাম সেটাতে ভিড় থাকায় মোড়ের পাম্পটায় চলে গেলাম। পেট্রোল নেয়ার পর মনে হলো, ট্যাংকের নিচে আবার যন্ত্র আটকে দেয়নি তো মিলার? রাস্তার ধারে সরে গিয়ে গাড়ির নিচে উঁকি দিয়ে দেখতে গেলাম। এই ফাঁকে আমার অজান্তে পাশে এসে দাঁড়াল শয়তান দুটো। ছুরি বের করে ভয় দেখাল, ওদের কথা না শুনলে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। পিকনিক গ্রাউন্ডে গাড়ি নিয়ে যেতে বাধ্য করল আমাকে।'

গম্ভীর হয়ে কিশোর বলল, 'সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে রয়েছেন আপনি। এখনও যে তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, এটাই বেশি।'

'থাক, অত ভাবতে হবে না,' হাত নাড়লেন রাবাত। 'আমি তখন সতর্ক ছিলাম না বলে বেকায়দায় পেয়ে গিয়েছিল। এরপর এলে আর সহজে ছাড়ব না, খানিকটা শিক্ষা দিয়ে দেব।'

কি ভাবে শিক্ষাটা দেবে, বুঝতে পারল না মুসা। তবে নানাকে জিজ্ঞেস করার সাহসও হলো না। 'পুলিশকে জানালে কেমন হয়?'

'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওদের আর জড়াতে চাই না। ওই হাঁদাগুলো এসে করবেই বা কি? শুধু শুধু একগাদা প্রশ্ন করে কেবল সময় নষ্ট করবে। শহর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে রওনা হয়ে যাব, তাহলেই হবে।'

'পশ্চিমে?'

'হ্যাঁ। ওদিকে যাব ভাববেই না ওরা। গুণ্ডাগুলোও না, মিলার আর তার দোস্তও না। পশ্চিমের কোন শহরে উঠে পুরানো গাড়ির দোকানে যাব। বুইকটা বেচে দিয়ে অন্য গাড়ি নিয়ে নেব। আবার রওনা হব নিউ ইয়র্কের দিকে। বুইকটা না দেখলে ওরা চিনতে পারবে না, আমরাও জ্বালাতন থেকে বাঁচব।'

নানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'হ্যাঁ, এইটা ভাল বুদ্ধি। বুইকটাই হচ্ছে যত নষ্টের মূল। মিলার, তার দোস্ত, মোটর সাইকেলওয়ালারা, সবাই চিনে গেছে এটাকে। ওদের খসাতে হলে গাড়িটাই বিদেয় করতে হবে।'

'জলদি মালপত্র গুছিয়ে নে। এখুনি বেরোব।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার হাইওয়েতে এসে উঠল ওরা। পশ্চিমে চলল। মধ্যরাতে ওহাইও আর পেনসিলভানিয়ার সীমান্তে একটা শহরে ঢুকল। রাস্তাগুলো সব নির্জন। বেশির ভাগ বাড়িরই আলো নিভে গেছে। তবে হাইওয়ের পাশে হলিডে ইন হোটেলটায় আলো জ্বলছে। ঘর নিতে অসুবিধে হলো না। বাকি রাতটা নিরাপদেই ঘুমিয়ে কাটানো গেল। পরদিন সকালে উঠেই চলে এল একটা গাড়ির দোকানে। তখনও খোলেনি দোকানটা।

অপেক্ষা করতে হলো ওদের।

অবশেষে দোকান খুলল। বুইকটার জন্যে যা দাম দিতে বলল সেলসম্যান, দর কষাকষি না করে তাতেই রাজি হয়ে গেলেন রাবাত। দুই বছরের পুরানো একটা ফোর্ড সেডান কিনে নিলেন। বুইকের দাম বাবদ যা কাটা গেল, সেটা বাদ দিয়ে বাকি টাকার চেক লিখে দিলেন। তারপর আবার অপেক্ষার পালা। লং ডিসট্যান্ট কল করল সেলসম্যান। চেকটা ঠিক আছে কিনা ব্যাংকে ফোন করে জেনে নেয়ার জন্যে।

ফোর্ড গাড়িটা নিয়ে দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে দুপুর পেরিয়ে গেল।

'এইবার আশা করি ঝেড়ে ফেলা যাবে ওদের,' রাবাত বললেন। কড়া নজর রেখেছেন মিলার আর তার দোস্তকে দেখা যায় কিনা। বড় করে হাই তুললেন, চোখ ডললেন। 'নাহ, বয়েস বেড়েছে আমার। ধকল আগের মত সহ্য করতে পারব না, ভুলেই গিয়েছিলাম। আর বেরোতে ইচ্ছে করছে না। আজ বরং এখানেই থেকে যাই। বিশ্রাম নিই। মিলারের ভয় আর না করলেও চলবে। ফোর্ডটা চিনতে পারবে না ও, আমাদেরও খোঁজ পাবে না।'

আপত্তি তো নেইই, বরং খুশি হয়ে রাজি হলো গোয়েন্দারা। এই একটানা ছোটা ওদেরও ক্লান্ত করে তুলেছে। হলিডে ইনে ফিরে এল ওরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাবাতের নাক ডাকানোর শব্দ শোনা গেল।

মোটেলের পুলে সাঁতার কাটল তিন গোয়েন্দা। কাছের একটা ছোট গলফ কোর্সে গলফ খেলল। বেশি দূরে গেল না। সন্ধ্যার আগে আগে ঘরে ফিরে এল। মুসা আর রবিন টেলিভিশন দেখতে লাগল। জানালার কাছে বসে কিশোর তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। বার বার ভ্রূকুটি করছে আর নিচের ঠোঁট ধরে টানছে। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আচমকা মাথা ঝাঁকিয়ে আনমনেই বলল, 'ঠিক, এটাই আসল ব্যাপার!'

ফিরে তাকাল অন্য দু'জন।

'কোনটা আসল ব্যাপার?' জানতে চাইল রবিন।

'রাবুনানার আবিষ্কারের প্রতি কোন আগ্রহ নেই মিলারের,' কিশোর বলল। 'কোনকালে ছিলও না।'

স্তব্ধ হয়ে গেল মুসা। 'খাইছে! বলো কি! আগ্রহ না থাকলে আমাদের পিছু নিয়েছে কেন? কাস্টারে নেমে আমরা যখন বন দেখতে গেলাম, আমাদের পিছু নিল, তখন পিস্তল বের করেছিল কেন? তুমি কি বলতে চাইছ পিস্তল দিয়ে বাইসন শিকারে এসেছে সে?'

'সুপারমার্কেটে আমাকেই বা ধরেছিল কেন তার দোস্ত?' রবিন বলল।

'ওর কথাই ভাবছি আমি,' কিশোর বলল। কেশে গলা পরিষ্কার করে সোজা হয়ে বসল। 'সুপারমার্কেটে ঠিক কি বলেছিল তোমাকে লোকটা, রবিন?'

'বলেছিল, আমি নাকি ওর ছেলে, নেশা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি, আমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে। অতি সহজ চালাকি। আমাকে আটকে রেখে

রাবুনানার কাছে মুক্তিপণ হিসেবে তাঁর আবিষ্কারটা চাইবে। জিনিসটা কি, বলো তো? কোন ধরনের অস্ত্র? নাকি দেশরক্ষা বাহিনীর কাজে লাগে এমন কিছু?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'ম্যানেজারকে কি বলেছে লোকটা, সেটা শুনতে চাই না। ঢুকেই তোমাকে কি বলেছিল?'

'তোমার সঙ্গে নেই ওটা। তবে অসুবিধে নেই। আদায় করে নিতে পারব।'

'তখন তোমার সঙ্গে কি জিনিস ছিল না?'

'আর কি?' ঢোক গিলল রবিন। 'নিশ্চয় রাবুনানার আবিষ্কার।'

'কেন, আর কিছু হতে পারে না? এমন কিছু, যা সব সময় তোমার সঙ্গে থাকে, কিন্তু সেই সন্ধ্যায় ছিল না?'

ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন। 'কিসের কথা বলছ?...ও, ক্যামেরাটা? ক্যামেরা এবং ক্যামেরার ব্যাগ। কিন্তু ওই সাধারণ জিনিসের প্রতি আগ্রহী হবে কেন লোকটা?'

হাসল কিশোর। 'ক্যামেরার ব্যাগে তোমার ব্যবহার করা ফিল্মগুলো ছিল। মোটেলে রেখে গিয়েছিল। ওগুলোই চাচ্ছিল সে। কোন সন্দেহ নেই আর আমার।'

হেলান দিয়ে বসে দুই হাতের আঙুলের মাথাগুলো এক করল কিশোর, তাতে দেখাল অনেকটা তাঁবুর চূড়ার মত। হাসিটা লেগে আছে মুখে। 'পিজমো বীচে তার ওপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন রাবাত, চেহারাটা কি হয়েছিল মনে আছে? সাংঘাতিক চমকে গিয়েছিল। আতঙ্কিত। আমার বিশ্বাস, আমরা যা ভাবছি সে-কারণে পিজমো বীচে যায়নি সে, গিয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

'ধরা যাক, ঘটনাক্রমেই আমাদের সঙ্গে ওখানে মিলারের দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে আসেনি। রাবুনানার বাড়িতেও আমরা বেরিয়ে আসার পর যে উঁকি মেরে দেখেছিল, সেটাও খুব সাধারণ ব্যাপার। উঁকিঝুঁকি মারা ওর স্বভাব। এক ধরনের কৌতূহল, পড়শীর ব্যাপারে যেমন থাকে কারও কারও। আমার চলে আসার পর মনটিরেতে কারও সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিল সে। আমরা সান্তা বারবারায় থেমে লাঞ্চ খেলাম, কিন্তু সে সোজা চলে গেল পিজমো বীচে। সেখানে গিয়ে হয়তো খাওয়া সেরেছে, বা বিশ্রাম নিয়েছে। তারপর আমরা গেলাম। সৈকতে একই সময়ে বেরিয়েছিলাম। রাবুনানা তো দেখেই গেলেন রেগে। মিলারের চোখে বিস্ময় দেখেছি আমি। ওর চেহারা মনে আছে?

সৈকত ধরে হেঁটে শহরের দিকে চলে গিয়েছিল সে। তারপরই বদলে গেল পরিস্থিতি। মনটিরেতে কি কি ঘটেছিল, মনে আছে তোমাদের?'

'আছে,' মুসা বলল। 'আবার ওর সঙ্গে সৈকতে দেখা হলো আমাদের। অন্য লোকটাকেও ওখানেই দেখলাম—ক্যামেরার দোকানে রবিনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল যে।'

'হ্যাঁ। বাজি রেখে বলতে পারি ফিশারম্যান ওআর্ফে আমাদের পিছু নিয়ে আসেনি মিলার। তাহলে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করত। এমন ভাবে চলাফেরা করত, যাতে আমাদের চোখে না পড়ে। কিন্তু তা সে করেনি। খোলাখুলিই সৈকতে হাঁটছিল সে, আর দশজন সাধারণ ট্যুরিস্টের মত।'

চোখের ওপর দু'হাত চেপে ধরল কিশোর। পুরো দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করছে। খুঁটিনাটি বাদ না দিয়ে।

'মিলারের কাছেও একটা ক্যামেরা ছিল সেদিন, অবিকল রবিনেরটার মত। কিন্তু ছবি তুলছিল না। হাতে রেখে দিয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় লোকটা এল। তাকে বলল মিলার—এনেছি ওটা। এর মানে কি? দ্বিতীয় লোকটার জন্যে কিছু নিয়ে এসেছিল মিলার। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে একটা বেঞ্চের সামনে দাঁড়াল, যেটাতে তখন রবিন বসেছিল। আমাদের চিনতে পারল মিলার। কি রকম ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল মুখ মনে আছে? স্যুভনিরের দোকান থেকে রেগেমেগে বেরিয়ে এলেন রাবুনানা। দেখেই কেটে পড়ল মিলারের সঙ্গে দেখা করতে আসা লোকটা। মিলারকে চেপে ধরলেন রাবুনানা। ধমকাতে শুরু করলেন।

'আবারও ভয় পেয়ে গেল মিলার। ওখানে রাবুনানাকে আশা করেনি, তাহলে নিশ্চয় আসত না। মিলারকে ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন রাবুনানা। বেঞ্চে রাখা ক্যামেরাটা তুলে নিল রবিন। রওনা হলাম আমরা।

'ওই সময় থেকেই শুরু হয়েছে যত গণ্ডগোল। আমাদের পিছু নিল মিলার। মনে আছে, আমাদের গাড়ির পেছন পেছন কি ভাবে দৌড়ে এসেছিল? কিছু বলছিল, আমরা বুঝতে পারিনি?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

রবিন তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে। 'ঠিক! কেন এসেছিল?'

'কারণ, যে ক্যামেরাটা তুমি তুলে নিয়েছিলে, ওটা তোমার ছিল না, রবিন। ওটা মিলারের। রাবুনানাকে তেড়ে আসতে দেখে আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে তাড়াতাড়ি রেখে দিয়েছিল বেঞ্চে।'

'তারমানে তুমি বলছ,' মুসা বলল, 'ক্যামেরার পেছনেই লেগেছে সে? কিন্তু এরও তো কোন মাথামুণ্ড নেই। তার ক্যামেরা সে ফেরত চায়। মোটেলে এসে আমাদের দরজা খটখটালেই তো হত। বলত, তার ক্যামেরা ভুল করে আমরা নিয়ে এসেছি। ফেরত দিয়ে দিতাম। সান্তা রোজাতেই ফেরত নিয়ে যেতে পারত। এত চালাকি, এত পিছু নেয়ার কোন প্রয়োজন পড়ত না।'

'শুধু ক্যামেরা হলে হয়তো তাই করত, কিংবা তা-ও করত না। মনটিরে থেকে সান্তা রোজায় গাড়ি চালিয়ে আসা কম ঝক্কি নয়, সাধারণ একটা ক্যামেরার জন্যে এ-কাজ করবে? তারপরও থামেনি। দীর্ঘ পথ আমাদের পিছে পিছে এসেছে। আমার ধারণা, ক্যামেরা নয়, ভেতরের ফিল্মের জন্যেই এমন করছে। ওটা ওদের কাছে দামী। ওই ফিল্মে কি আছে, সেটা আমাদের

জানতে দিতে চায় না ওরা।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রবিন, 'এইটা হতে পারে। এতক্ষণে বুঝতে পারছি মনটিরে থেকে আসার পর এত তাড়াতাড়ি ফিল্ম ফুরিয়ে গেল কেন ক্যামেরার, কেন ক্যামেরা আর তার ব্যাগটা অন্য রকম লাগল। তখনও পুরোপুরি ধরা তে পারিনি ব্যাপারটা, দুটোই নতুন ক্যামেরা বলে। তবে পরিবর্তন একটা টের পেয়েছি। ক্যামেরা বদল হতে পারে, ভাবলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলতাম।' উঠে গিয়ে ক্যামেরার ব্যাগটা এনে বিছানায় উপুড় করল সে। নয় রোল ফিল্ম পড়ল বিছানায়, তার মধ্যে একটা কেবল নতুন, ব্যবহার করা হয়নি। বাকিগুলো ছবি তুলে শেষ করে ফেলা হয়েছে, ডেভেলপ করতে হবে। 'চলো, ক্যামেরার দোকানে। দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডেভেলপ করে দেয় এমন দোকান নিশ্চয় আছে।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। হোটেল থেকে তিন ব্লক দূরে ছোট একটা মলে পাওয়া গেল ক্যামেরার দোকান। কাউন্টারে বসা মহিলাকে ফিল্মগুলো বের করে দিল রবিন। ডেভেলপ করতে সময় লাগবে। বিভিন্ন দোকানের ডিসপ্লে উইন্ডোতে রাখা জিনিস দেখে সময় কাটাতে লাগল ওরা।

কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল ক্যামেরার দোকানে। শক্ত হলুদ কাগজের বড় একটা খাম ঠেলে দিল মহিলা। উত্তেজনায় প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ওটা নিয়ে পার্কিং লটের দিকে এগোল রবিন। একটা নির্জন জায়গায় এসে খাম থেকে ছবির প্রিন্টগুলো বের করে দেখতে লাগল। দু'পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল মুসা আর কিশোর। বার বার এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে কেউ তাকিয়ে আছে কিনা। মাউন্ট রাশমোরে রাবুনানা, কাস্টার পার্কে বাইসনের পাল, ব্যাডল্যান্ডের নানা রকম পাথরের ছবি। তার মধ্যে একটা বিমানের ছবি, রানওয়েতে ছুটতে ছুটতে ওড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'এটা আমি তুলিনি,' রবিন বলল।

ছবিটা হাতে নিয়ে দেখল মুসা। চেহারাটা বেশ ছিমছাম বিমানটার। বেশি সরু, অনেক লম্বা ছুঁচাল মাথা, পেটের কাছে ডানাদুটো হাঙরের পিঠের পাখনার মত চোখা হয়ে পেছনে বেঁকে গেছে। 'যাত্রীবাহী প্লেন নয়, আর্মির জিনিস।'

বাকি ছবিগুলো ঘাঁটতে লাগল রবিন। আরও কয়েকটা ছবি পাওয়া গেল, যেগুলো সে তোলেনি। তেল শোধনাগার আর ভারী মাল তোলার এলিভেটরের মাঝামাঝি কিছু যন্ত্র দেখা গেল। খুব কাছে থেকে তোলা ড্রয়িং আর নকশার ছবি রয়েছে। বোর্ডে পিন দিয়ে আটকানো আছে জিনিসগুলো। নোটবুকের কিছু লেখা পাতার ছবি আছে। নানা রকম সমীকরণ, নোট, অর্থহীন শব্দমালা লেখা রয়েছে পাতাগুলোতে, যেগুলো পুরোপুরি দুর্বোধ্য ওদের কাছে।

ছবিগুলো দেখা শেষ করল রবিন। ঘেমে গেছে। 'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে বলল সে, 'এ সব জিনিসই তাহলে দ্বিতীয় লোকটাকে দিতে যাচ্ছিল মিলার! মনে তো হচ্ছে আর্মির গোপন কোন ব্যাপার! মিলার একটা স্পাই, দেশের

বাইরের শত্রুর কাছে বিক্রি করে দিচ্ছিল এ সব তথ্য!'

সতেরো

'এফ বি আইকে জানাতে হবে!' চিৎকার করে উঠলেন রাবাত। 'ওরাই শয়তানগুলোর ব্যবস্থা করবে।'

টেলিফোন ডিরেক্টরি টেনে নিয়েছে ততক্ষণে মুসা। দেখে বলল, 'এখানে নেই। এই শহরে এফ বি আইয়ের অফিস নেই।'

'না থাকারই কথা। নিউ ইয়র্কে গিয়ে ওদের জানাতে হবে। চল চল, এখনই রওনা হব। সুটকেস গোছা।'

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। সারারাত গাড়ি চলল একটানা। ভোররাতে আকাশ যখন ধূসর হয়ে আসছে তখন একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকল। সাদা পাথরের দেয়াল। প্রচুর গাড়ি চলাচল করছে। সুড়ঙ্গের অন্য পাশে আসতে চোখে পড়ল আকাশ ছোঁয়া দালান, প্রায় জট বেঁধে থাকা যানবাহনের ভিড়। প্রকাণ্ড পেনসিলভানিয়া স্টেশনের প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে জায়গা দখলের জন্যে গুঁতোগুঁতি শুরু করেছে শত শত ভাড়াটে ট্যাক্সি।

স্টেশনের সামনে রাস্তার অন্য পাড়ে গাড়ি রাখলেন রাবাত। কিশোর নেমে গিয়ে একটা বিল্ডিঙে ঢুকল। টেলিফোন বুক দেখে এফ বি আই-র ঠিকানা জানার জন্যে। গাড়িতে বসে রইল অন্য দুই গোয়েন্দা, কিশোর কি খবর নিয়ে আসে শোনার জন্যে উদ্বিগ্ন।

সাড়ে ন'টার দিকে অফিসটা খুঁজে পেলেন রাবাত। ভেতরে ঢুকে একজন মানুষকে বসে থাকতে দেখা গেল। তার নাম হোগারসন। নিখুঁত একজন মানুষ—সুন্দর করে আঁচড়ানো বালি রঙের চুল, সাদা দাঁত, শান্ত, নরম ব্যবহার, আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মেলাল। মিলার আর তার দোস্তের অপকর্মের কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রাবাত, শেষ দিকে তো রীতিমত খেপে গেলেন। কথা আটকে যেতে শুরু করল।

ধৈর্য হারাল না হোগারসন। তাঁকে শান্ত হওয়ার সুযোগ দিল।

মুসা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করল, 'নানা, প্লীজ, অত রেগে যাওয়ার কিছু নেই! আমরা যা ধারণা করেছি তা না-ও হতে পারে। মিস্টার হোগারসনকে বরং ছবিগুলো দেখাও।'

'নিশ্চয়!' আছাড় দিয়ে ছবির খামটা টেবিলে রাখলেন রাবাত। 'এগুলো ক্যামেরার মধ্যে ছিল। রবিন ভেবেছিল ওটা ওরই ক্যামেরা। ভুল করে ওরটা নিয়ে চলে গেছে স্পাইটা। মিলার বেঈমানটা এগুলো বিক্রি করে দিতে যাচ্ছিল বিদেশী শত্রুর কাছে।'

ছবিগুলো দেখল হোগারসন। চেহারার ভাব একই রকম রইল, বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না।

ব্যাপারটা কেমন যেন লাগল কিশোরের। মনে হলো, রাবাতের কথায় বোধহয় গুরুত্ব দিচ্ছে লোকটা। বলল, 'মিস্টার হোগারসন, আগে আমাদের পরিচয়টা দিয়ে নেয়া দরকার। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বাড়িয়ে দিল।'

কার্ডটা দেখল হোগারসন। প্রশ্ন করার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কিশোর বলল, 'আমি কিশোর পাশা, আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান। ক্যালিফোর্নিয়ার রকি বীচে আমাদের হেড কোয়ার্টার। যে কোন ধরনের রহস্যের ব্যাপারে আমরা আগ্রহী। অনেক ছোটবেলা থেকে গোয়েন্দাগিরি করে এসেছি, শ'খানেকের বেশি রহস্যের সমাধান করেছি। কিছু কিছু তো এতটাই জটিল ছিল, পুলিশও হাল ছেড়ে দিয়েছিল। সুতরাং এ সব ব্যাপ্যারে আমরা একেবারেই আনাড়ী, এ কথা বলতে পারবেন না।'

এই প্রথম রবিনের মনে হলো হোগারসনের নির্বিকার মুখে অতি সামান্য উজ্জ্বলতা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। কার্ডটা টেবিলে রাখল।

মুসা বলল, 'মিস্টার হোগারসনকে সব বলো, কিশোর।'

মনটিরেতে কি করে ক্যামেরা বদল হয়েছে, খুলে বলল কিশোর। 'গণ্ডগোল এখান থেকেই শুরু। তারপর নানা ভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে আমাদের। সারাক্ষণ টেনশনে রেখেছে।'

'এক মুহূর্ত স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি আমাদের!' কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখতে পারলেন না রাবাত।

তাঁকে কথা বলতে দিল না কিশোর। নিজে বলতে লাগল সব। মোটেলের ঘরে আগুন লাগা থেকে শুরু করে, কাস্টার ন্যাশনাল পার্কে পিস্তল হাতে অনুসরণ, মিশিগানে রবিনকে অপহরণের চেষ্টা, কোন কথাই বাদ দিল না।

'মিশিগানের স্টারজিসে ঘটেছে ঘটনাটা,' কিশোর বলল। 'কয়েক দিন আগে। সুপারমার্কেটের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার ডেপুটি শেরিফকে ডেকে এনেছিল। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। শেরিফের অফিসে নিশ্চয় রেকর্ড রাখা হয়েছে।'

চুপ করে আছে হোগারসন। আর কিছু বলে কিনা কিশোর, শোনার অপেক্ষা করল। মাথা ঝাঁকাল তারপর। শুধু বলল, 'হুঁ।'

সব কথা উগড়ে দিতে পেরে, সন্তুষ্ট হয়ে চেয়ারে পিঠ ঠেকাল কিশোর।

রাবাত বললেন, 'ওই ছুঁচো মিলারটা একজন সাংঘাতিক স্পাই। আর তার দোস্তটা নিশ্চয় বিদেশী শত্রুদের চর।'

হোগারসন হাসল। 'কোন দেশ?'

'তাতে কি কিছু এসে যায়?'

'না, তা হয়তো যায় না।'

ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে ছবির খামটা সহ উঠে চলে গেল হোগারসন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে জানাল, তার সহকর্মীরা খোঁজখবর শুরু

করেছে। গোয়েন্দাদের যোগাযোগ রাখতে বলল।

'নিউ ইয়র্কে কোথায় উঠছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল হোগারসন।

ইস্ট সাইডের ছোট একটা হোটেলের নাম বললেন রাবাত, রিয়ারভিউ প্লাজা। লিখে নিল হোগারসন।

হঠাৎ সন্দেহ জাগল রাবাতের, 'আচ্ছা, রুম পাওয়া যাবে তো ওখানে? ভর্তি হয়ে যায়নি তো?'

'কয়েক মিনিট বসলে আমরাই সেটা জেনে দিতে পারি,' হোগারসন বলল।

আবার উঠে চলে গেল সে। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে বলল, রিয়ারভিউ প্লাজায় দুটো রুমের কথা বলে এসেছে। খালি আছে।

'যদি আর কিছুর দরকার পড়ে, কিংবা মিলারের সঙ্গে দেখা হয়, দয়া করে আমাদের জানাবেন,' অনুরোধ করল হোগারসন। তার নাম লেখা কার্ড দিল।

গোয়েন্দারা বুঝল, তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়েছে এফ বি আই। তদন্ত শুরু করেছে। সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল ওরা। সারি দিয়ে লিফটের দিকে এগোল। নেমে এল নিচে। হোটেলে চললেন রাবাত। পুরানো বাড়ি। এক সময় নদীর দিকে মুখ করা ছিল। এখন চারপাশে বড় বড় বিল্ডিং গজিয়ে ঘিরে ফেলেছে বাড়িটাকে। আঙিনায় ঢুকতেই গাড়ির দায়িত্ব নিয়ে নিল হোটেলের একজন অ্যাটেনডেন্ট। চালিয়ে নিয়ে চলে গেল পার্কিং লটে। লটটা কোথায় বোঝা গেল না। আরেকজন অ্যাটেনডেন্ট ওদের সুটকেসগুলো বয়ে নিয়ে চলল ওপরতলায়। ওদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। জানালায় হালকা ঘোলাটে কাঁচ। তার ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে অন্য একটা বাড়ির কাঁচে ঘেরা অফিস দেখতে পেল কিশোর। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। কয়েক সারি কম্পিউটারের সামনে বসে কাজে ব্যস্ত নারী-পুরুষ।

একঘেয়ে দৃশ্য। ভাল লাগল না কিশোরের। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বিছানায় এসে উঠল। চোখ মুদে ভাবতে লাগল, তদন্ত শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে এফ বি আইয়ের? মিলার আর সেই লোকটার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবে? আর কিছু ভাবতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখল, বাড়িতে রয়েছে। স্যালভিজ ইয়ার্ডে। জঞ্জালের ভেতরে লুকানো ট্রেলারে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে ঢুকছে গোপন সুড়ঙ্গপথে। তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে তাকে, কারণ টেলিফোন বাজছে···বেজেই চলেছে···

উত্তেজিত অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘেমে গেছে। টেলিফোন আসলেও বাজছে, তবে হোটেলে তাদের ঘরে রাখা ফোনটা। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল রবিন। ঘুম জড়িত চোখে তাকিয়ে আছে কিশোর। রবিনকে বলতে শুনল, 'হ্যাঁ।···হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়!'

রিসিভার রেখে কিশোরকে বলল, 'লবি থেকে হোগারসন ফোন করেছে। ওপরে আসছে।'

হুড়াহুড়ি করে বিছানা থেকে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। মুসা দৌড় দিল

নানাকে জাগানোর জন্যে। আলুথালু পোশাকে খালিপায়েই ছুটে এলেন রাবাত। ঠিক এই সময় দরজায় টোকা পড়ল।

সঙ্গে করে আরেকজনকে নিয়ে এসেছে হোগারসন। তার চেয়ে লম্বা, বয়েসও কিছু বেশি। পরিচয় করিয়ে দিল, এজেন্ট পিটারম্যান। চেয়ারে বসল দু'জনে। হোগারসন চুপ করে রইল, কথা বলতে লাগল পিটারম্যান

মিলারের সম্পর্কে বেশির ভাগ প্রশ্নেরই জবাব দিলেন রাবাত। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন। সকালের মত উত্তেজিত হলেন না, বলতে গিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেললেন না। জানালেন, মিলারের ব্যাপারে কমই জানেন তিনি, অথচ বেশ কয়েক বছর ধরে লোকটা তাঁর পড়শী, এত কাছাকাছি থাকলে আরও অনেক বেশি জানার কথা ছিল। কোন ধরনের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করে লোকটা, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব নেই—অন্তত রাবাত দেখেননি, অর্কিড জন্মানোর হবি। আর যে লোকটা মনটিরেতে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, রবিনকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল, তার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। বারোটা ছবি দেয়া হয়েছিল হোগারসনকে। সেগুলো বের করল পিটারম্যান। দ্বিতীয় লোকটার ছবি এর মধ্যে আছে কিনা জিজ্ঞেস করল। ছবিটা বের করে দিল রবিন। পুলিশের তোলা সাধারণ ছবি নয়। দামী পোশাক পরা অবস্থায় তোলা হয়েছে। জায়গাটা দেখে মনে হলো বিমান বন্দর অথবা কোন রেল স্টেশনে রয়েছে। গেট দিয়ে বেরোচ্ছে যেন এইমাত্র নামল বিমান কিংবা ট্রেন থেকে।

'এর পরিচয় জানা গেছে?' জানতে চাইল রবিন 'রেকর্ড খারাপ, না ভাল?'

ছবিটা খামে ভরে আবার পকেটে রেখে দিল পিটারম্যান। 'আগেও এর সঙ্গে গণ্ডগোল হয়েছে আমাদের। নাম একটা জানি, তবে সম্ভবত এটাও অনেকগুলো ছদ্মনামের একটা। ব্যালার্ড।'

সঙ্গে করে আনা একটা অ্যাটাশে কেস খুলল হোগারসন কয়েক রোল ফিল্ম বের করল। দেখে মনে হলো, ব্যবহার করা হয়ে গেছে ওগুলো ডেভেলপের অপেক্ষায় আছে। রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'রবিন, একটা সাহায্য করবে? তোমার ক্যামেরার কেসে ভরে রাখো এগুলো অনেক উপকার হবে আমাদের। কেসটা চুরি যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না যায় যাক। নষ্ট ফিল্ম এর ভেতরে।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাবাত, প্রবল আপত্তি জানালেন, 'না না, এটা করা উচিত হবে না! ছেলেটাকে ফাঁদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন। বিপদে পড়তে পারে ও। ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে ওর বাবা-মা। আমি ওর ক্ষতি হতে দিতে পারি না।'

হাসল হোগারসন। 'মিস্টার রাবাত, ভুল করছেন, ওকে টোপ আমরা বানাচ্ছি না। টোপ সে হয়েই আছে। তাকে বরং বাঁচানোর চেষ্টা করছি মিলার আর তার সঙ্গী আপনাদের খুঁজে বের করবেই। ফিল্মটা ওদের চাই রবিনকে আবার ধরবে ওরা। তখন যদি সে ফিল্ম দিতে না পারে, কি ঘটবে

বুঝতে পারছেন?'

বজ্রাহত মনে হলো রাবাতকে। বসে পড়লেন আবার। 'তারমানে কিছু একটা গছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে সে। আপনারা তার ওপর নজর রাখবেন। তাকে অনুসরণ করবেন। যেই ওকে ধরবে, আপনারা ওদের আটকাবেন।'

স্বীকারও করল না দুই এজেন্ট, অস্বীকারও করল না। কেবল রাবাতকে অনুরোধ করল, তাঁরা নিউ ইয়র্ক কিংবা হোটেল ছেড়ে যাওয়ার আগে যেন ওদেরকে একটা খবর দিয়ে যান। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

দরজা বন্ধ করেও সারতে পারল না মুসা, চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দারুণ হয়েছে! কাউন্টারস্পাই হিসেবে কাজ করার সম্মান দেয়া হলো আমাকে! এতদিন আমরা ছিলাম শিকার, এখন হলাম শিকারী। ডাকাতগুলো লেগে ছিল আমাদের পেছনে, আমরা লাগব এবার ডাকাতের পিছে।'

'ডাকাত নয়, স্পাই,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'ওই হলো। স্পাইরাও আমার মতে একধরনের ডাকাত।'

'অত খুশি হয়ো না!' গম্ভীর হয়ে বললেন রাবাত। 'তোমাকে ওরা টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে!' শান্ত থাকার চেষ্টা করছেন তিনি, পারছেন না। কল্পনাও করতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত এফ বি আইয়ের হয়ে কাজ করতে হবে। পড়শীকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাততে হবে সুদূর নিউ ইয়র্কে এসে!

আঠারো

'আর কত!' ভোঁতা স্বরে বলল রবিন। 'চার চারটে দিন পেরিয়ে গেল, ওদের ছায়াটির দেখাও নেই!'

'দোষটা আমাদেরই,' মুসা বলল, 'আমরাই তো খসানোর চেষ্টা করেছি। এখন পাওয়া যাবে কেন?'

চুপ করে আছে কিশোর। আমেরিকান মিউজিয়াম অভ নেচারাল হিস্টরির সামনে একটা পাথরের বেঞ্চে বসে তাকিয়ে আছে চত্বরে দানা খুঁটে বেড়ানো কবুতরের ঝাঁকের দিকে। রাবাতের দিকেও লক্ষ রেখেছে।

শব্দ করে পাশের রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। বিরক্ত চোখে ওগুলো দেখছেন বৃদ্ধ। রাগ হচ্ছে ভীষণ। গত চারদিনে একটি বারের জন্যে যেতে পারেননি—আবিষ্কার নিয়ে যেখানে যাওয়ার কথা, এত কাঠখড় পুড়িয়ে যাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তিনি। কারও সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করতে পারেননি সারাক্ষণ কেবল একই চিন্তা, একই কাজ—মিলার আর তার দোস্তকে আড়াল থেকে টেনে বের করে আনা হোটেল থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল, সতর্ক হয়ে ওঠে তাঁর চোখের তারা। উত্তেজিত হয়ে যান। রবিনের কাছ ঘেঁষে থাকেন, সরেন না মুহূর্তের জন্যেও।

জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পটগুলোতে তাঁদের খোঁজা হতে পারে অনুমান করে

ওসব জায়গাতেই এসে বসে থাকেন। নিউ ইয়র্ক সিটির দর্শনীয় স্থানগুলোতে ঘোরাফেরা করেন। সারাক্ষণ ক্যামেরার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখে রবিন। যেখানে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ফিল্মের রোলগুলো বের করে দেখে। কেউ যদি চোখ রাখে, যাতে মনে করে ওগুলো ডেভেলপ করার অপেক্ষায় আছে।

প্রথম দিন জাহাজে করে ম্যানহাটান আইল্যান্ড ঘুরে এসেছে ওরা। সন্ধ্যায় ডিনার খেয়েছে একটা হোটেলের খোলা ছাতের ওপরের রেস্টুরেন্টে। একধারে ওখানে ক্রেতাদের মনোরঞ্জনের জন্যে পিয়ানো বাজায় বাদকদল। নিচে নিউ ইয়র্ক শহরের আলোকমালা, যেন আলোর এক বিশাল সমুদ্রের মত ছড়ানো। যেদিকে তাকানো যায় শুধু আলো আর আলো। শব্দেরও কমতি নেই। প্রাণবন্ত শহরের অবিরাম গুঞ্জন, চলছেই, চলছেই।

পরদিন খুব সকালে উঠল ওরা। ব্রুকলিন থেকে মাটির নিচের পথ দিয়ে গেল কনি আইল্যান্ডে। সেখানে আরও অনেক ট্যুরিস্টের সঙ্গে বিখ্যাত অ্যাকোয়ারিয়াম দেখল। পটেটো নিশ খেলো ওরা ওখানে। ঠোঁট চাটতে চাটতে কিশোর বলল, 'মেরিচাচীকে গিয়ে বলতে হবে এ কথা। সে তো মনে করে সারা দুনিয়ায় সবচেয়ে ভাল নিশ সে-ই কেবল বানায়। এখানকারটা খেলে বুঝতে পারত কি জিনিস।'

ধীরে ধীরে স্ট্যাচু অভ লিবার্টির দিকে এগিয়ে গেল ওরা। দিন শেষে খাওয়া সারতে গেল ওঅর্ল্ড ট্রেড সেন্টারে। এত উঁচুতে বসেছে, ছোট আকারের প্লেনগুলো উড়ছে ওদের নিচ দিয়ে। গোগ্রাসে গিলছে মুসা। চারপাশে তাকাচ্ছে। যেন বুঝতে পারছে না কোনদিকে আগে তাকাবে।

তৃতীয় দিনও ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাতে লাগল ওরা। ঐতিহাসিক গ্রীনউইচ ভিলেজ দেখতে চলে গেল। দুপুরের খাওয়া খেলো চায়নাটাউনে।

লাঞ্চের পর তাঁর ফরচুন কুকিতে পাওয়া কাগজের টুকরোটা খুলে পড়লেন রাবাত। তাঁর ভাগ্যলিপিতে বলা হয়েছে:

আজ রাতে প্রেমে সার্থক হবে তুমি।

তিন গোয়েন্দা তো হেসেই বাঁচে না। হাসতে লাগলেন রাবাতও। এমন উদ্ভট কথায় কে না হাসে? তারপর গেল ওরা রকেটির রেডিও সিটি মিউজিক হল দেখতে। ডিনার খেলো লিনডিতে। নিউ ইয়র্কের অসামান্য স্বাদের পনির-কেক খেলো। রাতে হোটেলে ফিরে এতটাই ক্লান্ত বোধ করল, বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুম।

চতুর্থ দিন সকালে গেল মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অভ আর্টে, তারপর এসেছে সেন্ট্রাল পার্কে। বেঞ্চে বসেছে রোদের মধ্যে। ঠেলাগাড়িতে করে খাবার বিক্রি করছিল ফেরিওয়ালা। একজনকে ডেকে বিশেষ ধরনের রুটির ভেতরে ভেড়ার মাংস কেটে কেটে দিয়ে তৈরি করা স্যুভলাকি স্যান্ডউইচ কিনে খেয়েছে।

এখন ওরা রয়েছে পার্কের আরেক প্রান্তে। মিউজিয়াম অভ ন্যাচারাল হিস্টরির সামনে।

এতসব ঘোরাঘুরির সময়, প্রায়ই বাদামী রঙের সোয়েটার আর ধূসর স্ল্যাকস পরা একজন তরুণকে আশেপাশে দেখেছে। আরও একজনকে দেখেছে নেভি ব্লেজার পরা, খোঁচাখোঁচা দাড়িওয়ালা, রুক্ষ চেহারার মাঝবয়েসী লোক। কখনও দু'জনে একসঙ্গে থাকে, কখনও একজন এদিক থাকলে আরেকজন ওদিক।

'এফ বি আইয়ের লোক,' রবিন বলল। 'ওরা কাছাকাছি থাকলে সাহস পাই।'

'কিন্তু এরা কতটা কি করতে পারবে বুঝতে পারছি না,' মুসার গলায় সন্দেহ। 'যাদের ধরতে এসেছে, বিশেষ করে মিলারের দোস্তটা একটা ইন্টারন্যাশনাল স্পাই। গোলাগুলি চলতে পারে।'

'এ সব আলোচনা বাদ দে,' নিষেধ করলেন রাবাত। 'যখন চলে, দেখা যাবে। সামলানোর ক্ষমতা না থাকলে এদের পাঠাত না অফিস।'

নানার মেজাজ খারাপ, আন্দাজ করতে পারল মুসা। অতিরিক্ত ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সকালে বিছানা থেকে উঠতেই কষ্ট হয়েছে। মুসা অবশ্য আসতে মানা করেছিল। বলেছে, 'নানা, শুয়েই থাকো। নাস্তার জন্যে খবর পাঠাচ্ছি। ঘরেই থাকি আজ। মিলারের কথা ভুলে যাই বরং। সে আর আমাদের খুঁজে পাবে না।'

'পাবে!' প্রায় ধমকে উঠেছেন রাবাত। 'ওকে ধরার এই সুযোগ কোন কিছুর বিনিময়েই ছাড়তে রাজি নই আমি!'

মিলারের প্রতি রাবাতের রাগ দেখে মুচকি হেসেছে কিশোর।

'আজ কিছু ঘটবেই,' রাবাত বলেছেন। 'মন বলছে আমার।'

সুতরাং সেই 'মন বলার' কারণেই এখন পার্কে বসে আছে ওরা। বিকেল হয়ে গেছে। কিছুই ঘটেনি এখনও। বাদামী সোয়েটার পরা লোকটা নেই আশেপাশে। নীল ব্লেজার পরা লোকটা আছে। এককোণে দাঁড়িয়ে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আইসক্রীম কিনে খাচ্ছে। চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তি।

'আমাদের আসলে চোখে পড়ছে না ওদের,' মুসা বলল। 'এতবড় শহরে কোথায় খুঁজবে মিলার? এমন কিছু করা উচিত আমাদের, যাতে সবার নজরে পড়ে যাই—এই যেমন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিঙের দেয়াল বেয়ে ছাতে ওঠার চেষ্টা, কিংবা হাডসন নদীতে সাঁতার কাটা। টেলিভিশনে দেখানো হবে আমাদের। মিলার তখন জানতে পারবে আমরা কোথায় আছি।'

ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকালেন রাবাত। 'তোর মায়ের মাথায় গোবর বলেই তোর এই অবস্থা!'

ফোড়ন কাটতে ছাড়ল না মুসাও, 'মগজ থাকার কি খেসারত যে দিতে হচ্ছে, সে-ও দেখতেই পাচ্ছি!'

ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল কিশোরের মুখে। 'টেলিভিশন!'

এইবার ভুরু কোঁচকানোর পালা মুসার। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'খাইছে! সত্যি সত্যি আবার নদীতে ঝাঁপ দিতে বলবে না তো? আমি রসিকতা করছিলাম।'

'টেলিভিশনে যেতে হলে নদীতে ঝাঁপ দেয়া কিংবা বিল্ডিঙে চড়া লাগে না,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'কোনো কুইজ শোতে যেতে পারি। কিংবা নামী মুখদের অনুষ্ঠানেও যোগ দেয়া যেতে পারে।'

'হোটেল উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে যোগ দিলে কেমন হয়?' রবিন বলল, 'পত্রিকায় পড়েছি, একটা নতুন হোটেল খোলা হচ্ছে নিউ ইয়র্কে। নাম রাখা হচ্ছে নিউ উইন্ডসর। লোকের আগ্রহ আছে ওটার ওপর, কারণ, বছর দুই আগে পুড়ে যাওয়া আরেকটা হোটেলের জায়গায় তৈরি হচ্ছে ওটা। অনেক বড় পার্টি দেবে। গভর্নরও আসতে পারেন।'

'কবে খুলছে?'

'কাল রাতে। গভর্নর এলে টিভির লোকেরা আসবেই ক্যামেরা নিয়ে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমাদের দাওয়াত পাওয়ারও ব্যবস্থা করে দিতে পারবে এফ বি আই। হোটেলটাতে ঘর নেয়া গেলে আরও সুবিধে। মিলার আর ব্যালার্ড জেনে যাবে কোথায় আছি আমরা।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। সোজা রওনা দিল নীল ব্লেজার পরা লোকটার দিকে। কাছে এসে বলল, 'কাল রাতে নিউ উইন্ডসরের উদ্বোধনী পার্টিতে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া কি এফ বি আইয়ের পক্ষে সম্ভব?'

এত চমকে গেল লোকটা, হাত থেকে আইসক্রীম পড়ে গেল। ভাবতেই পারেনি তাকে চিনে ফেলবে একটা ছেলে।

'টিভির নিউজ সেকশনের লোক নিশ্চয় আসবে,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। আইসক্রীম পড়ে যাওয়াটাকে পাত্তাই দিল না। লোকটার জুতোর ওপর পড়ে গলছে ওটা। 'হোটেলটা খোলার ব্যাপারে বাইরের লোকের মতামতও নিশ্চয় নেয়া হবে। প্রতিবেদক যদি আমাদের একজনকে প্রশ্ন করে, তাহলে বলতে পারি আমরাও ওই হোটেলে উঠেছি। ভাল লাগছে। হ্যারিস মিলার তখন জেনে যাবে আমরা কোথায় আছি। সারা নিউ ইয়র্কে আমাদের পেছনে ঘুরে বেড়ানোর ঝামেলা থেকে বাঁচবেন আপনিও।'

সামলে নিয়েছে ততক্ষণে লোকটা। লম্বা দম নিল। বলতে চাইল, কিশোর কি বলছে সে বুঝতে পারছে না। তারপর ভাবল বোধহয়, অহেতুক এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এই ছেলেকে বোকা বানাতে পারবে না। আরেকবার দম নিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, দেখি কি করা যায়। জানাব।'

রাস্তার দিকে চলে গেল সে।

বন্ধুদের কাছে ফিরে এল কিশোর। 'জানাবে বলে গেল।'

'কিন্তু আমাদের যে এখানে একা ফেলে গেল,' রাবাত বললেন।

'নানা,' মরিয়া হয়ে বলল মুসা, 'অমন অসহায়ের মত ভঙ্গি কোরো না তো! তোমাকে অসহায় বলা, আর ভয়ানক শারম্যান ট্যাংককে খেলনা বলা একই কথা। তোমার সঙ্গে লাগতে এলে বরং মিলারই অসহায় হয়ে যাবে।'

মুসার কথায় হাসি ফুটল রাবাতের মুখে। মেজাজ অনেকটা ঠিক হয়ে এল। ট্যাক্সি নিয়ে রিভারভিউ প্লাজায় যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায়ই ফোন বাজল। রাবাত ধরলেন। হোগারসন করেছে। জানাল, নিউ উইন্ডসরে ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আগামী কাল যেন চলে যান।

'গাঢ় রঙের স্যুট কিংবা ব্লেজার আছে আপনাদের?' জানতে চাইল হোগারসন। 'টেলিভিশনে চেহারা যদি দেখাতেই হয়, লোকে যাতে বোঝে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যেই বহুদূর থেকে ছুটে এসেছেন আপনারা। তৈরি হয়ে এসেছেন।'

'কিন্তু নেই তো!' কিছুটা নিরাশ মনে হলো রাবাতকে।

'থাক, চিন্তা করবেন না। জোগাড় করে দেয়া যাবে।'

উনিশ

পুরোপুরি শেষ হয়নি হোটেল বাড়িটার কাজ। বিশাল গুহার মত দেখতে লবিটার বাতাসে রঙ আর অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের কড়া গন্ধ। লিফটের কাছে একজন রুম সার্ভিস ওয়েইটারের সঙ্গে দেখা। রবিনের অনুরোধে তাকে একটা ছাপানো নকশা দিল সে, তাতে হোটেলের কোন্ ফ্লোরে কি আছে দেখানো আছে। ওদের ঘরগুলো রয়েছে তেত্রিশ নম্বর ফ্লোরে। রিয়ারভিউর ঘরের চেয়ে ছোট। তবে ওটা যেমন চারদিক থেকে বদ্ধ, এটা তেমন নয়, রাবাতের ঘর থেকে ঈস্ট রিভার চোখে পড়ে।

পাঁচটার সময় হোটেলে এসেছে ওরা। লবিতে যন্ত্রপাতি বসিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে টিভির লোকেরা। ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে যখন এফ বি আইয়ের দেয়া গাঢ় নীল রঙের ব্লেজার পরে নামল আবার, আলোয় ঝলমল করছে তখন লবিটা। মেসেজ ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে আছে হোগারসন। ওদের প্রায় টেনে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল একজন প্রতিবেদকের সঙ্গে।

লম্বা, সুদর্শন একজন লোক। ঝকঝকে সাদা দাঁত। সুন্দর করে আঁচড়ানো চুল। রাবাতের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় তাঁর বাঁ কানের পাশ দিয়ে পেছনে তাকাল। তারপর তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে গেল একজন মহিলাকে স্বাগত জানানোর জন্যে। রিভলভিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে মহিলা। গায়ের জ্যাকেটে প্রচুর ঝলমলে পুঁতি আর আয়নার টুকরো বসানো।

টিভি ক্যামেরার লাল আলো জ্বলে উঠল। একধারে দাঁড়ানো কানে হেডফোন পরা একজন ইঙ্গিত করল একজন ঘোষককে। ক্যামেরার সামনে এসে ঘোষক বলতে লাগল, সে নিউ উইন্ডসরের লবিতে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে যিনি রয়েছেন তাঁর নাম মনিকা কনসর, হোটেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সেই রোম থেকে উড়ে এসেছেন।

মিসেস কনসর ভি আই পি, সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর আর কোন পরিচয় দিল না ঘোষক। তিন গোয়েন্দা ভাবল, এখানে উপস্থিত অতিথিরা নিশ্চয়

মহিলার পরিচয় জানে, কেবল ওরা তিনজন আর মিস্টার রাবাতই জানেন না। হাসিতে ঠোঁট এত ছড়িয়ে ফেললেন মহিলা, মুসার ভয় হতে লাগল ছিঁড়ে না যায়। অল্প দু'চারটা কথা বলেই সরে গেলেন।

আচমকা রাবাত আর তিন গোয়েন্দার দিকে নজর দিল ঘোষক। হাত তুলে স্বাগত জানানোর ভঙ্গি করল। মুহূর্তে ওদের দিকে ঘুরে গেল ক্যামেরার চোখ।

'আর ইনি হলেন মিস্টার আরমান রাবাত,' চেঁচিয়ে উঠল ঘোষক, যেন হঠাৎ করে তাঁকে চোখে পড়ে যাওয়ায় অবাক হয়েছে। 'অত্যন্ত সম্মানিত একজন মেহমান। বহুদূরের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছেন শুধু এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে।'

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে চওড়া হাসি হাসলেন রাবাত। ঘোষকের হাত চেপে ধরলেন। সহজে আর ছাড়তে চাইলেন না। ঘোষক বলল—পুরানো ওয়েস্টমোর হোটেলেটা যখন এখানে ছিল, তখন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এলে ওটাতে ছাড়া আর কোথাও উঠতেন না। তাঁর স্ত্রী এখন পরপারে; ঈশ্বর তাঁর বিদেহী আত্মার মঙ্গল করুন।

তাড়াতাড়ি বলতে গেলেন রাবাত, 'আমি আর আমার স্ত্রী হানিমুন করেছি...'

কথা শেষ করতে দিল না ঘোষক, মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে দিল, 'অবশ্যই ওয়েস্টমোর হোটেলে।' হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে। পারল না।

গমগমে কণ্ঠে রাবাত বললেন, 'প্রায়ই আসতাম আমরা। ওয়েস্টচেস্টার পুড়ে যাওয়ার খবর শুনে তো রীতিমত মুষড়ে পড়েছিলাম। তবে আর চিন্তা নেই। ওটার চেয়ে ভাল হোটেল নিউ উইন্ডসর এখানে দাঁড়িয়ে গেছে। এখনও কাঁচা কাঁচা গন্ধ আছে বটে, তবে কেটে যাবে। খুব শীঘ্রি কেটে যাবে, ঠিকমত চালু হলেই। এই ছেলেগুলোকে নিয়ে এসেছি এবার, নিউ ইয়র্ক দেখাতে। এদের একজন আমার নাতি, অন্য দু'জন তার বন্ধু...' ক্যামেরার চোখ ঘুরে গেল কিশোর, মুসা আর রবিনের হাসি হাসি মুখের দিকে। 'পুরো হপ্তাটাই এখানে কাটিয়ে যেতে চাই আমরা। খুব উপভোগ করছে ওরা। ইতিমধ্যেই রোলার কোস্টারে করে কনি আইল্যান্ড ঘুরিয়ে এনেছি ওদের।'

এই সময় হাতের চাপ সামান্য শিথিল হতেই তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিল ঘোষক। তার পেশাদারী হাসিটা বিন্দুমাত্র মলিন না করে দ্রুত পিছিয়ে গেল। রাবাত আর তিন গোয়েন্দাকে ধন্যবাদ দিল। ব্যস, কাজ শেষ।

ঘোষকের মতই তাড়াহুড়ো করে ওখান থেকে সরে এলেন রাবাত। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ছেলেদের দিকে তাকালেন, 'কি বলেছি আমি, বলো তো? ঠিকঠাক মত বলেছি তো সব?'

হেসে মুসা বলল, 'দারুণ বলেছ তুমি, নানা। একটা ভুলই কেবল করেছ, ওয়েস্টমোরের জায়গায় ওয়েস্টচেস্টার বলে ফেলেছ।'

'তাই নাকি?' মোটেও চিন্তিত মনে হলো না রাবাতকে। একই কথা

মিথ্যে যে এতগুলো বলতে পেরেছি, এই বেশি। নিউ উইন্ডসরে যে থাকব, এটা ঠিকমত বলেছি তো?'

'তা বলেছ।'

'তবে আর চিন্তা নেই ওই ছুঁচো মিলারটাকে জানিয়ে দেয়া হলো, কোথায় আমাদের পাওয়া যাবে।'

ওখানে থাকার আর কোন দরকার নেই। ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন রাবাত। সিটিক্রপ বিল্ডিঙের একটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে চললেন ওদের।

রিসিপশনের কাছে দাঁড়িয়ে ওদের বেরোতে দেখল হোগারসন বাধা দিল না

ভাবতে ভাবতে চলেছে তিন গোয়েন্দা, কাজ যা করার তো করা হলো। মিলার আসতে কত সময় নেবে?

বিশ

পরদিন সকালে নাস্তা প্রায় শেষ করে ফেলেছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় হোটেলের কফি শপে ঢুকলেন রাবাত। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন, রাত জেগে টেলিভিশনে নিজের ইন্টারভিউ দেখেছেন। লেট নাইট নিউজ দেখেছেন, লেট-লেট নাইট নিউজ দেখেছেন। মুসার পাশে হাসিমুখে বসতে বসতে জানালেন সকালের খবরেও তাঁর ইন্টারভিউ দেখানো হয়েছে।

কফি শপে হোটেলের আরও অনেক মেহমান নাস্তা খাচ্ছে। ওদের দিকে তাকিয়ে এমন ভঙ্গিতে হাসলেন, যেন সাংঘাতিক কেউকেটা কিছু হয়ে গেছেন এখনই সবাই অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে সই নিতে ছুটে আসবে খাতা না আনলেও মেনু হাতে এগিয়ে এল ওয়েইটার তাঁর মুখের দিকে তাকালও তবে চিনতে পারার কোন লক্ষণ নেই তার চোখে।

রেগে গেলেন মনে হলো রাবাত। জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলেন, 'কফি প্যানকেক। দুটো ডিম। আর গরুর মাংস ভাজা।'

চমকে গেল মুসা 'নানা, তোমার না ডিম আর গরু খাওয়া বারণ! কোলেস্টেরল...'

'চুলোয় যাক কোলেস্টেরল!' ধমকে উঠলেন রাবাত। 'ময়লা জমলে আমার শিরায় জমবে, তোর মাথাব্যথা কেন? আজ সারাদিনে অনেক ঘটনা ঘটবে, এনার্জি দরকার হবে আমার। সুতরাং সেটা এখনই জোগাড় করে নিতে হবে'

কিন্তু খাওয়ার পর ঘটনা আর ঘটে না। এনার্জি খরচেরও প্রয়োজন পড়ছে না রাবাতের হোটেলের লবিতে বসে থাকার ব্যবস্থা করেছে তিন গোয়েন্দা। বার বার অহেতুক ক্যামেরা আর ক্যামেরার ব্যাগে হাত বোলাচ্ছে রবিন এক

বি আইয়ের দু'জনেই উপস্থিত। নীল ব্লেজার পরা লোকটা ঢুকেছে গিফট শপে, জিনিস দেখার ভান করছে। নিউজ কাউন্টারে ম্যাগাজিন ওল্টাচ্ছে বাদামী সোয়েটার।

'আসছ না কেন, মিলার?' বিড়বিড় করলেন রাবাত। 'আমরা তো তোমার অপেক্ষায়ই আছি।'

কিন্তু তা-ও কিছু ঘটল না আধঘণ্টা গেল। এক ঘণ্টা। ঘড়ির কাঁটা চলছে।

বেলা এগারোটায় মেজাজ গরম হতে আরম্ভ করল তাঁর। সাড়ে এগারোটায় ফুটতে শুরু করল।

'আশ্চর্য!' বললেন তিনি। 'সেই কখন থেকে বসে আছি, মনে হচ্ছে বছর পেরিয়ে গেছে। গাধাটা সাক্ষাৎকার দেখেনি নাকি? ছাগল কোথাকার! খবরও দেখে না।' ধূর্ত হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আজ বিকেলে ইয়াংকি স্টেডিয়ামে একটা ডাবল গেম আছে। দেখতে যাবি নাকি, মুসা?'

'যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না,' মুসা বলল। 'মিলার আর তার দোস্ত সাক্ষাৎকারটা দেখেছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। দেখলে এখানে খুঁজতে আসবেই। তখন আমরা না থাকলে এতদিনের কষ্ট অহেতুক যাবে।'

'বাইরে থেকে একটু ঘুরে এলেও পারি,' রাবাত বললেন। 'এখানে বসে থেকে ভুল করছি আমরা। হয়তো ঢোকার সাহসই পাচ্ছে না। বাইরে গিয়ে ওদের সুযোগ করে দেয়া উচিত।'

'আমার মনে হয় না,' কিশোর বলল, 'আমরা বাইরে বেরোলেও ওদের হারাতে হবে। এসে আমাদের না পেলে অপেক্ষা করবে ওরা কিংবা আবার আসবে এতদূর আমাদের পিছু ধাওয়া করে আসতে পেরেছে ওই ফিল্মের জন্যে। এত সহজে হাল ছাড়বে না।'

সুতরাং বসে না থেকে বাইরে ঘুরে আসারই সিদ্ধান্ত হলো। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে মেসেজ ডেস্কে এসে দাঁড়ালেন রাবাত। ইয়াংকি স্টেডিয়ামে যেতে হলে কোন্ ট্রেন ধরতে হবে, এবং সেটা মাটির নিচ দিয়ে যায় কিনা, জিজ্ঞেস করলেন।

দুপুর বেলা সদলবলে হোটেল থেকে বেরোলেন রাবাত। হোটেলের দুই ব্লক দূরেই একটা আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন। আধ ব্লক পেছনে লেগে রইল দুই এফ বি আই। প্ল্যাটফর্মে নেমে প্রথম ট্রেনটা ইচ্ছে করে মিস করল গোয়েন্দারা, ওই দু'জনকে আসার সময় দিল, ওরা এখনও এসে পৌঁছায়নি। পরের ট্রেনটায় চড়ল সবাই। এফ বি আইরা রইল কামরার এক প্রান্তে, গোয়েন্দারা আরেক প্রান্তে। ব্রংক্স বল পার্কের দিকে চলল ট্রেন। চতুর্দিকে কড়া নজর রাখলেন রাবাত। মিলাররা পিছু নিয়েছে কিনা দেখছেন।

স্টেডিয়ামে এসে ভান করলেন যেন তাঁরা নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। তাতে খেলা দেখার সুবিধে আছে। খেলা দেখতে বসলে কোনও এক পক্ষকে সমর্থন করতে হয় সেই পক্ষের দর্শকদের মধ্যে বসা ভাল। এবং সেটাই করলেন তিনি ইয়াংকিদের মধ্যে বসলেন। প্রথম গেমে এক রান এগিয়ে রইল

ইয়াংকিরা। সুতরাং প্রচুর চেঁচাতে পারলেন তিনি। আশেপাশে ইয়াংকি সমর্থক থাকায় চেঁচাতে কোন অসুবিধে হলো না।

বিরতির সময় হট ডগ খাওয়া হলো। নাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেন তিনি। দু'জনের কেউই জিততে পারলেন না। রবিন আর কিশোরও প্রচুর খেল, তবে নানা-নাতির ধারেকাছেও যেতে পারল না।

শুরু হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা। শুরুতেই ইয়াংকিদের হারিয়ে দিল বহিরাগত টীম। নিজের আর বাইরের দল, দুটোকেই গালাগাল শুরু করল ইয়াংকি সমর্থকরা। সিটি বাজিয়ে, নানা রকম কটু কথা বলে উত্তেজিত করে জেতানোর চেষ্টা করতে লাগল। খেলার উত্তেজনায় কখন যে তাদের দলে মিশে গেলেন রাবাত আর তিন গোয়েন্দা, খেয়ালই রইল না। শেষ পর্যন্ত যখন ব্রংক্স বম্বাররা হেরে গেল, শির উঁচু করে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বেরোনোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন রাবাত। ঘাড় কাত করে মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি, বলেছিলাম না ইয়াংকিরা জিতবে?'

প্রচুর দর্শক হয়েছে। বেরোনোর গেটে ভিড়। ঠেলাঠেলি করে বেরোতে হচ্ছে। কনুইয়ের গুঁতো মেরে ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোলেন রাবাত। স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে রেল স্টেশনে চলে এলেন। জনতার কোলাহল বিরক্তিকর, তবু বিকেলটা ভাল লাগল তাঁর। সুন্দর বাতাস বইছে।

ম্যানহাটানের ট্রেন এসে দাঁড়াল। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ট্রেনে উঠলেন রাবাত। যে কামরাটায় উঠলেন, তাতে বেজবল খেলার বেশ কিছু ভক্তও উঠেছে। দরজা বন্ধ হলো। চলতে শুরু করল ট্রেন। মুসার চোখে পড়ল বাদামী সোয়েটার পরা এফ বি আইকে, প্ল্যাটফর্মে জনতার ভিড়ে আটকা পড়েছে সে, পাগলের মত তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, ওদেরকে খুঁজছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিল মুসা। দেখতে পেল লোকটা। গতি বেড়ে গেছে ট্রেনের। বাদামী সোয়েটারকে ফেলে রেখেই প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে চলে এল।

মুসার দু'পাশে চেপে আছে দু'জন ভক্ত। একজন হোঁৎকা বিশালদেহী লোক, গায়ে স্পোর্টস কোট; আরেকজন মুসার চেয়ে দু-এক বছরের বড় হবে, কোন কিছু না ধরেই দাঁড়িয়ে আছে, একনাগাড়ে পিনাট খেয়ে চলেছে। শরীর মোড়ামুড়ি করে কোনমতে দু'জনের মাঝখান থেকে বেরিয়ে কিশোরের কাছে চলে এল মুসা। একটা ধাতব হ্যান্ড-স্ট্র্যাপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর

'বডিগার্ডকে খুইয়েছি,' তাকে বলল মুসা। 'বাদামী সোয়েটার পরা লোকটাকে প্ল্যাটফর্মে দেখলাম, উঠতে পারেনি।'

'বডিগার্ড?' হেসে উঠল হাড্ডি সর্বস্ব একটা মেয়ে বয়েস ষোলো-সতেরো হবে। মাথায় বেগুনী রঙের কাপড় অনেকটা পাগড়ির মত করে পেঁচিয়েছে। সেঁটে আছে প্রায় কিশোরের গায়ের সঙ্গে অকারণ কথা বলে বলে তার কান পচিয়ে ফেলার জোগাড় করেছে গায়ে মাংস না থাকলে কি হবে, গলাটা যেন মাইক। এমন করে ফাটা বাঁশে বাড়ি মারছে, কিশোরের ভয় হতে লাগল, কামরার সব লোকেই শুনে ফেলবে 'কিসের বডিগার্ড? ভি আই

পি নাকি তোমরা! বাব্বাহ্, বডিগার্ডও থাকে সঙ্গে! পরের বার প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে দাঁড়াবে নাকি!'

খুব সাংঘাতিক কোন রসিকতা করে ফেলেছে যেন মেয়েটা, এমন ভঙ্গিতে নিজের কথায় নিজেই পুলকিত হলো। তার কথায় মজা পেল আরও কয়েকজন যাত্রী। মুসার দিকে তাকাল।

দুষ্টবুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে উঠল কিশোরের চোখে। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেবো না। ওকে আর দরকার হবে না। ইনকিউবেশন পিরিয়ড কালই শেষ হয়ে গেছে তোমার।'

শক্ত হয়ে গেল মেয়েটা। সতর্ক হয়ে উঠল। 'ইনকিউবেশন!' কেঁপে উঠল ফাঁটা বাঁশ। 'কিসের ইনকিউবেশন? ছোঁয়াচে রোগে ধরেছিল নাকি?'

'না না,' মাথা নাড়ল মুসা, 'কিসের রোগ! ও এমনি এমনি বলছে! মিথ্যে বলা ওর স্বভাব!'

মুসার বলার ভঙ্গিতে সন্দেহ আরও বাড়ল মেয়েটার। কিশোরের কাছ থেকে সরার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মুসার কাছে থাকাটাও বিপজ্জনক। কোন্ রোগ, কে জানে! চিকেন পক্সও হতে পারে! তাড়াতাড়ি সরে যেতে লাগল সে। কামরার একেবারে আরেক ধারে চলে গেল। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই নেমে গেল। পক্সের ভয়ে তার সঙ্গে নামল আরও কয়েকজন।

ম্যানহাটানে পৌঁছার আগেই আরও অনেকে নেমে গেল। ভিড় আর আগের মত নেই। কামরার মাঝখানে প্রচুর জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়েছে রাবাত আর তিন গোয়েন্দাকে। তাদের কাছাকাছি আসতে ভয় পাচ্ছে লোকে।

রাবাতকে বলল কিশোর, 'এফ বি আইয়ের লোকটা ট্রেনে উঠতে পারেনি। প্ল্যাটফর্মে তাকে থেকে যেতে দেখেছে মুসা।'

'তাতে আর অসুবিধে কি?' রাবাত বললেন। 'এখানে মিলারও নেই, তার দোস্তও নেই।'

তা ঠিক। যাত্রীদের ওপর আরেকবার চোখ বোলাল তিন গোয়েন্দা। মিলার কিংবা ব্যালার্ডের সঙ্গে কারও সামান্যতম মিলও নেই।

ফোরটি-সেকেন্ড স্ট্রীটে এসে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল ওরা। একটা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করলেন রাবাত, যেটা ধরে গেলে পথ বাঁচবে। অল্প সময়ে পৌঁছতে পারবেন হোটেলে। অন্ধকার সুড়ঙ্গমুখটা দেখতে ভাল লাগল না মুসার। মনে হলো, ওর মধ্যে ঢোকাটা উচিত হবে না। সমর্থনের আশায় রবিন আর কিশোরের দিকে তাকাল সে। কিছু বলল না ওরা। নীরবে এগোল রাবাতের পিছু পিছু। অগত্যা মুসাকেও যেতে হলো।

সুড়ঙ্গের মাঝামাঝি পৌঁছে একটা ডাক কানে এল, 'দাঁড়াও, রাবাত!'

পুরো সুড়ঙ্গটা নির্জন, নিজেদের বাদে আর কাউকে দেখেনি এতক্ষণ। এবার দেখল। এগিয়ে আসছে আরেকজন। হাসি হাসি মুখ। বিচিত্র একটা রেনকোট পরা থাকায় আগের চেয়ে খাটোও লাগছে, মোটাও।

'মিলার!' চিৎকার করে উঠলেন রাবাত।

'যাক, দেখা তাহলে হলো,' মিলার বলল। 'অনেক দিন পর, কি বলো।'

নীরব সুড়ঙ্গ। এতটাই নীরব, কোথায় যেন টপ টপ করে পানির ফোঁটা পড়ছে, তা-ও কানে আসছে।

পেছনে কথা বলে উঠল আরেকজন, 'ক্যামেরার ব্যাগটা আমি নিয়ে নিচ্ছি।'

মনটিরেতে এই লোককেই দেখেছে গোয়েন্দারা, মিলারের দোস্ত, ব্যালার্ড। হাতে উদ্যত পিস্তল, রবিনের দিকে ধরে রেখেছে।

প্রতিবাদ না করে ব্যাগটা দিয়ে দিল রবিন।

ফিল্মগুলো আছে কিনা, দ্রুত ব্যাগ হাতড়ে দেখে নিল লোকটা। মিলারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল, 'ঠিকই আছে।' রাবাত আর গোয়েন্দাদের আদেশ দিল, 'ভেতরে যাও। সবাই।'

পিস্তল দিয়ে সুড়ঙ্গের একটা দরজার দিকে ইশারা করল সে। খিল খুলে দিল মিলার। তার ওপাশে একটা দেয়াল আলমারি। সেঁতসেঁতে। ঝাড়ু, মেঝে পরিষ্কার করার স্পঞ্জ আর জীবাণু ও কীট-পতঙ্গনাশক ওষুধের টিনে বোঝাই।

'ঢোকো!' পিস্তল নেড়ে আবার আদেশ দিল ব্যালার্ড।

ঢুকতে বাধ্য হলো চারজনে। দরজা লাগিয়ে দেয়া হলো বাইরে থেকে। খিলটাকে ভালমত আটকে রাখার জন্যে তার মধ্যে কাঠি জাতীয় কিছু ঢোকানোর শব্দ পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে সরে গেল পদশব্দ।

'বাঁচাও!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'কে আছ, আমাদের এখান থেকে বের করো!'

একুশ

দীর্ঘ একযুগ পরে যেন রেলের একজন টিকেট বিক্রেতা এসে মুক্ত করল ওদের। রাবাতদের মতই সুড়ঙ্গ দিয়ে চলেছিল একজন পথচারী। আলমারির মধ্যে আজব আওয়াজ শুনতে পেয়ে সন্দেহ জাগে। রেলের অফিসে গিয়ে জানায়। একজন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে এসেছে টিকেট বিক্রেতা। রাবাতকে প্রশ্ন শুরু করল পুলিশের লোকটা। কোন কথারই জবাব দিলেন না রাবাত। বিরক্ত হয়ে বরং এক ধমক লাগালেন তাকে। ছেলেদের নিয়ে সুড়ঙ্গ পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে হোটেলে ঢুকেই হোগারসনকে ফোন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল হোগারসন। আগের মতই শান্ত।

এতে রাগ আরও বেড়ে গেল রাবাতের। ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন। চিৎকার করে বললেন, 'এত কষ্ট করে টাকা কামাই করে ট্যাক্স দিই, সেই ট্যাক্সের টাকায় বেতন পান আপনারা, আর সেবা করার এই নমুনা! রাস্তাঘাটে জান নিয়ে টানাটানি পড়ে আমাদের। দুটো ডেঞ্জারাস স্পাইকে ধরার জন্যে আপনাদের সাহায্য চেয়েছিলাম। আমাদের কাজ তো ঠিকমতই করেছি, আপনার লোক কোথায়? ঘুমোচ্ছিল নাকি?'

'অনেকটা সে-রকমই, মিস্টার রাবাত,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল হোগারসন।

ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠলেন রাবাত। তাঁকে শান্ত করতে সময় লাগল হোগারসনের।

সারাদিন কোথায়, কি ভাবে কাটিয়েছেন, জানালেন তখন রাবাত। বার বার অভিযোগ করলেন দুর্গন্ধে ভরা, বাতাসহীন, ময়লা ঝাড়ুতে বোঝাই আলমারির মধ্যে আটকে থাকতে হয়েছে বলে।

'জঘন্য!' বলে বক্তব্য শেষ করলেন তিনি।

'ঠিক,' একমত হলেন হোগারসন। 'এ রকমটা ঘটা মোটেও উচিত হয়নি।'

মেজাজ একেবারে নরম হয়ে গেল রাবাতের। এতক্ষণে বসলেন।

হোগারসন বলল, 'আমাদের এজেন্টরা সব ছড়িয়ে পড়েছে। নিউ ইয়র্ক থেকে বেরোনোর সমস্ত পথে পাহারা দিচ্ছে ওরা—এয়ারপোর্ট, রেল স্টেশন, বাস স্টেশন, সুড়ঙ্গমুখ, ব্রিজ, কোথাও বাদ নেই। শহর থেকে বেরোনোর চেষ্টা করলে ওই দু'জন ধরা পড়বেই।'

'যদি না পড়ে?' প্রশ্ন করলেন রাবাত। 'এখানে এ ভাবে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকব নাকি আমরা?'

'মোটেও না। আপনাদের কাজ শেষ। আপনাদের আর বিরক্ত করবে না ওরা। মিলার তার ফিল্ম পেয়ে গেছে। ব্যালার্ডকে দিয়ে দেবে। ব্যালার্ড যখন ফিল্মগুলো ডেভেলপ করে দেখবে কিছুই নেই, বুঝবে আসল ছবিগুলো আমাদের হাতে পড়েছে। আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে আসার সাহস তার হবে না। গা ঢাকা দেবে। ধরে নিতে হবে, আমরাই জিতলাম। আপনাদের আর ভয় নেই।'

'দুই দুইজন স্পাই ঘুরে বেড়াচ্ছে,' আবার রেগে গেলেন রাবাত, 'আর আপনি বলছেন ভয় নেই! বাহ্, চমৎকার কথা!'

হাসল হোগারসন। 'আর কোনদিন স্পাই হতে পারবে না মিলার, সেই সুযোগই পাবে না। তার শয়তানি ফাঁস করে দিয়েছেন আপনারা। গর্বিত হওয়া উচিত আপনাদের। যে কোন ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে হলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট জমা দিতে হয়। যেখানে চাকরি করত, তার ধারেকাছেও আর যেতে পারবে না। নাম ভাঁড়িয়ে যদি আবার কোথাও চাকরির দরখাস্ত দেয়, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে, বাঁচতে পারবে না তখন আমাদের হাত থেকে। তবে আমার মনে হয় না এই বোকামি করার সাহস পাবে সে। আমেরিকায় থাকতে হলে চিরকাল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে এখন থেকে। জানের শান্তি নষ্ট হবে। সেটা আরও বড় জেল।'

সন্তুষ্ট হতে পারলেন না রাবাত। 'কিন্তু তার সঙ্গের শুঁয়াপোকাটার কি হবে? ব্যালার্ড না ফ্যালার্ড? যদি সে আবার কিছু করার চেষ্টা করে? আমার তো মনে হয় না সে স্পাইগিরি ছেড়ে দেবে।'

'আমারও না,' একমত হলো হোগারসন। 'তবে তার খোঁজে লোক

লাগিয়ে রাখব আমরা। ভালমত খোঁজা হবে। মিস্টার রাবাত, আপনি আর তিন গোয়েন্দাকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক সাহায্য করেছেন আপনারা।'

চলে গেল হোগারসন। দরজা লাগিয়ে দিয়ে এল রবিন। পরিস্থিতি সহজ হলো না, কেমন ভারী হয়ে রইল।

মুসা বলল, 'কোন কাজই হলো না!'

'ওই হোগারসনটা একটা অপদার্থ!' নাক দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগলেন রাবাত। 'দুধের শিশু পেয়েছে আমাদের! একটা কিছু বোঝাল, আর অমনি বুঝে গেলাম!'

গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমাদের অবস্থাটা হয়েছে, পিঠের নিচে ভাঁজ হয়ে থাকা এলোমেলো চাদর নিয়ে ঘুমানোর মত। রাতে বার বার ঘুম থেকে জেগে উঠে চাদর টানতে হবে।'

'তোমার এ সব মঙ্গলগ্রহের ভাষা ছাড়ো দেখি!'

ব্যাখ্যা করতে গেল না কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। হোগারসন যা-ই বলে যাক, আসল ফিল্মগুলো না দেয়া পর্যন্ত মিলার বা ব্যালার্ডের হাত থেকে নিরাপদ নয় ওরা। দু'জনকে খুঁজে বের করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার আগে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। তিন গোয়েন্দাও আরাম করে নিউ ইয়র্ক দেখতে পারবে না, রাবাতও তাঁর আবিষ্কার হাত বদল করার ব্যাপারে মন দিতে পারবেন না।

পরদিন সকালে উঠে অবশ্য বেরিয়ে গেলেন তিনি। সারাদিন পর ফিরে এসে জানালেন, যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন। কাজ এগোচ্ছে।

ফোর্ড গাড়িটা নিয়ে গেলেন একটা ওঅর্কশপে। সার্ভিসিং করাবেন। টুকিটাকি মেরামত থাকলে, সারিয়ে নেবেন। বাড়ি ফেরার পথে দীর্ঘ যাত্রায় যাতে গোলমাল না করে ওটা।

পরের কয়েকটা দিন খুব সকালে বেরিয়ে যান তিনি, ফেরেন সন্ধ্যায়। ছেলেরা থাকে নিজেদের মত। যেখানে ইচ্ছে ঘোরাফেরা করে। হাডসন নদীতে রাখা অনেক পুরানো একটা উভচর বিমান দেখতে গেল ওরা। ট্যুরিস্টদের জন্যে রাখা হয়েছে ওটা দর্শনীয় বস্তু হিসেবে। গেল হেইডিন প্ল্যানেটোরিয়ামে। লিটল ইটালিতে পিজ্জা খেলো। মাথার অনেক ওপরে বসানো ট্রামলাইন ধরে বেড়াতে গেল রুজভেল্ট আইল্যান্ডে। রকফেলার সেন্টার দেখতে গেল। নানা জায়গার স্যুভনির কিনল। মিলারের সঙ্গে শেষ মোলাকাতের চারদিন পর সাক্ষাৎ হলো অর্কিডওয়ালা এক মহিলার সঙ্গে।

সিক্স অ্যাভেন্যু আর থার্টিয়েথ স্ট্রীটটা যেখানে মিলেছে, সেই মোড়ের কাছে ওদের পাশ কাটাতে গেল মহিলা। একটা ঝুড়িতে বসানো টবে অর্কিড নিয়ে চলেছে। গাছটা বেশ সুন্দর। ফ্যাকাসে সবুজ আর বাদামী রঙের, কাঁটাওয়ালা তিনটে চমৎকার ফুল।

'শুনুন!' ডাকল রবিন।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা 'এ তো অর্কিড!'

লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। বিনয়ের অবতার সেজে জাপানী কায়দায় মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে বলল, 'সিমবিডিয়াম ফুল, তাই না?'

উজ্জ্বল হলো মহিলার মুখ। 'তুমি অর্কিড চেনো? সুন্দর ফুল, তাই না? চাষ করো নাকি?'

'আমার চাচা করে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে মিথ্যে বলে দিল কিশোর।

তাকে বিশ্বাস করল মহিলা। 'একটা জরুরী কাজ আছে আমার, ফুলটা আমার মেয়ের বাড়িতে রেখে সেখানে যাব। ফিরে এসে ফুলটা দেখাতে নিয়ে যাব। এইবার আর আমাকে পুরস্কার না দিয়ে পারবে না।'

'তাই নাকি? অর্কিড শো হচ্ছে নাকি শহরে?'

'ঠিক শো না। আমাদের স্থানীয় সৌখিন অর্কিড চাষীদের মাসিক সম্মেলন। প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন স্যার ওয়ালথার মারিয়াট। বক্তৃতা দেবেন। অর্কিডে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। এসো না তোমরাও? অর্কিডে আগ্রহী লোকদের বিনে পয়সায় অর্কিড বিতরণ করি আমরা। তোমাকেও দিতে পারব। তোমার চাচাকে নিয়ে গিয়ে দেবে। নিউ ইয়র্কেই থাকো তোমরা?'

'না, ক্যালিফোর্নিয়ায়।'

'বা-বা, অনেক দূর থেকে এসেছ! বেড়াতে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

অর্কিডের ঝুড়িটা মুসার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পার্স খুলে কার্ড বের করল মহিলা। তাতে ঠিকানা লিখে কিশোরকে দিয়ে বলল, 'রাত আটটায় স্টেটলার রয়ালে আসবে। স্যার ওয়ালথার মারিয়াটের সঙ্গে দেখা করে তাঁর অনুষ্ঠান থেকে অর্কিড নিয়ে গেছ শুনলে খুব খুশি হবেন তোমার চাচা, আমি শিওর। আমাদের একজন সদস্য অনুষ্ঠানের ভিডিও করে রাখবে। ইচ্ছে করলে ক্যাসেটটার কপিও করিয়ে নিতে পারো। তার জন্যে অবশ্য পয়সা লাগবে।'

মুসার হাত থেকে ঝুড়িটা নিয়ে নিজের পথে চলে গেল মহিলা।

কার্ডটার দিকে তাকাল কিশোর। নাম লেখা রয়েছে মিসেস স্লো জেলিমেয়ার। নিউ ইয়র্কের রিভারডেলের ঠিকানা। আর স্টেটলার রয়ালটা পাওয়া যাবে থারটিজের সেভেন্থ অ্যাভেন্যুতে।

বন্ধুদের দিকে তাকাল সে। 'কি মনে হয় তোমাদের? সৌখিন অর্কিড চাষীদের সম্মেলনের কথা পত্রিকায় দেখলে দেখতে যাবে মিলার? যেহেতু অর্কিডের ব্যাপার, তার চোখে পড়তেও পারে খবরটা।'

'মহিলার সঙ্গে যখন কথা বলছিলে, তোমার মতলব তখনই বুঝেছি,' রবিন বলল। 'তোমার ধারণা মিলার এখনও নিউ ইয়র্কেই আছে। কিন্তু ওরকম একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার সাহস কি সে করবে? এফ বি আইয়ের ভয়ে তার তো লুকিয়ে থাকার কথা।'

'এফ বি আই তো আর সমস্ত জায়গায় চোখ রাখেনি, ওরা রেখেছে বিশেষ বিশেষ জায়গায়। নিউ ইয়র্ক থেকে মিলার বেরোতে গেলে ওদের চোখে পড়বে। সুতরাং অত তাড়াতাড়ি বেরোনোর সাহস করবে না সে। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে তখন চেষ্টা করবে। এতদিন সে বসে থেকে করবেটা কি?

বিরক্ত হয়ে যাবে না? সময় কাটানোর জন্যে হলেও অনুষ্ঠানে যেতে চাইবে। বিশেষ করে অর্কিডের প্রতি তার যখন এত আগ্রহ।'

'তাহলে এটাই সুযোগ,' মুসা বলল। 'ধরা যাক, সে যাবে। আমরাই বা বসে থাকি কেন?'

রাবাতকে ওখানে নিয়ে যাবে কিনা, এটা নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল ওরা মুসা নেয়ার বিপক্ষে। বলল, 'নানার মেজাজের ঠিক-ঠিকানা নেই। মিলারকে দেখেই হয়তো জ্বলে উঠবে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে যা খুশি করে বসতে পারে। ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না আমাদের।'

'আমরা যে গেছি পরে যদি জানে?' প্রশ্ন তুলল রবিন।

নাক কুঁচকাল মুসা, 'জানলে জানবে।'

কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারল না ওরা। হোটেলে ফিরে চলল রিসেপশন ডেস্কে একটা মেসেজ পেল। রাবাত রেখে গেছেন। আসতে দেরি হবে রাতের খাওয়া ছেলেদের সঙ্গে খেতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে ওদেরকে খেয়ে নিতে বলেছেন। সময় না কাটলে সিনেমা দেখতেও যেতে পারে ওরা

হয়ে গেল সমস্যার সমাধান। সন্ধ্যায় স্থানীয় একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার খেলো ওরা। নিউ ইয়র্কের মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড় এবং ভাল হিরো স্যান্ডউইচ বানায় ওখানে। কথাটা বোধহয় সত্যি। খাওয়া শেষ করার পর মুসারও মনে হলো তার পেট ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে ক্রসটাউন বাস ধরে চলে এল স্টেটলার রয়ালে। লিফটে করে তেরোতলার গ্র্যান্ড বলরুমে পৌঁছল।

'গ্র্যান্ড' অর্থাৎ মহান বলরুমটা অত মহান নয়। গালভরা নামটাই যা। হোটেলটাও পুরানো। লাল কার্পেটের জায়গায় জায়গায় রঙ চটে গেছে। স্ফটিকের ঝাড়বাতিতে পুরো হয়ে জমে আছে ধুলো। লিফট থেকে নামতে তিন গোয়েন্দাকে স্বাগত জানাল মোটা এক লোক। গায়ে সাদা শার্ট। শার্টের বুকের কাছে তার নাম সুতো দিয়ে তোলা। কোন্ জায়গা থেকে এসেছে, তা-ও লেখা আছে। তাতে জানা গেল তার নাম বিল কংকি, সাইয়োসেট থেকে এসেছে। ছেলেরা অর্কিডে আগ্রহী শুনে খুব খুশি হলো। স্যার মারিয়াটের বক্তৃতা সহ ভিডিও ক্যাসেটও যে তার অর্কিড-বিলাসী চাচার জন্যে অবশ্যই নিয়ে যেতে চাইবে কিশোর, এ ব্যাপারেও নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করে দিল।

'কি করে ভাল অর্কিড ফলাতে হয়, এ ব্যাপারে লেকচার দেবেন স্যার মারিয়াট,' বিল বলল। 'এর জন্যে ঠিক মত প্যারেন্ট জোগাড় করতে হবে ভয়ানক ইন্টারেস্টিং।'

দৃষ্টি বিনিময় করল মুসা আর রবিন। মুসার পেট ফেটে হাসি আসছে।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল বিল, আরও কয়েকজন এসেছে, তাদের স্বাগত জানাতে। মুসা বলল, 'প্যারেন্ট মানে কি? অর্কিডেরও কি মাতাপিতা থাকে নাকি?'

'কি জানি!' ঠোঁট ওল্টাল রবিন। 'ইন্টারেস্টও যে কি করে *ভয়ানক* হয়, খোদাই জানে। সাংঘাতিক বলতে পারত। তা না, ভয়ানক!'

'থাক, খুঁত ধরা বাদ দাও,' হাত নেড়ে বলল কিশোর। 'ওরকম ধরতে থাকলে বেশির ভাগ মানুষেরই ধরতে পারবে।'

তেরোতলার ওই ঘরটা ঘুরে দেখতে শুরু করল ওরা।

প্রায় পুরো ফ্লোরটাই জুড়ে আছে গ্র্যান্ড বলরুম। প্রবেশমুখের বাইরে দুটো করিডর আছে। তাতে দুটো লিফট, হোটেলের গেস্টদের ওঠার জন্যে। লিফট শ্যাফটের পাশে একটা দরজা, তার ওপাশে সিঁড়ি। ডানের একটা হলঘরে রয়েছে কয়েকটা টয়লেট। বাঁয়ের আরেকটা হলঘরে সার্ভিস লিফট, হোটেল কর্মচারীদের ওঠানামার জন্যে। লিফট ছাড়িয়ে গেলে পাওয়া যাবে ছোট প্যানট্রি অর্থাৎ ভাঁড়ার ঘর। প্যানট্রি থেকে বলরুমে সরাসরি ঢোকারও দরজা আছে। হলের শেষ মাথায় ভারী একটা দরজা, মুসার সন্দেহ হলো, ওটা দিয়ে বেরোলে আরেকটা সিঁড়ি পাওয়া যাবে। তবে নিশ্চয় সাধারণের চলাচলের জন্যে নয় ওটা। নব ঘুরিয়ে দরজাটা খুলল সে। সিঁড়ি দেখতে পেল না। সরু এক চিলতে বারান্দার মত, ভারী রেলিঙ দিয়ে ঘেরা, তার ওপাশে খোলা। সে যে দরজাটা খুলেছে, সেটা ছাড়া বারান্দা থেকে বেরোনোর আর কোন পথ নেই। সরে এল সে। আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল ভারী পাল্লা, খুট করে জায়গামত লেগে গেল নবের স্প্রিঙ লক।

মিলার এলে হয় লিফট ব্যবহার করতে হবে, নয়তো মেইন করিডরের সিঁড়ি। পালাতে হলেও ওই একই পথে। আর কোন পথ নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল গোয়েন্দারা। সাইয়োসেটের বিল কংকলিন এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে স্পীকার'স টেবিলের সামনে। বিনীত ভঙ্গিতে অতিথিদের সীটে বসতে অনুরোধ করল।

ঘরের একধারে লম্বা টেবিলে নানা রকম অর্কিডের টব রাখা আছে। সেটার দিকেই আগ্রহ বেশি অতিথিদের। সেখানেই ভিড় করছে। বিলের মোলায়েম স্বরে কাজ হলো না। জোরে জোরে বলতে হলো। তাতেও সুবিধে হলো না। শেষে চিৎকার করে টেবিল চাপড়ে কিছুটা রুক্ষ স্বরেই যখন বসতে বলল, তখন এক দুই করে সরে এল অতিথিরা। সারি দিয়ে রাখা খাটো পিঠওয়ালা চেয়ারে বসল। ছাতে ঝোলানো আলোগুলো ম্লান হতে হতে যখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল, তখন জ্বলে উঠল স্পটলাইট, আলো ফেলল স্পীকার'স টেবিলের কাছে।

মাপা স্বরে বাছাই করা শব্দে অতিথিদের আরেকবার স্বাগত জানিয়ে, কি কারণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, জানাল বিল কংকলিন। ঘোষণা করল, 'স্যার মারিয়াট এখন আপনাদের তাঁর চাষ করা কিছু অর্কিড দেখাবেন। কি করে বাজে প্যারেন্ট থেকেও উঁচু মানের অর্কিড জন্মানো যায়, সে-ব্যাপারে আলোচনা করবেন।'

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'একেবারেই তো নীরস সাবজেক্ট! শুকনো খটখটে! ঘুমিয়ে না পড়ি!'

তার সামনের সীটে বসা মহিলা ফিরে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে কথা বলতে নিষেধ করল।

চেয়ারের পিঠ খাটো হওয়ায় আরাম করে হেলানও দিতে পারল না মুসা। তার মনে হলো, ইচ্ছে করে এ রকম চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে বিরক্তিকর বক্তৃতার সময় শ্রোতারা ঘুমিয়ে পড়তে না পারে, শুনতে বাধ্য হয়। তবু যতটা সম্ভব কাঁধ নিচু করে গা এলিয়ে দিল সে।

স্পীকারের টেবিলের ওপাশে এসে দাঁড়ালেন রোগাটে, প্রায় কঙ্কালসার, আপেলের মত টুকটুকে লাল মুখওয়ালা এক ভদ্রলোক। হাড্ডিসার হাতের তালু ক্রমাগত ডলছেন। যেন করজোড়ে মিনতি করছেন তাঁর ভয়াবহ বক্তৃতা শোনার জন্যে। বক্তৃতা 'ভয়াবহই' হবে, বিলের কথা থেকেই আঁচ করে নিয়েছে মুসা। ইনিই প্রধান অতিথি স্যার ওয়ালথার মারিয়াট, পরিচয় করিয়ে দিল কংকলিন।

পুরো তিন সেকেন্ড কোন কথা বললেন না মারিয়াট। আন্তরিক হাসিতে কেবল দাঁত দেখালেন অর্কিড় প্রেমিকদের। তারপর বললেন, 'সম্মানিত ভদ্রমহোদয়গণ।'

বলেই চুপ। আবার কয়েক সেকেন্ড দাঁত দেখানোর পর বললেন, 'কয়েক মিনিট আগে মিস্টার কংকলিন আমাকে বললেন, বক্তা হিসেবে একজন ভেজা চাষীকে পেয়ে আজকের সভা নাকি খুবই আনন্দিত। এর আগের সম্মেলনের বক্তা নাকি ছিলেন শুকনো চাষী। ভেজা চাষী কাকে বলেছেন, বুঝতে পারছেন তো? আমাকে।'

চাষী কি করে 'ভেজা' কিংবা 'শুকনো' হয় মাথায় ঢুকল না মুসার। নীরব হাসিতে ফেটে পড়ল সে।

কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে তাকে থামানোর চেষ্টা করল রবিন। তার মুখেও হাসি।

শব্দ করে হেসে ফেলার ভয়ে বন্ধুদের দিকে তাকাতে পারছে না কিশোর। জোর করে চোখ আটকে রেখেছে ভেজা চাষীর ওপর।

পেছনে দরজা খোলার মৃদু শব্দ হলো। ফিরে তাকাল সে।

'দয়া করে কি কেউ আলোটা নিভিয়ে দেবেন?' অনুরোধ করলেন স্যার মারিয়াট।

প্রায় লাফাতে লাফাতে ছুটে গেল কংকলিন। মাথার ওপরের আলোগুলো আগেই নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। স্পটলাইটটাও নিভে গেল। ক্ষণিকের জন্যে অন্ধকারে ঢেকে গেল ঘর। একটা স্লাইড প্রোজেক্টর চালু হওয়ার হালকা গুঞ্জন শোনা গেল। পর্দায় আলো পড়ল। ছবি ফুটল। তাতে দেখা গেল, একটা গ্রীনহাউসে কাজে ব্যস্ত স্যার মারিয়াট। টেবিলে একের পর এক অর্কিড তুলে রাখছেন।

'এখন শুনুন, কি করে ভাল প্যারেন্ট বাছাই করব আমরা,' আবছা অন্ধকারে আবার শোনা গেল তাঁর কণ্ঠ। 'কুঁড়ি কিংবা ফুল দেখেই অনেক কিছু বোঝা যায়। যারা এর চাষ করে তাদের কাছে ওই জিনিস দুষ্প্রাপ্য নয়, ফুলের জন্যেই তো করে, তাই না?' শ্রোতাদের কাছে প্রশ্ন রাখলেন তিনি।

করিডরের দিকের একটা দরজা খুলে গেল। দরজায় এসে দাঁড়ানো

গাট্টাগোট্টা একজন মানুষের অবয়ব প্রোজেক্টরের আলোর আভায় চোখে পড়ল। ঘরের অন্ধকার চোখে সইয়ে নেয়ার অপেক্ষা করছে মনে হলো।

ছবিতে টেবিলের সামনে দাঁড়ানো মারিয়াট তখন নানা রকম ফ্লাস্ক, বীজ আর গাছের চারা নাড়াচাড়া করছেন। কোনটা বাছাই করে কি ভাবে লাগালে ভাল ফলন আশা করা যাবে, বোঝাচ্ছেন।

অন্ধকার ঘরে ঢুকল আগন্তুক। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

মুসার গায়ে খোঁচা দিল কিশোর। আস্তে উঠে রওনা হয়ে গেল ঘরের পেছন দিকে। তাকে অনুসরণ করল মুসা আর রবিন।

খানিকটা সরে এসে ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'ঢুকল যে, ওই লোকটা মিলার, কোন সন্দেহ নেই আমার। হোগারসনকে ফোন করব, দেখি পাওয়া যায় কিনা।'

দরজার পাল্লা যতটা সম্ভব কম ফাঁক করে পিছলে বেরিয়ে এল সে। পেছনে বেরোল অন্য দু'জন। দাঁড়িয়ে গেল ওখানে। নীরব করিডরে ফোন কোথায় আছে খুঁজছে ওদের চোখ।

কাছেই আরেকটা দরজা খুলে গেল।

করিডর আর বলরুমের সঙ্গে যোগাযোগকারী বড় দরজাটা নয়, অন্য আরেকটা ছোট দরজা, প্যান্ট্রির কাছে।

মিলার? তিন গোয়েন্দাকে দেখে ফেলে বলরুম থেকে পালাচ্ছে? করিডরে নিশ্চয় ওদের আবছা অবয়ব চোখে পড়েছে তার। ত্রিমূর্তিকে চিনতে অসুবিধে হয়নি মিলারের।

বাঁয়ের ছোট হলটাতে পদশব্দ শোনা গেল। তারপর বাসন-পেয়ালার ঠোকাঠুকি। এবং তারপর একটা গুঞ্জন, নিচতলা থেকে উঠে আসতে আরম্ভ করেছে সার্ভিস লিফটটা।

পা টিপে টিপে এসে হলে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। লিফটের দিকে তাকাল। গাঢ় রঙের স্যুট পরা একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। অন্ধকারে তার কাপড়ের রঙ বোঝা যাচ্ছে না, কালো দেখাচ্ছে। ওদের দিকে পিঠ। দু'হাতে ধরা ট্রেতে কাপ-পিরিচ।

কোন ওয়েইটার? ব্যবহৃত কাপ-পিরিচ নিয়ে নিচে নামাতে যাচ্ছে সে?

রবিন বলল, 'এই দেখো, ওর পায়ে লোফার!'

চমকে গেল ওয়েইটার। সামান্য ঘুরে গেল মাথা, এদিকে তাকাল। মুখের একটা পাশ দেখা গেল।

'ওভাবেই থাকুন, মিস্টার মিলার!' রবিন বলল, 'আপনার একটা ছবি তুলে নিই!'

সঙ্গে ক্যামেরা এনেছে রবিন। বেড়াতে বেরোনোর পর থেকে এটা সব সময় সাথে থাকে তার, কখনও কাছছাড়া করে না। লোকটার দিকে করে শাটার টিপে দিল। ঝিলিক দিয়ে উঠল ফ্ল্যাশার।

রবিনের দিকে লাফ দিল মিলার। একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল। হাত থেকে ট্রে-কাপ খসে পড়ে ঝনঝন করে ভাঙল।

ওই মুহূর্তে খুলে গেল সার্ভিস লিফটের দরজা। মিলারের পাশ দিয়ে ছুটে লিফটে ঢুকে গেল কিশোর আর মুসা। ইমারজেন্সি সুইচ টিপে দিল কিশোর। এটা টিপলে আটকে যায় লিফট, যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। আর অ্যালার্মের লাল বোতামটা টিপল মুসা। তীক্ষ্ণ শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। বাজতেই থাকল।

'পুলিশ! পুলিশ!' বলে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'খুন করে ফেলল! বাঁচাও!'

রবিনের গলা টিপে ধরতে যাবে মিলার, এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল বলরুমের দরজা।

আরেকটা ছবি তুলে ফেলল রবিন।

ছুটে বেরিয়ে এল কংকলিন। রাগে কুঁচকে গেছে মুখচোখ। চিৎকার করে বলল, 'এই, হচ্ছে কি এ সব! বন্ধ করো!'

থমকে গেল মিলার। দ্বিধায় পড়ে গেছে। চোখ প্রায় অন্ধ করে দিয়েছে ফ্ল্যাশারের তীব্র আলো।

'পুলিশ!' আবার চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'পুলিশ ডাকুন! আমাকে খুন করতে এসেছে!'

আবার টিপল শাটার। একেবারে মিলারের মুখের কাছে ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে।

ধাক্কা খেয়ে যেন পিছিয়ে গেল মিলার। চোখের সামনে নিয়ে গেছে দু'হাত। তারপর ঘুরে দৌড় দিল সার্ভিস লিফটের দিকে।

মুসা আর কিশোর ওখানে অপেক্ষা করছে। ভাঙা কাপ-পিরিচ মাড়িয়ে উঠতে গিয়ে ওদেরকে লক্ষ করল মিলার। উঠল না আর। দৌড় দিল ভারী দরজাটার দিকে। মুসার মত সে-ও ভেবেছে ওদিকে সিঁড়ি আছে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ছুটছে সে। নব ঘুরিয়ে একটানে পাল্লাটা খুলে চলে গেল ওপাশের অন্ধকারে। পাল্লা ছেড়ে দিতেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল সেটা, তালা লেগে গেল। চাবি ছাড়া ওদিক থেকে খুলতে পারবে না।

বলরুম থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে কৌতূহলী মানুষেরা। মহিলাদের কেউ কেউ ভয় পেয়েছে। করিডরে এসে এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল অর্কিডপ্রেমীর দল।

লিফটের ঘণ্টা বাজা থেমে গেল।

অকস্মাৎ নীরব হয়ে গেল যেন সব কিছু, বড় বেশি চুপচাপ। এরই মাঝে কানে এল একটা চিৎকার। হলের শেষ মাথায় দরজার ওপাশ থেকে আসছে।

'বাঁচাও!' চিৎকার করছে মিলার, দরজায় কিল মারছে, 'দরজা খোলো! বের করো আমাকে! বাঁচাও!'

কংকলিনের দিকে ফিরল কিশোর। শান্তকণ্ঠে বলল, 'মিস্টার কংকলিন, টেলিফোনটা কোথায় বলবেন দয়া করে? এফ বি আইকে ফোন করতে হবে।'

বাইশ

রেস্টুরেন্টটা অবিশ্বাস্য রকমের বিলাসবহুল। সাদা মখমলের কাপড়ে ঢাকা টেবিলগুলো, জানালার পর্দায় এমব্রয়ডারি করা দামী কাপড়ের পর্দা। সবখানে তাজা ফুলের ছড়াছড়ি। কার্পেট এত পুরু, পা ফেললেই গোড়ালি অবধি দেবে যায়। মেন্যুর বদলে হেডওয়েইটার স্বয়ং এসে নরম, ভদ্রস্বরে কথা বলে খাবারের অর্ডার নিয়ে যায়। নীল টেলকোট আর ডোরাকাটা ভেস্ট পরা অন্য ওয়েইটাররা খাবার সরবরাহ করে। তিন গোয়েন্দার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হলো না। চিংড়ির একটা বিশেষ ডিশের অর্ডার দিল ওরা। রান্না নাকি খুবই চমৎকার এখানে।

ওদের খাওয়াতে এনেছেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার। ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললেন, 'সিনেমায় তখনও ঢুকিনি। প্রায় পথে পথেই ঘুরে বেড়াচ্ছি বলা চলে, বেকার, কাজ খুঁজছি। এখানে আসার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না তখন হলে। সাধারণ কোন ফাস্ট ফুড শপের সাধারণ বার্গার পেলেই বর্তে যেতাম। তা-ও সব দিন জোগাড় করতে পারতাম না।'

মিনারেল ওয়াটারের গেলাসে চুমুক দিলেন তিনি। হাসলেন। 'ধনী হওয়ার মজাই আলাদা। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না এ কথা।…হ্যাঁ, এবার তোমাদের কেসের কথা বলো। কিশোর, পত্রিকায় হ্যারিস মিলারের খবরটা দেখে তোমার মেরিচাচীকে ফোন করেছিলাম। তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি জানেন মুসার নানার সঙ্গে তোমরা ছুটি কাটাতে গেছ, বেড়াতে। কল্পনাই করতে পারেননি, স্পাই তাড়া করে বেড়িয়েছ।'

হেসে ফেলল মুসা। 'ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছি, এটাও যেমন ঠিক; একটা কেস হাতে নিয়ে বেরিয়েছি এটাও ঠিক। কেসটা দিয়েছিল আমার মা।'

বাবাকে কি করে ঝামেলা মুক্ত রাখার জন্যে তিন গোয়েন্দাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন মিসেস আমান, খুলে বলল সে। 'আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। সেটা করতে গিয়েই স্পাইদের সঙ্গে জড়িয়েছিলাম।'

'সে-রকমই শুনেছি,' পরিচালক বললেন। 'এ সময় নিউ ইয়র্কে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ভাবিনি। ভাল লাগছে। একটা ছবির কাজে এসেছি। নিউ ইয়র্কে শূটিং করতে হবে। মনে হচ্ছে, সিনেমার আরও একটা ভাল গল্প পেয়ে গেলাম। পত্রিকায় তোমাদের কেসের খবরটা পড়ে তাই মনে হলো। এবার বলো সব। পুরো কাহিনীটা তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই। রবিন, এটা তো বাড়ি নয়, লিখে ফেলার কাজটা নিশ্চয় শুরু করোনি?'

'করেছি, স্যার,' রবিন বলল। 'আজ সকালে আপনার ফোন পেয়ে তো চমকেই গিয়েছিলাম। আমরাও ভাবতে পারিনি আপনি নিউ ইয়র্কে আছেন,

দেখা হয়ে যাবে।'

কাহিনী শুরু করল রবিন। গোড়া থেকে বলতে লাগল। কি করে মুসার আম্মা ওদেরকে কাজটা দিয়েছেন। পিজমো বীচে মিলারের সঙ্গে গোলমালের সূচনা থেকে স্টেটলার রয়ালে তাকে পাকড়াও করা পর্যন্ত কিছুই বাদ দিল না। মাঝে মাঝে তাকে কথা জুগিয়ে দিল মুসা আর কিশোর।

'চমৎকার!' পুরোটা শুনে বললেন পরিচালক। 'হোটেলের ওয়েইটাররা যে কাজের সময় লোফার পরে না, শুধু এই সামান্য সূত্র দিয়ে কাউকে সন্দেহ করে ফেলাটা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। একটা ব্যাপার অবাক করছে আমাকে। সান্তা রোসায়ও তো গাড়ির নিচে উঁকি দিয়েছিলে তোমরা। পেট্রোল ট্যাংকে লাগানো সঙ্কেত পাঠানোর যন্ত্রটা তখন চোখে পড়ল না কেন?'

'অমন কিছু থাকতে পারে, তখনও ভাবিনি,' জবাব দিল কিশোর। 'তা ছাড়া রাত দুপুরে চোখ তখন এমনিতেই ক্লান্ত, তার ওপর টর্চের ব্যাটারি গিয়েছিল ফুরিয়ে। নানা রকম উত্তেজনার মাঝে ব্যাটারি চেক করতে ভুলে গিয়েছিলাম। সবচেয়ে বড় কথা, মিলার যে দুষ্ট লোক, মিস্টার রাবাতের এ কথায় তখনও গুরুত্বই দিইনি। তাই নতুন ব্যাটারি ভরে ভালমত আবার খোঁজার কথা মনে হয়নি।

'আগেও এ ধরনের অপরাধ করেছে কিনা মিলার, জানতে পারিনি। এ সব গোপনীয় ব্যাপার, তাই এফ বি আই আমাদের সামান্যই জানিয়েছে। হোগারসনের কাছে জেনেছি, বিমানের যন্ত্রপাতি তৈরির একটা কারখানায় কাজ করত মিলার। ইলেকট্রনিক এঞ্জিনিয়ার ছিল সে। সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ছিল তার, কারখানার মধ্যে যেখানে ইচ্ছে যখন তখন যেতে পারত। তবে কিছুদিন পর চাকরি থেকে বের করে দেয়া হলো তাকে—অন্যান্য টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অপরাধে। হয়তো প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে জেদের বশেই স্পাইয়ের কাজটা করেছে সে। চাকরি যাবে শোনার পর তথ্য চুরি করার সিদ্ধান্ত নেয়, বেরিয়ে আসার আগেই কাজটা সেরে ফেলে।

'ছবি ডেভেলপ করার যন্ত্রপাতি ছিল না তার বাড়িতে। কোন ক্যামেরার দোকান থেকে করিয়ে আনারও সাহস করেনি, ঝুঁকি নিতে চায়নি ক্যামেরাটা সহই দিয়ে দিতে চেয়েছিল ব্যালার্ডকে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, ক্যামেরাটা বদল হয়ে হাতছাড়া হয়ে গেল। অন্য কারণে তাকে সন্দেহ শুরু করেন মিস্টার রাবাত। মিলার ভাবল, তার তথ্য চুরির ব্যাপারটা নিয়ে তাকে সন্দেহ করছেন তিনি। চোরের মন পুলিশ পুলিশ!'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালেন পরিচালক। 'অপরাধী এ ভাবেই নিজেকে ধরিয়ে দেয়।'

মুসা বলল, 'যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা, ক্যামেরাটার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল মিলার। ওটা যে বদল হয়ে গেছে, ধরতে পারেনি রবিন। সে বুঝতে পারার আগেই তার কাছ থেকে ওটা কেড়ে নিতে চেয়েছিল মিলার।'

'সে-সব তো আগেই শুনলাম। ব্যালার্ডের কি খবর? তাকে ধরেছে?'

মুহূর্তের জন্যে কালো হয়ে গেল কিশোরের মুখ। 'ও পালিয়েছে। হোগারসনের কাছে শুনলাম, মিলার ধরা পড়ার পরদিন নাকি ভিয়েনায় দেখা গেছে তাকে। এফ বি আইয়ের জাল কেটে বেরিয়ে গেছে সে।'

'তারমানে ওস্তাদ গুপ্তচর সে। অনেক দিন ধরে আছে এ লাইনে।'

'যতবড় ওস্তাদই হোক,' মুসা বলল, 'আমাদের কাছে একটা মার খেয়ে গেছে। যে ফিল্মগুলো নিয়েছে রবিনের ব্যাগ থেকে, সব বাতিল জিনিস। ডেভেলপ করার পর দেখবে কিচ্ছু ওঠেনি মুখটা তখন পচা ডিম হয়ে যাবে। হয়তো গালাগাল করবে আমাদের, কিন্তু লাভ হবে না কিছুই।'

মৃদু হাসি ফুটল পরিচালকের ঠোঁটে। মাথা ঝাঁকালেন। 'তা বটে। তো, মুসা, তোমার নানার আবিষ্কারটা কি? বিক্রি করতে পেরেছেন?'

হাসল মুসা। 'পেরেছে বিশেষজ্ঞরা বলছে, সত্যিই কাজের জিনিস। গাড়িতে ওটা পাইনি আমরা তার কারণ, গাড়িতে ছিল না। আক্রমণ আসতে পেরে ভেবে ওটা আগেই ডাকে রিভারভিউ প্লাজায় পাঠিয়ে দিয়েছিল, নিউ ইয়র্ক এসে প্রথম যে হোটেলে আমরা উঠেছিলাম। ম্যানেজারকে বলে রেখেছিল, আমরা না আসা পর্যন্ত যেন খামটা নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়। রেখে দিয়েছিল ম্যানেজার। সেজন্যেই মিলার পিছে লাগায় আবিষ্কার খোয়া যাওয়ার ভয় ছিল না নানার, লোকটাকে দেখতে পারে না বলে ভীষণ খেপে গিয়েছিল।'

'কিন্তু আবিষ্কারটা কি? সামরিক বাহিনীর কাজে লাগবে এমন কিছু?'

'না, মহাকাশচারীদের কাজে লাগবে। গির্জার হলের জন্যে স্প্রিঙ্কলার সিসটেম বানাতে গিয়ে এক ধরনের নতুন ভালভ আবিষ্কার করে বসে নানা। এর মধ্যে একটা অটোম্যাটিক সেনসর থাকবে। বর্তমানে যে সব ভালভ ব্যবহার করে নভোচারীরা তার চেয়ে অনেক ছোট আর হালকা বলে বহন করতেও সুবিধে। স্পেসস্যুটের ভেতরে বসানো এই জিনিসটা তাপমাত্রা আর চাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে বলে অন্যান্য বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ছেঁটে ফেলা যাবে, তাতে স্যুটের আকার আর ওজন দুটোই অনেক কমানো যাবে। শিপ থেকে বেরিয়ে মহাকাশে ঘোরাফেরা করতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে নভোচারীরা।'

'তারমানে ভাল জিনিসই আবিষ্কার করেছেন!'

'হ্যাঁ নানাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে এখন কয়েকটা ফার্ম, NASA-র অনেক জিনিস সাপ্লাই দেয় ওরা। একজন উকিল নিযুক্ত করেছে নানা তাকে নিয়ে কোম্পানিগুলোর সঙ্গে মীটিঙে বসছে। ভোরে বেরোয়, রাত করে ফেরে। সাংঘাতিক খাটুনি যাচ্ছে। সেই তুলনায় মেজাজ খারাপ হচ্ছে না। রাতে এসেও হেসে হেসে কথা বলে আমাদের সঙ্গে। রসিকতা করে আগে যেটা একেবারেই করত না হয় চুপ করে থাকত, নয়তো খেউ খেউ করে উঠত।'

'আসল কথাটা হলো দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মানসিক চাপ থাকলে ভাল মেজাজও খারাপ হয়ে যায়।' হাসলেন তিনি, 'তাহলে একটা

ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, এই দীর্ঘ যাত্রায় একসঙ্গে থেকে থেকে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছেন তোমাদের। নিঃসঙ্গ জীবনে তিন তিনজন ভাল বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছেন।'

হাসল না কেবল মুসা।

'এখন আসল কথা শোনো,' পরিচালক বললেন, খাওয়াতে এনেছি কোথাও আরামে বসে তোমাদের গল্পটা শোনার জন্যে আরও একটা প্রস্তাব দিতে পারি, হাতে কাজ না থাকলে আমার সঙ্গে যেতে পারো আর নতুন ছবিটার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে আজ রাতে মিস্টার রাবাতকে [illegible] করো দাও। সম্ভব হলে যেন সন্ধ্যার দিকে চলে আসেন আজ তিনি কয়েক ঘন্টা সময় দেন আমাদের।'

পরিচালকের প্রস্তাবে খুশি হলো কিশোর

তবে মুসাকে তেমন খুশি দেখাল না আমতা আমতা করে ফেলল, 'এ ধরনের অনুষ্ঠানে যেতে ভয় লাগে আমার, স্যার

অবাক হলেন পরিচালক। 'কেন?'

'অর্কিডপ্রেমীদের অনুষ্ঠান তো দেখলাম। বাপরে বাপ। ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটা আলোচনা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম একবার টিভির সামনে থেকে উঠে সোজা দৌড় দিতে ইচ্ছে করে অর্কিডওয়ালারা তার চেয়ে বিরক্তিকর!'

হেসে ফেললেন পরিচালক। 'না, অতটা বিরক্তিকর লাগবে না আমাদের অনুষ্ঠান, কথা দিতে পারি তোমাকে। উত্তেজনা আর আনন্দের অনেক খোরাক পাবে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রচুর খাবার সাজানো দেখবে টেবিলে.' মুসার দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি। চোখে মিটিমিটি হাসি। 'তোমার পছন্দ মত।'

এইবার হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'তাহলে স্যার আর কোন আপত্তি নেই আমার।'

* * *

বিপজ্জনক খেলা

প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৯৮

মনটা খারাপ হয়ে গেছে ওদের। হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আন্ট জোয়ালিন। অথচ রকি বীচ থেকে যখন রওনা দিয়েছিলেন, তখন দিব্যি সুস্থ। রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে পেটব্যথা শুরু হলো। শোরটাউনে পৌঁছতে পৌঁছতে একেবারে কাহিল। তাঁর বোন মিস ভায়োলার বাড়িতে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। এসে ওষুধপত্র দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আগামীদিনের আগে ভাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মিস ভায়োলার বাড়িতে অবশ্য এমনিতেও উঠত ওরা—আন্ট জোয়ালিন, তিন গোয়েন্দা এবং কোরি ড্রিম এখানে থেমে গোস্ট আইল্যান্ডে যাওয়ার অপেক্ষা করত। প্রতিদিন একবার করে দ্বীপে যায় লঞ্চটা। ধরতে না পারলে পরের দিনের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

কোরি ড্রিম তিন গোয়েন্দার বান্ধবী, এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। আন্ট জোয়ালিন কোরির খালা। গরমের ছুটিতে গোস্ট আইল্যান্ডে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলেন ওদের। তিন গোয়েন্দার ওখানে যাওয়ার দুটো কারণ—ছুটি কাটানো এবং ভূত দেখা। কোরির দৃঢ় বিশ্বাস, গোস্ট আইল্যান্ডের একমাত্র হোটেল 'নাইট শ্যাডো'-তে ভূত আছেই। যেমন নাম দ্বীপের, তেমনি হোটেলের কৌতূহল ঠেকাতে পারেনি গোয়েন্দারা। যেতে রাজি হয়ে গেছে

ভাল রোদ ঝলমলে দিন দেখে রওনা হয়েছে ওরা। পথে যে এ রকম একটা অঘটন ঘটবে কে ভাবতে পেরেছিল?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হলো না। সেদিনই সন্ধ্যার লঞ্চ ধরতে ওদের রাজি করালেন আন্ট জোয়ালিন। বললেন, 'তোরা চলে যা। কাল শরীর ভাল হয়ে গেলে আমিও যাব। না পারলে পরশু।'

অহেতুক আন্ট ভায়োলার বাড়িতে বসে থাকার মানে হয় না। শোরটাউনে দেখার কিছু নেই সুতরাং কোরিকে নিয়ে লঞ্চঘাটে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা

ট্যাক্সি নিয়ে ছোট্ট শহরের সরু রাস্তা ধরে লঞ্চঘাটে পৌঁছল ওরা। রাস্তায় লোকজন তেমন নেই যা আছে, বেশির ভাগই ট্যুরিস্ট। ডকের শেষ মাথায় একধারে একটা ছোট কাঠের সাইনবোর্ডে লেখা: গোস্ট আইল্যান্ড টুরস। নিচে তীরচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে কোন ঘাট থেকে দ্বীপে যাওয়ার লঞ্চ ছাড়ে।

সেদিকে এগিয়ে গেল ওরা।

ছোট একটা বোট থেকে লাফিয়ে নেমে এল হাসিখুসি এক তরুণ। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'গোস্ট আইল্যান্ডে যাবে?'

কিশোর জবাব দিল, 'হ্যাঁ '

'আমি এই লঞ্চের সারেং এসো

ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে লঞ্চে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা হাত ধরে কোরিকে উঠতে সাহায্য করল সারেং শুধু ওরাই আর কোন যাত্রী দেখল না অবাক লাগল কিশোরের

সামনের দিকে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা সরু কাঠের বেঞ্চের নিচে ঢুকিয়ে দিল ব্যাগগুলো। সবজে-ধূসর ঢেউ লঞ্চের কিনারে বাড়ি মারছে, ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল। খানিক দূরে সৈকতের বালিতে ফেলে দেয়া আবর্জনায় খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে চার-পাঁচটা সী গাল।

ওরা উঠতেই আর দেরি করল না সারেং ডকের সঙ্গে বাঁধা লঞ্চের দড়িটা খুলে দিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দিল। বিকট গর্জন করে উঠল পুরানো এঞ্জিন। জেটির কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করল লঞ্চ

কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে কিশোর বাতাস ভেজা ভেজা। ঠাণ্ডা।

আচমকা ভীষণ দুলে উঠল লঞ্চ। জেটি থেকে সরে আসতেই বিশাল ঢেউ ধাক্কা মেরেছে। সীটে বসেও প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল যাত্রীরা। সাংঘাতিক দুলুনি

মজা পেয়ে হেসে উঠল কোরি। হাসিটা সংক্রামিত হলো অন্য তিনজনের মাঝে।

'ভয় পাচ্ছ?' হেসে জিজ্ঞেস করল সারেং। 'আজ অতিরিক্ত ঢেউ

'দারুণ!' মুসা বলল। 'মনে হচ্ছে নাগরদোলায় চড়ছি।'

রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কোরি। আধ মিনিটেই অর্ধেক কাপড় ভিজিয়ে সরে চলে এল। বৃষ্টির ছাটের মত এসে গায়ে লাগে পানির কণা।

শোরটাউন থেকে বেশি দূরে না দ্বীপটা। বেশিক্ষণ লাগল না পৌঁছতে। তীরের দিকে তাকিয়ে ডকের এপাশ ওপাশ খুঁজল মুসা, 'কই? আমাদের না নিতে আসার কথা? কেউ তো এল না '

কোরি বলল, 'বুঝতে পারছি না হয়তো দেরি দেখে ফিরে গেছে।'

সারেঙের দিকে ফিরল কিশোর, 'আসতে দেরি করেছি নাকি?'

'আর দিনের চেয়ে কিছুটা তো দেরিই।'

'হুঁ,' কোরির দিকে তাকাল কিশোর তারমানে মেলবয়েস লোক পাঠিয়েছিলেন ঠিকই লঞ্চ না দেখে ফিরে গেছে।'

ডকে ভিড়ল লঞ্চ। লাফ দিয়ে দিয়ে নামল ওরা। সারেং নামল না। ওপর থেকে ওদের ব্যাগ-সুটকেসগুলো বাড়িয়ে দিল এক এক করে।

দমকা বাতাসে ওদের দুই পাশে ধুলোর ঘূর্ণি উড়ল।

'দ্বীপ বটে একখান!' আনমনে বিড়বিড় করল সারেং।

চারপাশে তাকাল কিশোর শেষ বিকেলের রোদে এত সুন্দর লাগছে

জায়গাটাকে, বাস্তব মনে হয় না আকাশের গোলাপী রঙ রাঙিয়ে দিয়েছে সাগরের পানিকে ঢেউ আছড়ে পড়ছে সাদা বালিতে। ডকের দুদিকে বহুদূর লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে সৈকতটা

সরু একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে ঢুকে গেছে পাইনবনের ভেতর। ওপর দিকে তাকালে বন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

'হোটেলটা কই?' জানতে চাইল কিশোর।

শেষ ব্যাগটা মুসার হাতে তুলে দিল সারেং। শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম আর নোনা পানি মুছল। হাত তুলে বনের দিকে দেখিয়ে বলল, ওখানে।'

'বনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে?' ঘাবড়ে গেল মুসা। ভূতের ভয় তার ষোলো আনা। আসার ইচ্ছেও ছিল, আবার না-ও। ভূতকে ভয় পায়, এদিকে দেখার কৌতূহলও সামলাতে পারেনি।

'হ্যাঁ,' সারেং বলল। 'এই রাস্তা ধরে চলে যাবে।' লঞ্চের দড়ি খুলতে আরম্ভ করল সে। 'একটা গেটহাউস দেখতে পাবে। হোটেলটার চারপাশ ঘিরে বেড়া দেয়া। যাও, পেয়ে যাবে গেট।'

দড়ির খোলা মাথাটা ডেকে ফেলে দিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দিল সে। দ্রুত সরিয়ে নিতে শুরু করল ডকের কাছ থেকে। ওর এই তাড়াহুড়াটা ভাল লাগল না মুসার। বনের দিকে তাকাল। 'যাব কি করে? শাটলবাস আছে?'

তার কথার জবাব দিল না সারেং। অনেক সরে গেছে। বিকট শব্দ করছে এঞ্জিন। ওদের দিকে একবার হাত নেড়ে লঞ্চের নাক ঘুরিয়ে দিল সে একটিবারের জন্যেও আর ফিরে তাকাল না।

দুই

'লোকজন তো কাউকেই দেখছি না,' নিজের ব্যাগটা হাতে নিয়েও আবার নামিয়ে রাখল কিশোর।

'আমাদের কথা ভুলেই গেল কিনা কে জানে,' কোরি বলল।

'দাঁড়িয়ে না থেকে চলো হাঁটি।'

'একটা জিনিস অবাক লাগেনি তোমাদের?' রবিন বলল, 'লঞ্চে আমরা ছাড়া আর কোন যাত্রী ছিল না। একজন টুরিস্টও এল না কেন?'

'সমুদ্রের অবস্থা খারাপ দেখে সাহস পায়নি হয়তো,' অনুমান করল মুসা।

'মনে হচ্ছিল সাগরটা যেন ইচ্ছে করে ঠেলে আসতে চেয়েছে আমাদের দিকে,' কালো ছায়া পড়ল কোরির মুখে। 'এখানে আসতে বাধা দিচ্ছিল আমাদের।'

'খাইছে!' গলা কেঁপে উঠল মুসার। 'ওরকম করে বোলো না! আমার ভয় লাগছে!'

'আরে কি সব ফালতু কথা শুরু করলে,' বনের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। কেউ আসে কিনা দেখছে।

'ফালতু দেখলে কোথায়?' তর্ক শুরু করল কোরি। 'সুস্থ মানুষ, হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে গেলেন আন্ট জোয়ালিন। সাগরের ঢেউ ঠেলে এসেছে আমাদের দিকে। এসবই খারাপ লক্ষণ।' নিজের অজান্তেই হাত উঠে গেল গলার লকেটটার কাছে। আঙুলগুলো চেপে ধরল কাঁচের তৈরি মানুষের খুলির মত দেখতে রঙিন লকেটটা। রকি বীচের এক অ্যানটিক শপ থেকে জোগাড় করেছে সে। দোকানদার বলেছে, বহু পুরানো জিনিস। প্রাচীন একটা কবরে পাওয়া গেছে। এটা যার গলায় পরা থাকবে, ড্রাকুলার মত সাংঘাতিক ভূতও তার কিছু করতে পারবে না।

'উফ্,' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর, 'এক মুসার যন্ত্রণাতেই বাঁচি না, আরও একজন যুক্ত হলো। অ্যাই কোরি, তোমার ওই ভূত, অশুভ লক্ষণ, এসব নিয়ে লেকচার থামাবে?'

'ভূত দেখতেই কিন্তু এখানে এসেছ তোমরা।'

'ও একটা কথার কথা। আমি এসেছি আসলে বেড়াতে। ভূত যদি থাকেই, মুসাকে নিয়ে দেখিয়ে দিয়ো। পরে। এখন চলো, যাওয়া যাক।'

'কেন, শাটলবাসের জন্যে অপেক্ষা করবে না?' মুসার দিকে আড়চোখে তাকাল রবিন।

'শাটলবাস না, কচু আসবে এখানে,' মুখ ঝামটা দিয়ে বলল কোরি। 'তার চেয়ে বরং হাত নাড়ো, ট্যাক্সি চলে আসুক।'

'ঠাট্টা করছ নাকি? মনে হচ্ছে যেন মোড়ের কাছে বসে তোমার অপেক্ষা করছে গাড়িওয়ালা,' কিশোর বলল। 'এখানকার সুবিধা-অসুবিধা আন্ট জোয়ালিন তো সবই বলে দিয়েছেন। এখন বিরক্ত হও কেন?'

'কিন্তু ডকের কিনার থেকেই যে খাড়া পাহাড়ে চড়তে হবে একথা বলেনি।' বিশাল দুটো সুটকেসে জিনিসপত্র ভরে নিয়ে এসেছে কোরি। এরকম বোঝা বইতে হবে জানলে আনত না। বিরক্তমুখে নিচু হয়ে দুহাতে তুলে নিল দুটো সুটকেস।

নিজের ক্যানভাসের ব্যাগটা কাঁধের ওপর ফেলল মুসা। হাত বাড়াল কোরির দিকে; 'একটা দাও আমাকে। তুমি দুটো নিতে পারবে না।'

কিন্তু দিল না কোরি। বলল, 'না, পারব।'

চাপাচাপি করল না মুসা। 'ঠিক আছে, না পারলে দিয়ে দিয়ো।'

রাস্তা ধরে উঠতে শুরু করল ওরা। ঢুকে পড়ল পাইনবনে। কিছুদূর এগোতে পাথরের একটা গেটহাউজ দেখা গেল। দুপাশ থেকে উঁচু লোহার শিকের বেড়া চলে গেছে দুদিকে। সারেং বলেছে হোটেলের পুরো সীমানাই ঘিরে রেখেছে ওটা। গেটহাউজে কোন লোক চোখে পড়ল না। বেড়ার গায়ে সাইনবোর্ডে বড় বড় ইংরেজিতে অক্ষরে লেখা:

হোটেল নাইট শ্যাডো
প্রাইভেট প্রপার্টি

'গেটে তালা থাকলেই হয় এখন,' রবিন বলল, 'ঢুকতে আর হবে না।

'কি যে বলো না,' অস্বস্তি চাপা দিতে পারল না কোরি, 'তালা থাকবে কেন?'

'আছে কিনা দেখলেই তো হয়,' লম্বা পা ফেলে আগে আগে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়াল মুসা। ঠেলা দিল পাল্লায়।

নড়ল না ওটা।

একপাশের পুরানো আমলের হাতল দেখিয়ে বলল রবিন, 'ওটা ঘোরাও। খুলে যাবে।'

ঘুরিয়ে আবার ঠেলা দিল মুসা। খুলল না গেট।

'তালা দেয়া!' নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত থেকে সুটকেস দুটো ছেড়ে দিল কোরি। 'আমি জানতাম, এমন কোন কিছুই ঘটবে।'

'আরে এত অধৈর্য হচ্ছ কেন?' গেটহাউজের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখে বলল কিশোর, 'ফোন আছে। হোটেলে ফোন করে তালা খুলে দিতে বলব।'

আকাশের দিকে তাকাল কোরি। 'এত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে কেন?'

'অন্ধকার হচ্ছে না। গাছপালার ছায়ার জন্যে অন্ধকার লাগছে। আলো ঢুকতে পারছে না ঠিকমত, দেখছ না?'

সরু কাঁচের দরজা ঠেলে খুলে গেটহাউজে ঢুকল কিশোর। ফোন তুলে নিল। কুঁচকে ফেলল ভুরু।

দরজায় মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে মুসা। 'কি হয়েছে?'

'ডায়াল টোন নেই।'

'ইন্টারকম ফোন হতে পারে। হোটেলের রিসিভারে সরাসরি লাইন দেয়া।'

'তাতে কি? ডায়াল টোন তো থাকবে।' রিসিভার রেখে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর।

'তারমানে বাইরেই আটকা পড়লাম,' মুসার গলায় অস্বস্তি।

'পড়লে পড়ব,' দুষ্টু হাসি খেলে গেল কিশোরের মুখে। 'আজকের রাতটা নাহয় সৈকতেই কাটাব। বেড়াতেই তো এলাম।'

'ভাল হবে!' উত্তেজনায় চকচক করে উঠল কোরির চোখ।

'তা তো হবেই,' মুখ গোমড়া করে ফেলেছে মুসা। 'খাব কি?'

'অ্যাই, গেট খোলা যাবে,' বলে উঠল রবিন।

ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর, 'কি করে বুঝলে?'

'ওই যে, হুড়কো। ওটা সরালেই হয়।' কারও অপেক্ষা না করে নিজেই হুড়কোটা সরিয়ে দিল রবিন। খুলে ফেলল পাল্লা।

'চলো চলো, ঢুকে পড়ি!' চিৎকার করে তাড়াতাড়ি সুটকেস দুটো তুলে নিল কোরি। দেরি করলে যেন আবার বন্ধ হয়ে যাবে গেট।

'সৈকতে রাত কাটানো আর হলো না তাহলে আমাদের,' কিশোরের কণ্ঠে কৃত্রিম হতাশা।

'সারা গ্রীষ্মকালই পড়ে আছে সামনে,' গেটটা খুলতে পেরে খুব খুশি রবিন, 'যত ইচ্ছে সৈকতে রাত কাটাতে পারব।'

ঢাল বেয়ে উঠে চলল ওরা। দুধারে গাছপালা। মাথার ওপর পাখির কলরব। সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল একটা খরগোশ।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল হোটেলটা।

'দারুণ তো!' বলে উঠল রবিন।

দাঁড়িয়ে গেল সবাই। তাকিয়ে আছে। বিশাল পুরানো আমলের বাড়ি। সাদা দেয়াল। ঢালু লাল টিনের চাল। সাজানো লন। মূল বাড়ি থেকে দুটো শাখা বেরিয়ে উঠে গেছে দুদিকের পাহাড় চূড়ায়। বড় লাল সদর দরজাটার দুদিকে দুটো পর্দা টানা বারান্দা। দুই সারি করে চেয়ার পাতা।

আরও কাছে এগিয়ে হোটেলের পেছনে উপসাগরটা চোখে পড়ল ওদের। কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে সৈকতে। ছোট ডকে কয়েকটা নৌকা বাঁধা।

'খাইছে! দারুণ একটা সৈকত,' চোখ বড় বড় করে বলল মুসা।

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'খুব সুন্দর।'

'আন্ট জোয়ালিন যতটা বলেছে, তারচেয়ে সুন্দর,' হাঁ করে তাকিয়ে আছে কোরি।

'ওই দেখো একটা সুইমিং পুল,' হাত তুলল রবিন। 'কত্তবড় দেখেছ! পেছনের ওটা কি? পুলহাউজ নাকি?'

'কিন্তু লোকজন তো কাউকে দেখছি না,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর।

সামনে বিছিয়ে থাকা রাজকীয় হোটেলটার দিকে তাকিয়ে আছে কোরি। 'তাই তো!'

'পুলেও কেউ নেই।'

'ডিনারে বসেছে হয়তো,' মুসা বলল। 'আমারও এখন ওখানেই বসার ইচ্ছে।'

'কিন্তু আলো কই? ঘরে আলো নেই। বারান্দায় কেউ নেই। সৈকতে কেউ হাঁটছে না। হোটেলের সামনেও নেই কেউ। অস্বাভাবিক লাগছে না?'

'তাই তো!' বলল কোরি।

মুখ দেখে মনে হলো চিন্তায় পড়ে গেছে কিশোর।

দামী পাথরে তৈরি সিঁড়ি বেয়ে লাল দরজাটার কাছে উঠে গেল ওরা। ডাবল ডোর। বিশাল কাঠামো। দরজা খোলার চেষ্টা করল কোরি। খুলল না। বেল বাজাল শেষে

বাড়ির ভেতরে ঘণ্টা বাজল কোনখানে।

দুই মিনিট অপেক্ষা করল কোরি। তারপর আবার বাজাল।

কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হলো পাল্লা ফ্যাকাসে চেহারার এক প্রৌঢ়কে উঁকি দিতে দেখা গেল। উষ্কখুষ্ক চুল। বিরক্তমুখে ওদের দিকে তাকিয়ে খড়খড়ে

শুকনো গলায় বলল, 'যাও এখন। হোটেল বন্ধ।'
দরজাটা টেনে আবার লাগিয়ে দিল সে।

তিন

চিন্তিত ভঙ্গিতে লাল দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।
রবিন বলল, 'ভুল হোটেলে চলে এলাম না তো?'
দরজার পাশে দেয়ালে গাঁথা ব্রোঞ্জের চকচকে প্লেটটা দেখাল কিশোর। তাতে লেখা:

হোটেল নাইটশ্যাডো
এসটাবলিশড ১৮৫৫

'এক নামের দুটো হোটেল আছে তাহলে,' বলল রবিন। 'চলো, আমাদেরটা খুঁজে বের করি।'
হাত নেড়ে মুসা বলল, 'আরে নাহ্, এত ছোট দ্বীপ। আর হোটেল তুলবে কোথায়? তা-ও আবার এক নামে দুটো। এটাই।'
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজের সুটকেসে লাথি মারল কোরি, 'নাহ্, কিছু বুঝতে পারছি না। কোন রকম ফাঁক রাখেননি আন্ট জোয়ালিন। ফোনে কয়েকবার করে কথা বলেছেন হোটেলের মালিকের সঙ্গে...'
'কিন্তু এখানে তো লোকই নেই,' মুসা বলল। 'খালি হোটেল। বোর্ডার নেই। হোটেল বন্ধ। লোকটা ঠিকই বলেছে।'
'আর কি কর্কশ গলা লোকটার,' নাক কুঁচকাল রবিন। 'আরেকটু ভাল করে বলতে পারল না?'
'আমার কি মনে হয় জানো?' কোরি বলল। 'লোকটা নিশ্চয় মাটির নিচের ঘরে কোন দানব বানাচ্ছে। আজ রাতে প্রাণ সঞ্চার করবে ওটাতে। তাই কারও নাক গলানো পছন্দ করছে না।'
চমকে গেল মুসা। 'খাইছে! ফ্রাঙ্কেনস্টাইন! লোকটাকে লাগলও কিন্তু ডক্টর...'
'আরে দূর, থামো তো!' হাত নেড়ে থামিয়ে দিল ওকে কিশোর। 'কিসের মধ্যে কি। জ্বালাবে তোমরা, বুঝতে পারছি।'
ওদেরকে অবাক করে আবার হাঁ হয়ে গেল দরজাটা লম্বা, সুদর্শন চেহারার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা এলোমেলো চুল, সাদা গোঁফ। গায়ে সাদা সাফারি শার্ট, পরনে সাদা প্যান্ট। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। চোখের কালো মণি দুটো ঝিলমিল করে উঠল তারার মত।
'গুড ইভনিং,' ভারী গমগমে কণ্ঠস্বর। হাসিটা মোছেনি মুখ থেকে। ওদের দিকে তাকিয়ে পরিচিত কাউকে খুঁজলেন যেন।
কথা বলতে গেল কোরি। ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন তিনি, 'আমার

চাকর উলফের ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না। তোমাদের বয়েসী ছেলেমেয়েদের ও পছন্দ করে না।' কোরির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের এখানে একা দেখে আমারও অবাক লাগছে। জোয়ালিন এল না? ওরও তো আসার কথা ছিল।'

'হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ল,' জবাব দিল কোরি। 'শোরটাউনে ছোটখালার বাড়িতে আছে। আমাদের চলে আসতে বলল। কাল শরীর ভাল হলে আন্টি আসবে। আপনাকে ফোন করে বলেনি কিছু?'

'ও, তুমি নিশ্চয় কোরি,' কোরির প্রশ্নের জবাব দিলেন না তিনি। লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকালেন। 'চেহারায় অনেক মিল আছে।'

'থ্যাংক ইউ,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলে কোনমতে হাতটা ছাড়িয়ে নিল কোরি।

'এক্সকিউজ মী। আমিও তো উলফের মত অভদ্র হয়ে গেলাম দেখি। ঢুকতেই দিচ্ছি না তোমাদের,' বলে তাড়াতাড়ি দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। 'নিজের পরিচয়টা দিয়েই ফেলি। আমি ব্যারন রোজার সাইমন ডি মেলবয়েস। মেলবয়েস দি থার্ড। এই হোটেলের মালিক।'

'রোজার সাইমন মেলবয়েস?' ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন। 'ব্ল্যাক ফরেস্ট টাউনের গোস্ট লেনে আমাদের একটা বাড়ি আছে। সেখানে পথের মাথায় একটা অনেক বড় পোড়া বাড়ি...'

'ওটা ছিল আমার দাদার ভাইয়ের,' মেলবয়েস বললেন। 'রহস্যময় একজন মানুষ ছিলেন তিনি, নিশ্চয় শুনেছ। ব্ল্যাক ফরেস্টে বহুদিন যাই না। এখানেই থাকি এখন। অনেক বদলে গেছে নাকি ব্ল্যাক ফরেস্ট?'

'খুব একটা না।'

'ব্ল্যাক ফরেস্ট গোরস্থানের লাশেরা সব এখনও কফিনেই রয়েছে তো?' মাথা পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে, চোখ বুজে হেসে উঠলেন মেলবয়েস। 'কেন এ প্রশ্ন করলাম নিশ্চয় বুঝতে পারছ। ওখানকার লাশ মাঝে মাঝেই ভূত হয়ে কফিন থেকে বেরিয়ে আসার বদনাম আছে তো।'

পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর কোরি। চোখে অস্বস্তি।

সামনের লবিতে ঢুকল সবাই। চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। বিশাল লবি। প্রচুর আসবাবপত্র। ডার্ক উডের দেয়াল। কাঠের তৈরি বড় বড় কড়িবরগা। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল। ডার্ক উড, নরম মখমল আর চামড়ার গদির ছড়াছড়ি। হোটেলটাকে গ্রীষ্মাবাস না বলে হান্টিং লজ বললেই মানায় ভাল।

'ব্যাগ-সুটকেসগুলো এখানেই রেখে দাও,' মেলবয়েস বললেন। 'তোমাদের ঘর গোছাচ্ছে উলফ। গুছিয়ে এসে এগুলো নিয়ে যাবে।'

'বোর্ডাররা কই?' জানতে চাইল কোরি।

'নেই। হোটেল বন্ধ।' গোঁফের এককোণ ধরে টানতে টানতে কোরির দিকে তাকিয়ে বললেন মেলবয়েস। বোঝার চেষ্টা করলেন ওর কি প্রতিক্রিয়া

হয়। 'তোমার আন্টি আমার চিঠি পায়নি?'

'চিঠি?'

'হ্যাঁ। গত সপ্তা থেকে ফোন খারাপ। সেজন্যে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। হোটেলের ডাইনিং রূম আর ওল্ড উইঙের কয়েকটা ঘর মেরামত করতে হচ্ছে আমাদের। নতুন করে আসবাব দেব ঘরে ঘরে, জোয়ালিন জানে। এতদিনে শেষ হয়ে যেত কাজ। কিন্তু কাজের মাঝখানে হঠাৎ করে চলে গেল ওরা। জোয়ালিনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম, আরও দু'তিন সপ্তা পরে আসে যেন তোমাদের নিয়ে। ততদিনে কাজ শেষ হয়ে যাবে আমাদের। হোটেল চালু করে ফেলব।'

'তারমানে চিঠিটা পায়নি আন্টি,' হতাশ কণ্ঠে বলল কোরি। 'শুধু শুধুই কষ্ট করে এলাম আমরা এতটা পথ।'

'অত দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই,' মেলবয়েস বললেন। 'কাল বিকেলে লঞ্চ না আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে থাকো। উলফ খুব ভাল রান্না করতে পারে। খাওয়ার অসুবিধে হবে না তোমাদের। ইচ্ছে করলে সুইমিং পুল আর সৈকতে সাঁতারও কাটতে পারবে।'

কিন্তু মন ভাল হলো না কোরির। কত কিছুই না করবে ভেবে রেখেছিল। সৈকতে রাত কাটানো, চিংড়ি ধরে কয়লার আগুনে ঝলসে খাওয়া, অনেক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হই-চই করে পার্টি দেয়া, সাগরে সাঁতার কাটা, আরও কত কি। কিন্তু সব গেল। গরমের ছুটিটাই মাটি।

'তোমরা খেয়ে বেরিয়েছ?' জানতে চাইলেন মেলবয়েস।

'না,' সারারাত না খেয়ে থাকার ভয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিল মুসা।

ওর ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল রবিন আর কিশোর। কোরিও হেসে ফেলল।

'এসো, ডাইনিং রূমে,' বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে জমিদারি চালে হাঁটতে শুরু করলেন মেলবয়েস। 'উলফকে বলি কিছু রান্না করে দিতে।'

অনেক বড় কার্পেট বিছানো একটা ঘরে ঢুকলেন তিনি। সুইচ টিপে কয়েকটা ঝাড়বাতি জেলে দিলেন। ঘরের একধারে বড় জানালার পাশে দুটো লম্বা টেবিল পাতা। টেবিলক্লথে ঢাকা। চীনামাটি আর রূপায় তৈরি প্রচুর কাপ-প্লেট, গ্লাস-বাটি সাজিয়ে রাখা। ঘরে আরও অনেকগুলো টেবিল আছে। ওগুলোর দুই ধারে যেসব চেয়ার ছিল, সব উল্টে রাখা হয়েছে। বাঁয়ের দেয়ালের কাছে বাঁশ বাঁধা। কাঠের মঞ্চ। দাগ লাগা ক্যানভাসের কাপড় ঝুলে আছে। দেয়ালের কাগজ ছেঁড়া। ছাতের খানিকটা জায়গার প্লাস্টার খসানো। রাজমিস্ত্রিরা কাজ শেষ না করেই চলে গেছে বোঝা যায়।

সেদিকে দেখিয়ে গজগজ করে বললেন মেলবয়েস, 'আর সপ্তা দুই কাজ করলেই হয়ে যেত। কিন্তু বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে শোরটাউনের এক শয়তান লোক বিল্ডিং মেরামতের জন্যে ডেকে নিয়ে গেছে ওদের। কবে যে ফিরে আসবে এখন, কোন ঠিক নেই।'

ডাইনিং রূমের পেছনের দেয়ালে বিশাল এক জানালা। সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। 'আরিব্বাবা, কি দেখা যাচ্ছে!'

সূর্য ডুবছে। পেছনের আঙিনায় ছড়ানো অসংখ্য ডেক চেয়ার, টেবিল আর বড় বড় ছাতা। তার ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে সৈকত। কালো হয়ে আসা আকাশের পটভূমিতে রূপালী-ধূসর। তারও পরে উপসাগরের জল যেন জল নয়, শিল্পীর তুলিতে আঁকা বিচিত্র রঙের ছবি।

'এত সুন্দর!' পাশ থেকে বলে উঠল রবিন।

মুসা আর কোরিও দেখছে অপরূপ সূর্যাস্ত।

পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন মেলবয়েস, 'কোরি, তোমার আন্টির শরীর কি খুব বেশি খারাপ?'

'কি জানি! ডাক্তার ডাকতে তো কোনমতেই রাজি হলো না। একটা ফোন করতে পারলে জানা যেত।'

'পারবে। কাল সকালে। লাইন ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু হোটেলের সুইচবোর্ড নষ্ট। পাইরেট আইল্যান্ড থেকে কাল লোক এসে ঠিক করে দিয়ে যাবার কথা।'

কাশতে কাশতে ঘরে ঢুকল উলফ। সাদা রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছল। জানালার কাছে দাঁড়িয়েই ওর দিকে ফিরে তাকাল সবাই।

বেঁটে, রোগাপাতলা একজন মানুষ। কড়া মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা খাটো হাতা সাদা শার্ট গায়ে, পরনে কালো প্যান্ট। কালো চুলের ডগা এমন করে মাথার দুই পাশে ছড়িয়ে আছে, যেন কতদিন ধরে আঁচড়ায় না। চোখা চেহারা, ছোট ছোট ধূসর চোখ, খাড়া নাক। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আছে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আশপাশে যা কিছু দেখছে সব কিছুতেই তার বিরক্তি।

'ও আমাদের উলফ,' হেসে পরিচয় করিয়ে দিলেন মেলবয়েস, 'আগেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সাক্ষাৎকারটা নিশ্চয় পছন্দ হয়নি তোমাদের?'

লাল হয়ে গেল উলফ। কিন্তু তার চেহারার ভাব বদল হলো না।

'উলফ,' মেলবয়েস বললেন, 'আমাদের মেহমানদের খিদে পেয়েছে। রান্নাঘরে কি আছে?'

'মুরগীর মাংস,' অনেকটা চিঁ-চিঁ করে পাতলা গলায় কথা বলে, মনিবের ভারী গলার ঠিক উল্টো। 'সালাদও বানিয়ে দেয়া যায়।' এমন ভঙ্গিতে শেষ কথাটা বলল সে, যেন বানানো না লাগলেই খুশি হত।

'খুব ভাল,' উলফের ইচ্ছার পরোয়া করলেন না ব্যারন। বিশাল হাত নেড়ে প্রায় মুরগী খেদানোর মত করে ওকে তাড়ালেন ঘর থেকে।

মাথা নিচু করে কোনদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের বড় দরজাটার দিকে চলে গেল উলফ।

চার

'বসো তোমরা,' একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন ব্যারন। 'কথা বলতে ভাল

লাগছে। বোর্ডাররা চলে যাওয়ার পর খুব নির্জন হয়ে পড়েছে জায়গাটা। হোটেলে যখন লোক গমগম করে, দারুণ ভাল লাগে আমার।'

চেয়ার টেনে বসল কিশোর। ব্যারনের দিকে তাকাল।

'জুলাইয়ের শেষ দিকে আশা করি আবার চালু করে ফেলতে পারব,' বললেন তিনি। 'যদি ঠিকমত ফিরে আসে শ্রমিকরা। আমি আর আমার ভাই মিলারের ধারণা ছিল, মার্চে কাজ ধরলে গরমের ট্যুরিস্ট সীজনের আগেই সেরে ফেলতে পারব। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। ব্যাটারা যে টাকার লোভে এভাবে আমাদের ডুবিয়ে দিয়ে পালাবে ভাবতেই পারিনি।'

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমার ভাই মিলার খুব মেজাজী মানুষ। সব সময় বিষণ্ণতায় ভোগে।' কালো হয়ে গেল তাঁর মুখ। 'তা ছাড়া রোগটা ইদানীং অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। বেশি মানুষ থাকলে নিচেই নামে না। অনেকটা সেকারণে, তাকে কিছুটা শান্তি দেয়ার জন্যেই বলতে পারো হোটেলটা কিছু দিনের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই সুযোগে মেরামতটা সেরে ফেলব। এভাবে বন্ধ করলে ব্যবসার বিরাট ক্ষতি। কিন্তু কি করব? ভাই আগে না টাকা…'

ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এল উলফ।

একটা প্লেটে বড় এক টুকরো মাংস তুলে নিল মুসা। 'আমরা আপনাদের সাহায্য করতে পারি। দেয়াল মেরামতের কিছু কিছু কাজ করে দিতে পারব।'

'হ্যাঁ,' সালাদের বাটি থেকে চামচ দিয়ে নিজের প্লেটে সালাদ তুলে নিতে লাগল রবিন। 'আন্ট জোয়ালিন আমাদের বলেছেন, হোটেলের মালিকের সঙ্গে, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে নাকি কথা হয়েছে তাঁর—গরমকালটা হোটেলে পার্ট টাইম চাকরি দেয়া হবে আমাদের। তাতে থাকাখাওয়ার জন্যে আর ভাবনা থাকবে না। পকেট থেকে নগদ পয়সা খরচ করতে হবে না।'

'বলেছি হয়তো। ঠিক মনে করতে পারছি না,' ব্যারন বললেন। 'যাই হোক, তোমাদের প্রস্তাবটা কিন্তু মন্দ না।'

'কিন্তু আমার কাছে মন্দই লাগছে,' মুখ নিচু করে বলল উলফ। 'যার কাজ তাকেই সাজে। অপেশাদার দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ হয় না।'

'কাজটা তো কঠিন কিছু নয়,' তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন ব্যারন। 'দেয়াল থেকে কিছু কাগজ ছিঁড়তে হবে…আরও কিছু টুকটাক…আমার তো ধারণা ওই পয়সালোভী চামার শ্রমিকগুলোর চেয়ে ভাল পারবে এরা।'

শক্ত হয়ে গেল উলফের চোয়াল। 'কাজটা নিরাপদ নয় মোটেও,' কোরির দিকে তাকাল সে।

চমকে গেল কোরি। কি বলতে চায় লোকটা? মিস্ত্রির কাজে নিরাপত্তার প্রশ্ন কেন উঠছে?

'পরের লঞ্চে ওদের ফিরে যাওয়াটাই ভাল মনে করি আমি,' উলফ বলল।

'কিন্তু আমি মনে করি না,' তর্ক শুরু করলেন ব্যারন। 'কয়েকটা ছেলেমেয়েকে কাজ করতে দেখলে খুশিই হবে মিলার।' জানালা দিয়ে বাইরের কালো হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। হাসি হাসি

ভঙ্গিটা চলে গেছে তাঁর।

'না। চলে যাওয়াই ভাল,' থেমে থেমে একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল উলফ। যেন কোন ছোট্ট ছেলেকে বোঝাচ্ছে।

'না। ভাল নয়। বরং কয়েকটা ছেলেমেয়েকে এখানে কাজ করতে দেখলেই আমার ভাল লাগবে,' কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হলো না ব্যারনের।

কান খাড়া করে ফেলল কিশোর। ব্যারন একবার বললেন 'মিলারের' ভাল লাগবে। এখন বলছেন 'আমার' ভাল লাগবে। কথাবার্তাগুলো কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে!

'সব কিছু মেরামত করে আবার যখন হোটেল খুলব আমরা,' উলফ বলল, 'অনেক ছেলেমেয়ে আসবে তখন।' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠ। অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না মুসার। এসেছে যখন, কয়েকদিন থেকে যেতে পারলে ভাল হত। ব্যারনকে রাজি করানোর জন্যে বলল, 'আমাদের মধ্যে কিন্তু কোন ফাঁকি পাবেন না। আন্তরিক ভাবে খাটব আমরা।'

রবিনেরও ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। 'আমাদের কাজ দেখে আপনি খুশি হবেন, কথা দিতে পারি।'

'ঠিক আছে তাহলে,' গোঁফের কোণ ধরে এক টান মারলেন ব্যারন। উলফের দিকে তাকালেন, 'ওরা থাকছে। কাঠমিস্ত্রির কাজ করবে। আমি ওদের বহাল করলাম।'

কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে উলফের দিকে তাকাল কিশোর।

কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। ভাবলেশহীন চেহারা। খুদে খুদে ধূসর চোখে শূন্য দৃষ্টি। একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল খালি ট্রে-টা। চি-চি করে বলল, 'ঠিক আছে, আমি যাই।'

খুশি হয়ে উঠল মুসা আর রবিন। কোরির মুখেও হাসি। একসঙ্গে কলরব শুরু করল তিনজনে। কিশোর তাকিয়ে আছে ব্যারনের দিকে। একটা হাত তুললেন তিনি। হাসিমুখে বললেন, 'আমি আশা করব আন্তরিক ভাবেই খাটবে তোমরা। তবে তোমাদের সময় সবটুকু কেড়ে নিতে চাই না আমি। কাজের সময় কাজ। বাকি সময়টা পুলে সাঁতার কেটে, সৈকতে বেড়িয়ে কাটাতে পারবে, বাধা নেই। ফুর্তি করার জন্যেই তো এসেছ তোমরা, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' সমস্বরে চিৎকার করে উঠল মুসা, রবিন আর কোরি।

কিশোরের দিকে তাকালেন ব্যারন, 'তুমি কিছু বলছ না কেন?'

'অ্যাঁ!...হ্যাঁ, আমারও ভাল লাগবে।'

'লাগারই কথা। এখানে তোমাদের বয়েসী যারা বেড়াতে আসে, সবারই ভাল লাগে।'

মুখের হাসিটা বজায় রেখে পেছনে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন ব্যারন। লম্বা, সাদা চুলে আঙুল চালালেন। কোরির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল তোমার আন্টির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করব। ও না আসাতে খারাপই

লাগছে।'

'কালকে নাগাদ চলে আসতে পারে। ভায়োলা আন্টি খুব ভাল নার্স।'

ট্রে রেখে এঁটো বাসন-পেয়ালা নিয়ে যেতে ফিরে আসছে উলফ। তাকে বললেন ব্যারন, 'শোনো, ওদের ঘর দেখিয়ে দাও।'

জবাব না দিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল উলফ। বাসন-পেয়ালাগুলো জড়ো করতে গিয়ে ইচ্ছে করে আছড়ে ফেলতে লাগল একটার ওপর আরেকটা।

'নিউ সেকশনে ওদের থাকার ব্যবস্থা করেছ নাকি?' জানতে চাইলেন ব্যারন।

নিচের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল উলফ, 'না, ওল্ড উইং।'

পলকের জন্যে হাসিটা চলে গেল ব্যারনের মুখ থেকে। পরক্ষণে ফিরে এল আবার। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাতটা গিয়ে সেঁটে ঘুম দাও। কাল সকালে দেখা হবে। তখন কাজের কথা বলব।'

তাঁকে ধন্যবাদ জানাল ছেলেমেয়েরা। তারপর কথা বলতে বলতে উলফের পেছনে চলল একটা করিডর ধরে। আলো খুব কম এখানে। কীটনাশক আর একধরনের বদ্ধ ভাপসা গন্ধ বাতাসে।

পুরানো বাড়িতে এ রকম গন্ধ থাকে, জানে মুসা। আর ওগুলোই হয় ভূতের আস্তানা।

কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে চলেছে উলফ। একটা মোড় ঘুরল। আরেকটা লম্বা করিডর পেরোল। দুই ধারে সারি সারি বদ্ধ দরজা। আবার একটা মোড় ঘুরল। থামল না।

অবাক লাগছে মুসার। কোথায় ওদের নিয়ে চলেছে লোকটা?

অবশেষে একটা খোলা দরজার সামনে থামল উলফ। দরজায় ব্রোঞ্জের প্লেটে নম্বর লেখা রয়েছে: ১৩২—সি।

'বাইরে থেকে যতটা মনে হয়,' মুসা বলল, 'ভেতরটা তারচেয়ে অনেক বড়।'

তার মন্তব্যের জবাব দিল না উলফ। 'এখান থেকে চারটা ঘর তোমাদের জন্যে রেডি করেছি। কে কোনটাতে থাকবে নিজেরাই ঠিক করে নাও।'

'থ্যাংক ইউ,' মোলায়েম স্বরে বলল কোরি।

'দেখো, তোমাদের এখানে থাকাটা আমার ভাল লাগছে না,' উলফ বলল।

'কি?'

'এখানে থাকা তোমাদের জন্যে বিপজ্জনক।'

'কি বলতে চান?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ছুতোর মিস্ত্রির কাজ,' কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল উলফ, 'খুব কঠিন। মিস্টার মেলবয়েস বুঝতে পারছেন না।'

'কিন্তু খাটতে তো আমাদের আপত্তি নেই,' মুসা বলল, 'যত কঠিনই হোক, আমরা করব।'

'এখানে থাকতে ভাল লাগবে না তোমাদের,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে উলফ। 'খালি থাকলে সাংঘাতিক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এই বাড়ি। পুরানো তো। পুরানো বাড়ি সব সময়ই খারাপ।'

'আপনারা থাকতে পারলে আমরাও পারব, কোন অসুবিধে হবে না,' কোরি বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না…নানা রকম ব্যাপার ঘটে এখানে, বিশেষ করে হোটেলের গেস্টদের বেলায়…এমন সব ব্যাপার যা তোমাদের বলতে পারছি না,' কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এল উলফের।

'জায়গাটাতে কোন সমস্যা আছে নাকি?' জানতে চাইল কোরি। 'ভূতের উপদ্রব?'

তাকিয়ে রইল উলফ কোরির দিকে। কতটা বলা যায় ওদের চিন্তা করছে যেন। 'দেখো, আমি তোমাদের সাবধান করছি…'

'আসল কথা বলছেন না কেন? ভূত আছে? দেখেছেন?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল উলফ। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'অদ্ভুত অনেক কিছুই দেখতে হয় আমাকে,' রহস্যময়, শীতল শোনাল ওর কণ্ঠ। বিচিত্র হাসি ফুটল পাতলা ঠোঁটে। 'ভূত বিশ্বাস করো নাকি তোমরা?'

কিশোর বা রবিন কিছু বলে ফেলার আগেই তাড়াতাড়ি বলল মুসা, 'করি।'

কোরি বলল, 'প্লীজ, বলুন না, কি দেখেছেন?'

'বাঁচতে চাইলে এখান থেকে চলে যাও,' কোরির প্রশ্নের জবাব দিল না উলফ। 'কালই।'

ছায়ায় ঢাকা পড়েছে ওর মুখের বেশির ভাগ অংশ। চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। তবে ওর কণ্ঠস্বরই বলে দিল, মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না সে। আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আর একটা কথাও না বলে যেন নিঃশব্দে ভেসে চলে গেল অন্ধকার, শূন্য করিডর ধরে।

পাঁচ

'কোরি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল। চোখে মিররড্ সানগ্লাস। কাঁচের ভেতর দিয়ে মুসার দিকে তাকিয়ে আছে। সৈকতের কিনারে গোড়ালি পানিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে মুসা।

'সকালে নাস্তার সময় এল না,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল কিশোর। 'দুপুরে খাওয়ার সময়ও দেখা নেই। গেল কোথায়?'

'গেছে হয়তো কোথাও ভূতপ্রেত খুঁজতে,' ঠোঁট উল্টে বলল রবিন। 'কিংবা হোটেলের পুরানো কোন কামরায় ধ্যানে বসে প্রেতাত্মার সঙ্গে

যোগাযোগের চেষ্টা করছে। ওর তো এইই কাজ।'

'মেয়েটা কেমন অদ্ভুত...'

'আমি শুনে ফেলেছি!' পেছন থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

চিত হয়ে ছিল কিশোর। লাফ দিয়ে উঠে বসে ফিরে তাকাল। গোলাপী বিকিনি পরেছে কোরি। হাতে একটা ক্যানভাসের বড় বীচ ব্যাগ। চোখেমুখে রাগ।

'কোরি...না বলে কোথায় চলে গেলে তুমি...আমরা এদিকে চিন্তায় বাঁচি না...'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি। আমি কেমন অদ্ভুত, তাই না?'

'কোরি...'

'আমি পাগল? আধিভৌতিক ব্যাপারে আমার কৌতূহল তোমাদের কাছে আমাকে হাস্যকর করে তুলেছে, এই তো বলতে চাও?'

'তোমাকে হাস্যকর না করলেও,' জবাব দিল রবিন, 'তোমার কাজকর্মকে যে হাস্যকর করেছে, এটা ঠিক।'

ভুরু কুঁচকে গেল কোরির।

'আরে বসো বসো,' নিজের পাশে মাটিতে বিছানো ক্যানভাসে চাপড় দিল কিশোর। 'এই রবিন, বাজে কথা বোলো না তো। দেখি সরো, কোরিকে জায়গা দাও।...বসো, কোরি। এত সুন্দর দিনটা রাগারাগি করে নষ্ট কোরো না।'

'কিন্তু তাই বলে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি সহ্য করব?' মেজাজ দেখিয়ে ক্যানভাসের ওপর বসে পড়ল কোরি।

'সারাদিন ছিলে কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

'ঘুম থেকেই উঠেছি দেরি করে,' ব্যাগ থেকে বড় একটা তোয়ালে টেনে বের করল কোরি। 'তারপর হোটেলের মধ্যে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করেছি খানিকক্ষণ। আন্ট জোয়ালিনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি, পারিনি। মেলবয়েস বললেন, লঞ্চ আসার সময় হলে গাড়ি নিয়ে ডকে যাবেন আন্টিকে নিয়ে আসতে।'

'যদি আজকে আসেন।'

'হ্যাঁ।'

'জায়গাটা কিন্তু ভারি সুন্দর!' কিশোরের পাশে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন।

কোরি তখনও নানা জিনিস বের করছে। সানট্যান লোশনের শিশিটা বের করে রাখল একপাশে। 'সাঁতার কাটতে যাবে কেউ?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার বসে থাকতেই ভাল লাগছে। মুসাকে গিয়ে বলো, তোমার সঙ্গে নামবে।'

'দেখো, একটা পাখি,' ওপর দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'ইস্, আমিও যদি ওরকম করে উড়তে পারতাম!'

কোরি আর কিশোর দুজনেই মুখ তুলে তাকাল। ধূসর আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে বড় একটা পাখি।

'বাজপাখি,' কোরি বলল।

'এখানে বাজও আছে নাকি?' পাখিটার সঙ্গে সঙ্গে নজর সরছে তার। চশমার কাঁচে ফ্যাকাসে নীল আকাশের প্রতিবিম্ব।

'মনে হয় না,' কোরি বলল। পাখিটাকে বেমানান লাগছে এখানে। এই দ্বীপের সব কিছু রঙিন, ঝলমলে, সুন্দর। 'অন্য কোনখান থেকে উড়ে এসেছে হয়তো মাছের আশায়।' ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো বাজপাখির ডানায় ভর করে অবাঞ্ছিত অশুভ কোন কিছু কালো ছায়া ফেলতে এসেছে দ্বীপের সাদা সৈকতে। ভাবনাটাকে জোর করে মন থেকে তাড়াল সে।

পানিতে দাঁড়িয়ে আছে এখনও মুসা। ওদের দিকে পেছন করে। নীলচে-সবুজ পানি এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে বালি। চিকচিক করছে রোদে। ওর ডানে ঢেউয়ে ক্রমাগত দোল খাচ্ছে নিচু একটা কাঠের ডকে বাঁধা দুটো ক্যানু। ওদের দুদিকে ধনুকের মত গোল হয়ে বেঁকে গেছে সৈকত।

পেছনে বালির টিলার ওপরে রয়েছে হোটেলটা। সাদা দুর্গের মত বিছিয়ে থেকে যেন পাহারা দিচ্ছে সবকিছুকে। ডাইনিং রুমের বড় জানালার কাঁচে ঝিলিক দিচ্ছে বিকেলের সোনালি রোদ। বাড়িটার দুদিক থেকে শুরু হয়েছে পাইন বন। নীলচে-সবুজ। মৃদু বাতাসে সুগন্ধ ছড়িয়ে দুলছে যেন তন্দ্রার ঘোরে।

'উফ্, বিশ্বাস করতে পারছি না আমি!' দেখতে দেখতে বলে উঠল কোরি। 'এত সুন্দর। ভাল লাগছে অন্য কেউ নেই দেখে। স্বাধীনভাবে দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে পারব আমরা। যা ইচ্ছে করতে পারব।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো রবিন। 'আমার কাছে তো স্বর্গ মনে হচ্ছে।'

হাত বাড়িয়ে একমুঠো বালি তুলে নিয়ে ঝরঝর করে নিজের পায়ে ছাড়তে লাগল কোরি। 'আজ যে আমাদের ছুটি দিয়ে দিয়েছেন এজন্যে মিস্টার মেলবয়েসকে একটা ধন্যবাদ দেয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল লোক। গায়ে জমিদারের রক্ত আছে দেখেই বোঝা যায়।'

'কিন্তু উলফের ব্যাপারটা কি বলো তো? এরকম ভদ্র মালিকের ওরকম বুনো চাকর! উদ্ভট স্বভাব!'

'সকালে নাস্তা দেয়ার সময় মুখটাকে কিরকম করে রেখেছিল দেখেছ? একেবারে মরা চিংড়ি।'

'ওর সমস্যাটা কি? কাল রাতে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইল কেন আমাদের?'

'ভূত আছে ইঙ্গিত দিল,' কোরি বলল, 'কিন্তু খোলাসা করল না কিছুই।'

'আমার তো মনে হলো অন্য ইঙ্গিত দিয়েছে,' কিশোর বলল।

'অন্য কি?'

'বুঝতে পারলাম না।'

'কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভূতের কথাই বলেছে। এই দ্বীপে ভূত থাকাটা

অসম্ভব কিছু নয়। সাড়ে তিনশো বছর আগে সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে এসে এখানে আস্তানা গেড়েছে মানুষ। খুনখারাপি হয়েছে প্রচুর। প্রেতাত্মা থাকতেই পারে। শোরটাউনের আশেপাশে যত পুরানো বাড়ি, সরাইখানা, দুর্গ আর হোটেল আছে, সবগুলোতে ভূতের বদনাম। আমার মনে হয় না মিথ্যে কথা বলেছে উলফ, কিংবা আমাদের শুধু শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছে। কিছু না থাকলে আমাদের সাবধান করতে আসত না।'

আচমকা উঠে দাঁড়াল কোরি।

'কি হলো?' জানতে চাইল রবিন।

'একটা জিনিস ফেলে এসেছি।'

'কি?'

জবাব না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল কোরি। দ্রুত হেঁটে চলল হোটেলের দিকে।

সেদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল রবিন, 'উলফের মত কোরিও আরেকটা উদ্ভুটা চরিত্র...'

'আস্তে! শুনতে পেলে আবার রেগে যাবে।

'ওর সঙ্গে জিনার স্বভাবের অনেক মিল, তাই না?'

জবাব দিল না কিশোর।

★

সেদিন বিকেলে আকাশটাকে রক্তের রঙে রাঙিয়ে দিয়ে পাইন বনের আড়ালে যখন অস্ত গেল সূর্য, আকাশে দেখা দিল রূপালী চাঁদ, সৈকতে ফিরে এল আবার ওরা। ফুরফুরে বাতাস শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে।

'ইস্, কি একখান সূর্যাস্ত!' আবার বালিতে গড়িয়ে পড়ল রবিন। এভাবে গড়াগড়ি করার নেশা হয়ে গেছে যেন তার। আকাশের দিকে চোখ।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মুসা আর কিশোর। সাগরের পানিতে আকাশের প্রতিবিম্ব দেখছে।

'আমার কি মনে হচ্ছে জানো?' স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে কিশোরের সুন্দর দুটো চোখ। 'কোন স্বপ্নের জগতে পৌঁছে গেছি!'

কোরির হাতে ডোরাকাটা একটা চাদর। 'এই, ধরো তো একটু, চাদরটা বিছাই।'

চাদর বিছাতে ওকে সাহায্য করল কিশোর। দুই কোণে দুটো বড় পিকনিক বাস্কেট চাপা দিয়ে দিল যাতে বাতাসে উড়তে না পারে।

চাদরের ওপর বসে পড়ে একটা বাস্কেটের দিকে হাত বাড়াল মুসা, 'খিদে পেয়ে গেছে আমার। কি দিয়েছে উলফ?'

'উঁম...দাঁড়াও, অনুমান করতে দাও আমাকে,' কোরি বলল, 'কি হতে পারে? টিউনা মাছের স্যান্ডউইচ?'

ঢাকনা তুলল মুসা। ভেতরে তাকিয়ে বলল, 'হয়নি। আবার বলো।'

'গলদা চিংড়ি।'

'হ্যাঁ, হয়েছে। দারুণ সুগন্ধ! মুরগীর রোস্টও আছে।'

আরেকটা ঝুড়ির ঢাকনা সরাল রবিন। বড় এক পাত্র সালাদ বের করল। আর বড় বড় দুটো ফ্রেঞ্চ ব্রেড। গরম। আভন থেকে বের করেই ঝুড়িতে ভরে দিয়েছে উলফ।

'মুখ গোমড়া করে রাখুক আর যাই করুক,' নাক দিয়ে খাবারের সুগন্ধ টানতে টানতে বলল কোরি, 'খাবারগুলো ভালই দিচ্ছে।'

চীনামাটির বাসন, রূপার চামচ, কাপড়ের ন্যাপকিন বের করে চাদরে নামিয়ে রাখল রবিন। সুন্দর করে ওগুলো ঝুড়িতে সাজিয়ে দিয়েছে উলফ। দুটো মোমও দিয়েছে।

আকাশের লালিমা মুছে কালো হয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল হতে শুরু করেছে চাঁদ। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎ-ছল বাজনার মত লাগছে। খেতে আরম্ভ করল ওরা।

'সিনেমার মত লাগছে আমার কাছে!' কোরি বলল।

'এত সুন্দর দৃশ্য সিনেমাতে নেই,' বলল রবিন।

হোটেলের দিকে তাকাল কোরি। আকাশের পটভূমিতে কালো দেখাচ্ছে বাড়িটা। শুধু দোতলার দুটো জানালায় আলো জ্বলছে। তাকিয়ে রয়েছে যেন বেড়ালের চোখের মত।

'খাওয়ার পর সাঁতরাতে নামলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল মুসা।

'বেদিং স্যুট তো পরে আসিনি,' রবিন বলল।

'তাতে কি?' হাসল মুসা। 'খালি গায়ে নামব।'

'চাঁদনী রাতে সাগরে সাঁতার কাটার স্বপ্ন দেখেছি আমি বহুদিন,' কিশোর বলল।

'তার মানে তুমিও নামবে?'

'অসুবিধে কি?'

বালির ঢিবির ওপর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল কোরি, 'কে যেন আসছে!'

ফিরে তাকাল অন্য তিনজন। অন্ধকার ছায়ায় মিশে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মূর্তি।

ভয় পেয়ে গেল কোরি। জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে?'

ছয়

ছায়া থেকে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল মূর্তিটা।

অবাক হলো কোরি। 'মিস্টার মেলবয়েস!'

ঢিবির মাথায় দাঁড়িয়ে থেকে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়লেন তিনি। ধবধবে সাদা পোশাকে ভূতুড়ে লাগছে তাঁকে। ভয়টা এখনও কাটেনি কোরির। বিশ্বাস করতে পারছে না সত্যি মানুষ কিনা। পরীক্ষা করার জন্যে হাত নেড়ে

ডাকল, 'আসুন না?'

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে নেমে আসতে শুরু করলেন ব্যারন। খাওয়া বন্ধ করে মুসাও তাকিয়ে রয়েছে হাঁ করে। ভূত বুঝলে দেবে দৌড়।

কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। হাতে একটা মদের বোতল। আরেক হাতে গ্লাস।

'আন্টি জোয়ালিন এসেছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল কোরি।

'না,' জবাব দিলেন ব্যারন। 'লঞ্চ এসেছে, কিন্তু তোমার আন্টি আসেননি। অত ভয়ের কিছু নেই। সামান্য পেটব্যথা তো, সেরে যাবে। আরও একআধ দিন বোনের ওখানে কাটিয়ে আসার ইচ্ছে।'

'কিন্তু ফোন করল না কেন?'

'সকালে ফোন যখন খারাপ ছিল তখন হয়তো চেষ্টা করেছে। ফোন খারাপ ভেবে পরে আর করেনি। আজ রাতটা যাক, তাঁকে আর বিরক্ত করব না। কাল সকালে যদি না করে আমরাই খোঁজ নেব।' প্রসঙ্গটা বাদ দেয়ার জন্যে খাবারগুলোর ওপর চোখ বোলালেন তিনি। 'বাহ্, উলফ তো নাস্তাটাস্তা ভালই দিচ্ছে তোমাদেরকে।'

হেসে জবাব দিল কিশোর, 'নাস্তা নয়, একেবারে ভূরিভোজ।'

'উলফ কিন্তু আমাদের বাবুর্চি নয়। বাবুর্চির নাম মনিকা। আগামী শুক্রবারের আগে আসবে না।' মৃদু হেসে বললেন ব্যারন, 'এত কাজ একহাতে করতে হচ্ছে বলে অভিযোগের পর অভিযোগ করে চলেছে উলফ। তবে রান্না করতে তার খারাপ লাগছে না এটাও বুঝতে পারছি।'

'সে তো বোঝাই যাচ্ছে,' রুটি চিবাতে চিবাতে বলল মুসা। 'কিন্তু এত বেশি পেট ভরিয়ে রাখছে আমাদের, আলসে হয়ে যাচ্ছি। কাল কোন কাজই করতে পারব না।'

'হ্যাঁ, দশ পাউন্ড ওজন বেড়ে গেছে আমার,' কোরি বলল।

'ভয় নেই, কালই সেটা খসিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করব,' হেসে বললেন ব্যারন। চাদরের একধারে বসে বোতল থেকে মদ ঢাললেন গ্লাসে। গ্লাসটা তুলে ধরলেন ওদের দিকে। 'তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।'

লম্বা চুমুক দিলেন গ্লাসে। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মিলারও আমাদের সঙ্গে থাকলে এখন ভাল হতো,' আচমকা বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। 'কত করে বললাম আসতে। এল না।'

'আপনার ভাই কি অসুস্থ?' জানতে চাইল কিশোর।

প্রশ্নটা যেন অবাক করল ব্যারনকে। 'অসুস্থ? মোটেও না। অতিমাত্রায় বিষণ্ন। আমরা মেলবয়েসরা এমনিতেই একটু খেয়ালী।'

'শুনেছি আমি,' রবিন বলল। 'ব্ল্যাক ফরেস্টের সবাই জানে আপনার পূর্বপুরুষদের কাহিনী। আমাদের বাড়ির চিলেকোঠা থেকে মেলবয়েস ম্যানসন দেখা যায়।'

চোখ বুজে যেন পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলেন মেলবয়েস। 'হ্যাঁ, অনেক গল্প আছে ওদেরকে নিয়ে। ভয়ঙ্কর সা ...হিনী।'

চোখ মেলে তাকালেন রবিনের দিকে।

একঝলক হালকা বাতাস ওদের ঘিরে নেচে নেচে বয়ে গেল।

'রোজার মেলবয়েস কি আপনার দাদা ছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

আরেক চুমুক মদ খেলেন ব্যারন। 'না। আমার দাদার ভাই। আমার গ্রেট-আঙ্কেল।'

'তাঁর নামে নাম রাখা হলো কেন আপনার?' জানতে চাইল কোরি।

'তার নামে রাখা হয়েছে কথাটা ঠিক না,' বিচিত্র হাসি খেলে গেল ব্যারনের ঠোঁটে। চাঁদের আলোয় রহস্যময় দেখাল হাসিটা। 'আমার বাবার নামও ছিল রোজার।'

পাইনবনে ডেকে উঠল কি একটা জানোয়ার। দীর্ঘ, বিষণ্ণ চিৎকার।

'তাঁদের সম্পর্কে বলুন না কিছু,' অনুরোধ জানাল কোরি। শোনার জন্যে সামনে ঝুঁকে বসল।

'হ্যাঁ, বলুন না,' রবিনও আগ্রহী হয়ে উঠল। 'আসলে কি ঘটেছিল গোস্ট লেনের সেই পুরানো প্রাসাদটাতে?'

'আমিও খুব বেশি কিছু জানি না,' ব্যারন বললেন। 'আমার জন্মের বহু আগে ঘটেছিল সেসব ঘটনা।' বালির ঢিবির ওপরে হোটেলটার দিকে তাকালেন তিনি। 'মিলার এলে ভাল হতো। এসব গল্প আমার চেয়ে ভাল বলতে পারত সে।'

'আপনি যা পারেন বলুন,' শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে রবিন। 'পুড়ল কি করে বাড়িটা? রোজার মেলবয়েসের সম্পর্কে যা শোনা যায় সব কি সত্যি?'

শব্দ করে হাসলেন ব্যারন। গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন চাদরে। সব কটা চোখ এখন তাঁর দিকে। বাতাসে দুলে উঠে কাত হয়ে গেল মোমের শিখা। নিভু নিভু হলো, কিন্তু নিভল না।

রবিনের দিকে তাকালেন ব্যারন, 'তুমি নিশ্চয় শুনেছ, ব্ল্যাক ফরেস্টে প্রথম যারা বসতি করেছিল তাদের একজন ছিলেন আমার গ্রেট-আঙ্কেল রোজার মেলবয়েস। বিরাট ধনী ছিলেন তিনি। কোথায় পেয়েছিলেন এত টাকা কেউ জানে না। কোথা থেকে ব্ল্যাক ফরেস্টে গিয়েছিলেন তিনি, তা-ও জানে না কেউ।'

'দেখতে তিনি কেমন ছিলেন?' জিজ্ঞেস করল কোরি। 'আপনার মত?'

'তা-ও জানে না কেউ। আমাদের পরিবারের সবারই ছবি আছে, শুধু তাঁরটা বাদে। সেটাও আরেক রহস্য।'

গ্লাস তুলে চুমুক দিলেন তিনি। ঠোঁট চাটলেন। তারপর বললেন, 'বিশাল ওই প্রাসাদ শহর থেকে এতদূরে কেন বানালেন, সেটাও রহস্য। ব্ল্যাক ফরেস্টে তখনও আজকের মত শহর গড়ে ওঠেনি, ভাল কোন রাস্তা ছিল না। বনের মধ্যেই বাড়ি বানালেন তিনি। বাড়িতে যাওয়ার একটাই পথ ছিল, গাছপালার ভেতর দিয়ে সরু একটা রাস্তা। বাড়িটা বানানোর সময় শ্রমিকেরা যাতায়াতের জন্যে নিজেরাই তৈরি করেছিল রাস্তাটা।'

'গোপনীয়তা পছন্দ করতেন নাকি?' জানতে চাইল কিশোর।

'না···অন্তত ব্ল্যাক ফরেস্টে আসার পর প্রথমদিকে তো নয়ই। বরং রোজার মেলবয়েস আর তাঁর সুন্দরী স্ত্রী ভেরোনিকা ছিলেন শহরের প্রাণ। স. জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। প্রায়ই বড় বড় পার্টি দিতেন। লোক গমগম কর ত বাড়িতে।' মোমের আলোয় কমলা রঙ লাগছে ব্যারনের চেহারা। 'মেলবয়েসরা খুব বিখ্যাত ছিল তখন। লোকে পছন্দ করত তাদের। শহরটার জন্যে অনেক করেছে। লাইব্রেরির জন্যে টাকা দিয়েছেন রোজার মেলবয়েস, ব্ল্যাক ফরেস্টের প্রথম হাসপাতালটা তাঁর করা।'

গ্লাসে চুমুক দেয়ার জন্যে থামলেন ব্যারন।

কোরির দিকে তাকাল কিশোর। হতাশা দেখতে পেল ওর মুখে। যেন ভয়াবহ কোন ভূতের গল্প আশা করেছিল সে।

'রোজার আর ভেরোনিকার দুটো খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল,' ব্যারন বলতে লাগলেন আবার। 'মেয়েদের অসম্ভব পছন্দ করতেন রোজার। অতিরিক্ত। আর দশটা মেয়ের মত লেখাপড়া শেখার জন্যে স্কুলে যেতে দেননি ওদের। বাড়িতে টিচার রেখে দিয়েছিলেন। যা চাইত ওরা, দিয়ে দিতেন তিনি। কোন কিছুতেই না করতেন না। এক বছর এক মেয়ের জন্মদিনে ইউরোপ থেকে সমস্ত জন্তু-জানোয়ার সহ একটা আস্ত সার্কাস পার্টি ভাড়া করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

'অ্যাই, বাধা দিয়ো না তো!' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কোরি।

'আমার গ্রেট-আঙ্কেল মনে করেছিলেন, এত টাকা আছে যখন, জীবনটা বুঝি সুখেই কেটে যাবে,' সাগরের কালো পানির দিকে তাকিয়ে বললেন ব্যারন। কণ্ঠে বিষাদের ছোঁয়া। 'কিন্তু তা আর কাটল না। একদিন বনে খেলতে গিয়ে আর ফিরে এল না তাঁর দুই মেয়ে। রাতেই খোঁজাখুঁজি করা হলো। পাওয়া গেল না ওদের। পরদিন সকালেও না। সাত দিন পর বনের মধ্যে পাওয়া গেল ওদের লাশ। শরীরের মাংস আছে, কিন্তু হাড় নেই। কোন অদ্ভুত উপায়ে আস্ত বের করে নেয়া হয়েছে কঙ্কালটা।'

'তা কি করে সম্ভব?' বলে উঠল কিশোর।

'আমি জানি না। লোকে তো তাই বলে।'

'খুনীকে ধরতে পেরেছিল পুলিশ?' কোরি জিজ্ঞেস করল।

'আমি বলতে পারব না। পুলিশকে ওকাজ করার জন্যে আদৌ ডাকা হয়েছিল, তাই বা কে জানে,' রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিলেন ব্যারন। 'ওই ঘটনার পর থেকে আলো নিভে গেল প্রাসাদের। রাতে আর বাড়ির জানালায় আলো জ্বলতে দেখত না কেউ। সব বদলে গেল। ভেরোনিকাকে আর কোনদিন শহরে দেখা যায়নি। লোকে বলে, পুরো পাগল হয়ে গিয়েছিলেন নাকি তিনি। সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকতেন। কখনও বেরোতেন না। রাতের বেলা বাড়ির কাছে কেউ গেলে শুনতে পেত অদ্ভুত সব চিৎকার, চেঁচামেচি। তাদের ধারণা ভেরোনিকার ঘর থেকে আসত। আর মেলবয়েস? তাঁর যেন

জীব টাই থেমে গিয়েছিল। সমস্ত টাকা খুইয়ে ফেললেন তিনি। দামী দামী সমস্ত ছবি, জিনিসপত্র সব নীলামে উঠল, ঠেলা গাড়িতে ভরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁকেও এরপর আর কোনদিন শহরে দেখা যায়নি। তারপর একদিন রহস্যময় ভাবে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল বাড়িটা।'

'মেলবয়েসই পুড়িয়েছিলেন নাকি?' জানতে চাইল কোরি।

'তা-ও জানি না। আসল ঘটনাটা কি ঘটেছিল, কেউ জানে বলে মনে হয় না। সবই অনুমান। কেউ বলে পাগল হয়ে গিয়ে ভেরোনিকা আগুন দিয়েছিলেন বাড়িতে। কেউ বলে মেলবয়েস নিজেই দিয়েছিলেন। অভিশপ্ত বাড়িসহ নিজেকে শেষ করে দেয়ার জন্যে। ওই বাড়ির সবচেয়ে কাছে যে বাড়িটা ছিল, মেলবয়েসদের প্রতিবেশী, সে তার ডায়রিতে লিখে গেছে সেরাতে কি ঘটেছিল প্রাসাদে। লেখাটা আমি পড়েছি। রাত দুপুরে নাকি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল প্রাসাদে। কয়েক ঘন্টা ধরে জ্বলল নরকের আগুনের মত। পরদিন লোকে যখন দেখতে এল, পোড়া ছাই ছাড়া আর কিছুই দেখল না।'

সাগরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন ব্যারন।

'মেলবয়েস আর ভেরোনিকার কি ঘটেছিল?' জানার জন্যে তর সইছে না কোরির।

'আগুনে পুড়ে মারা গেছেন ভেরোনিকা,' ব্যারন বললেন। 'ব্ল্যাক ফরেস্টের গোরস্থানে কবর দেয়া হয়েছে তাঁকে। কোন নামফলক লাগানো হয়নি তাতে। আর মেলবয়েসের কি হয়েছে কেউ বলতে পারে না। তাঁকে আর কখনও দেখেনি কেউ।'

বাতাসে কাত হয়ে গিয়ে আবার লাফিয়ে সোজা হলো মোমের শিখা। শীত লাগল কোরির। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'গরম কাপড় নিয়ে আসিগে। কিশোর, তোমাদের জন্যে কিছু লাগবে?'

'উঁম্, আমার জন্যে আনতে পারো,' রবিন বলল।

ব্যারনের দিকে তাকাল কোরি, 'আমি না আসা পর্যন্ত আর কোন গল্প বলবেন না, প্লীজ!' বালির ঢিবির ঢাল বেয়ে প্রায় দৌড়ে হোটেলের দিকে উঠে গেল সে। অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

'সাংঘাতিক এক গল্প শোনালেন,' কিশোর বলল। 'মানুষের শরীর থেকে কঙ্কাল উধাও হয়ে যায়, এরকম কথা আর শুনিনি।'

'ভ্যাম্পায়ারের কাজ নয়তো?' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল মুসার।

'ভ্যাম্পায়ার হয় কি করে?' রবিন বলল, 'তাহলে রক্ত থাকত না শরীরে। হাড় থাকবে না কেন?'

'তাহলে এমন কোন ভূত হতে পারে, যে হাড় খায়!' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা।

'এর অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে,' কিশোর বলল। 'কিংবা লোকে বানিয়েও বলতে পারে। সাতদিনে লাশ এতটাই ফুলে গিয়েছিল, মনে হয়েছে হাড়

নেই। লোকে সেটাকে রঙ চড়িয়ে বানিয়ে দিয়েছে উদ্ভট এক ভয়াল কাহিনী।'

'এই শুরু হলো তোমার যুক্তি দেয়া,' রেগে গেল মুসা। 'উল্টোপাল্টা যুক্তি দিয়ে কাহিনীটাকে নষ্ট করছ কেন?'

'উল্টোপাল্টা নয়, এটাই ঠিক। কারণ ভূত বলে কিছু নেই।'

হেসে উঠলেন ব্যারন। বাতাসে দুলে উঠল তাঁর কোটের কোণা। চাঁদের আলোয় মনে হলো ডানা মেলতে চাইছে ওটা। বললেন, 'লোকে তো কত কথাই বলে। রোজার মেলবয়েস ভ্যাম্পায়ার ছিলেন, একথাও বলেছে অনেকে।' মুসার দিকে তাকালেন, 'আমি যেরকম পোশাক পরে এসেছি, আমাকেও আবার ভূত মনে হচ্ছে না তো তোমার?'

মাথা নাড়ল মুসা। কথা বেরোল না তার মুখ থেকে।

সবাই চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলেন ব্যারন। 'ঠাণ্ডা পড়ছে। ওঠা উচিত...'

কথা শেষ হলো না তাঁর। শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই।

আবার শোনা গেল চিৎকার। রাতের বাতাসকে চিরে দিল।

'হো-হো-হোটেল থেকে আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'কোরি!' বলল কিশোর।

সাত

দমকা বাতাস নিভিয়ে দিল মোমের আলো।

বালির ঢিবি বেয়ে উঠতে শুরু করল কিশোর। পিছু নিল মুসা আর রবিন।

চিৎকার থেমে গেছে।

ওপরে উঠে ফিরে তাকাল কিশোর। ব্যারনও উঠে আসছেন। তবে ওদের চেয়ে অনেক ধীর। এখনও একশো গজ নিচে রয়ে গেছেন।

আবার ছুটল সে। পুল হাউজের পাশ কাটিয়ে, সুইমিং পুলের ধার দিয়ে ছুটে চলল অন্ধকার বাড়িটার দিকে। পেছনের দরজা দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে ছুটে আসতে লাগল ওর দিকে।

কথা বলার জন্যে মুখ খুলেও মূর্তিটাকে চিনতে পেরে থেমে গেল কিশোর। 'কোরি! কি হয়েছে?'

'আ-আমি...আমি ওকে দেখেছি!' ঘোরের মধ্যে কথা বলছে যেন কোরি।

'কি দেখেছ?' জানতে চাইল রবিন। হাঁপাচ্ছে। সে আর মুসা দুজনেই এসে দাঁড়িয়েছে কিশোরের পাশে।

'চিৎকার করলে কেন?' ওদের পেছনে শোনা গেল ব্যারনের অস্থির কণ্ঠ।

'আমি ওকে দেখেছি,' আবার একই কথা বলল কোরি।

সাদা কোটের কোণা উড়িয়ে দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন ব্যারন।

উলফও বেরিয়ে এল।
'আমি…আমি ভূতটাকে দেখেছি!' কোরি বলল।
গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কো-কো-কোথায়?'
'এমন ভাবে চিৎকার করে উঠলে…' হাত দিয়ে বুক চেপে ধরলেন ব্যারন।
'সরি। আপনাআপনি বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে…'
'ভেতরে চলো সবাই।' বলে ব্যারনের হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল উলফ।
ওদের অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা আর কোরি। মিনিটখানেকের মধ্যেই লবিতে জমায়েত হলো। চামড়ায় মোড়া বড় একটা চেয়ারে বসল কোরি। তার পাশে ব্যারন। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে এখনও।
বাঁয়ের করিডরের দিকে হাত তুলে কোরি বলল, 'হলঘরে দেখলাম ওটাকে। একজন মহিলার ভূত। দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে এল।'
'দেখতে কেমন?' জানতে চাইল উলফ।
চমকে দিল কিশোরকে। কিশোর জানত না ঠিক ওর পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা।
কপালের ওপর এসে পড়া একগাছি চুল আঙুলে পেঁচাতে পেঁচাতে সামনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইল কোরি। যেন ভূতের চেহারা মনে করার চেষ্টা করছে। 'পুরানো আমলের পোশাক পরা। সাদা নাইটগাউন। লম্বা কালো বেনি। বয়েস কম। খুব সুন্দরী।'
চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সে। অস্বস্তি বোধ করছে। নজর এখনও সামনের দেয়ালের দিকে। 'ওর চোখ দুটোই বেশি নাড়া দিয়েছে আমাকে। বাপরে বাপ! কি বড় বড়। টকটকে লাল। মুখটা ফ্যাকাশে। মোমের মত।…' আরও কিছু বলতে চাইল সে। কথা আটকে গেল।
আলতো করে ওর হাতটা চাপড়ে দিয়ে ব্যারন বললেন, 'শান্ত হও। উলফ, এক কাপ চা দাও না ওকে।'
'দেব।' বলল, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না উলফ।
'লাল চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে,' কোরি বলল। 'আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে মনে হলো। বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল হঠাৎ সবকিছু। ঘর। ঘরের বাতাস। সব। চিৎকার করে উঠলাম। দেয়ালে মিশে গেল ওটা। ঘাড়ে কিসের যেন ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগল। আবার চিৎকার করে উঠলাম।'
দেয়ালের দিকে তাকিয়ে চুলের গোছা আঙুলে পেঁচাতে থাকল সে।
রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। রবিন কি ভাবছে বোঝার চেষ্টা করল। ভূত দেখেছে কোরি, এ কথা বিশ্বাস করতে পারছে না সে। নিশ্চয় কেউ ভয় দেখাতে চেয়েছে ওকে।
কেরির দিকে ফিরল সে। 'এখনও ভয় পাচ্ছ?'
ওর কথা যেন শুনতেই পায়নি কোরি। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে গভীর

চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

'হোটেলের পুরানো অংশে অনেক রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে বলে শোনা যায়,' ব্যারন বললেন। 'কিন্তু...'

'ও আবার আসবে,' আচমকা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল কোরি। 'ভূতটা ফিরে আসবে। আমার যেন কেমন লাগছে!'

★

ঘুম আসছে না কিশোরের।

নরম বালিশে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। সিলিঙে নানা রকম ছায়ার খেলা। বাইরে কালো নির্মেঘ আকাশ, তারায় ভরা। সাদা কোমল চাঁদটা যেন ভেসে রয়েছে উপসাগরের ওপরে।

ব্যারনের গল্পটার কথা ভাবছে সে। বনের মধ্যে ফুটফুটে দুটো ছোট্ট মেয়ের লাশ। হাড় নেই। পোড়া বাড়ি। খেপা মহিলা ভেরোনিকা। উন্মাদ রোজার ডি মেলবয়েস। তাঁর বংশধর একই নামের বর্তমান ব্যারন, মেলবয়েস ডি থার্ড। ব্যারনের চাকর উলফ। মানে নেকড়ে! রাখার জন্যে আর কোন নাম খুঁজে পায়নি যেন ওর বাবা। নামের আকাল পড়েছিল যেন। লোকটা অদ্ভুত। নেকড়ের সঙ্গে মিল নেই মোটেও। বরং চেহারার দিকে তাকালে বিখ্যাত সেই ক্লাসিক ছবির দানবটার স্রষ্টার কথা মনে পড়ে—ড. জেকিল।

কোরির কথা ভাবল। সত্যি কি ভূত দেখেছে সে? কিছু একটা তো দেখেছে নিশ্চয়। নইলে অমন করে চিৎকার করত না।

নাহ্, ঘুমাতে আর পারবে না! বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে। চাঁদটা চলে এসেছে যেন ঠিক তার জানালার বাইরে। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। রূপালী জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে আলোর একটা আয়তক্ষেত্র তৈরি করেছে কার্পেটে।

আলো মাড়িয়ে আলমারির কাছে গিয়ে শার্টটা বের করে গায়ে দিল সে। রান্নাঘরে যাবে। কোক-টোক কিছু পায় কিনা দেখবে।

দরজা খুলে সরু হলওয়েতে বেরিয়ে এল। বাতাসে কার্পেট ক্লীনার আর পোকা মারার ওষুধের গন্ধ। খুব মৃদু আলো জ্বলছে। রাতের বেলা ডিম লাইট জ্বেলে রেখে উজ্জ্বল আলোগুলো সব নিভিয়ে দেয়া হয়।

হেঁটে চলল সে। রবারসোল স্যান্ডেল পরা থাকায় শব্দ হলো না। দুপাশের দরজাগুলো আগের মতই বন্ধ।

মোড় নিয়ে আরেকটা করিডরে বেরোল। বিচিত্র এক রকম গন্ধ। আবছা অন্ধকার। একই রকম নিঃশব্দ। যেন স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে চলল সে।

ঠিক এই সময় কানে এল শব্দটা।

থমকে দাঁড়াল সে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলল। মেঝের মচমচ না তো?

আবার হলো শব্দটা। আরেকটু জোরে। সেই সঙ্গে শেকলের ঝনঝনানি।

শেকল? ভুল শুনছে না তো?

আবার হলো শব্দটা। এগিয়ে এসে থেমে গেল।

আবার মচমচ। মৃদু গোঙানি। মানুষের গোঙানির মত। হালকা বাজনার শব্দ ভেসে এল। বীণা বাজাচ্ছে কেউ। ফিসফিস করে ওর নাম ধরে ডাকল কে যেন।

দূর! সব আমার কল্পনা, নিজেকে বোঝাল সে। বাতাসের শব্দ। সরু হলওয়েতে দমকা বাতাস এসব কারসাজি করছে।

করুণ সুরে বেজেই চলল বীণা। ফিসফিস করে তার নাম ধরে ডাকল একটা ছোট্ট মেয়ে। একেবারে কানের কাছে।

ঘটনাটা কি? মোড়ের অন্যপাশে কেউ আছে নাকি? হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে। পার হয়ে এল মোড়টা। কানে এল মানুষের কণ্ঠ। জোরে জোরে কথা বলছে।

হাঁ করে ঢোক গিলে পানি খাওয়ার মত বাতাস গিলতে শুরু করল সে। যে ঘর থেকে কথা শোনা যাচ্ছে, তার দরজায় নম্বর নেই। নিচের ফাঁক দিয়ে চিলতে আলো এসে পড়েছে বাইরে।

ভূতুড়ে ফিসফিসানি থেমে গেছে।

এগিয়ে গিয়ে দরজায় কান পাতল সে।

ব্যারনের কণ্ঠ। চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। রেগে রেগে কথা বলছেন কারও সঙ্গে। তর্ক করছেন।

কিশোর অনুমান করল, এটা ব্যারনের ঘর। করিডরের শুরুতে প্রথম ঘর। পাশে চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে। মেইন লবি আর হোটেলের অফিসে যাওয়া যায় ওটা দিয়ে।

'শোনো! যা বলি শোনো!' চিৎকার করে উঠলেন ব্যারন।

'না, আমি শুনব না!' সমান তেজে জবাব দিল আরেকটা কণ্ঠ।

মহিলা কণ্ঠ!

বিস্ময়ে নিচের চোয়াল ঝুলে পড়তে লাগল কিশোরের।

'প্লীজ, আমার একটা কথা রাখো!' কাঁদতে শুরু করল মহিলা, 'তোমার পায়ে ধরি, পার্টি দিয়ো না! প্লীজ, দিয়ো না!'

দরজার বাইরে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। কিন্তু আর কিছু শোনা গেল না।

কি নিয়ে তর্ক করছে ওরা? কিসের পার্টি? মহিলাটি কে?

ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। চট করে ওখান থেকে সরে এসে হলওয়ে ধরে দৌড় দিল কিশোর। যে-ই বেরোক, তার চোখে পড়তে চায় না।

আট

পরদিন। সুন্দর, ঠাণ্ডা একটা সকাল। ডাইনিং রুমের বিশাল জানালা দিয়ে

সোনালি রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। আকাশের রঙ ঘন নীল।

নাস্তা খেতে খেতে গতরাতের কথা সঙ্গীদের জানাল কিশোর।

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে বলল কোরি, 'আমার কথা তাহলে বিশ্বাস হচ্ছে এতক্ষণে।'

'বিশ্বাস কাল রাতেই করেছি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু যাকে দেখেছ সে ভূত নয়, রক্তমাংসের জলজ্যান্ত একজন মানুষ, যে কথা বলে, তর্ক করতে পারে। মহিলাটি কে সেটাই ভাবছি এখন।'

'ব্যারনের রাঁধুনী হতে পারে,' রবিন বলল, 'মনিকা।'

'না, মনিকা নয়। ব্যারন বলেছেন শুক্রবারের আগে আসবে না সে।'

'ওটা ভূত ছাড়া আর কেউ নয়,' জোর দিয়ে বলল কোরি। 'হতে পারে বহুকাল আগে মেলবয়েসদের কারও স্ত্রী ছিল ওই মহিলা। অপঘাতে মরে ভূত হয়েছে···রাত দুপুরে এসে ব্যারনের সঙ্গে তর্ক জুড়েছে···'

উলফ এসে ঢুকল ডাইনিং রুমে। মুখে সেই একই রকম গোমড়া। হাতে একটা লাল রঙের টুলবক্স। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল। 'কাজ শুরু করতে চাও?'

কোরি জিজ্ঞেস করল, 'উলফ, হোটেলে কোন মহিলা আছে?'

প্রশ্নটা অবাক করল উলফকে। মুখটাকে এমন করে ফেলল যেন বোলতায় কামড়ে দিয়েছে। দ্রুত সামলে নিয়ে বলল, 'না, নেই। কেন?'

'ব্যারনের সঙ্গে কোন মহিলা দেখা করতে এসেছে?'

চোখ দেখেই বোঝা গেল এসব প্রশ্নে খুব বিরক্ত হচ্ছে উলফ। 'না, কেউ দেখা করতে আসেনি। রলিন মারা যাওয়ার পর আর কোন মহিলা ঢোকেনি ব্যারনের ঘরে। রলিন ছিল তাঁর স্ত্রী।'

টুলবক্সটা নিয়ে ঘরের পেছনের অংশে চলে গেল উলফ। কিশোরের দিকে তাকাল কোরি। চোখে বিস্ময়। কিন্তু প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা করা গেল না আর। এখন কাজের সময়।

'এখান থেকে কাজ শুরু করবে তোমরা,' দেয়াল জুড়ে থাকা লাইটহাউজের বিশাল একটা পেইন্টিং সরাল উলফ। 'ওয়ালপেপার সরাবে। সিরিশ দিয়ে ঘষে মসৃণ করবে।'

★

সারাটা সকাল কাজ করল ওরা। পুরানো বাদামী রঙ ঘষে ঘষে তুলল। গরম হয়ে উঠেছে ঘরটা। মেঝেতে ছড়িয়ে আছে বাদামী রঙের শুকনো কণা। বাতাসেও উড়ছে। ঘামে আঠা হয়ে গেছে শরীর। উলফ ঠিকই বলেছে—পরিশ্রমের কাজ। সাগরের নোনা হাওয়া কাঠের অনেক গভীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে রঙ, তোলা খুব মুশকিল।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ কোরি বলল, 'একটা কোক খাওয়া দরকার। আন্টিকেও ফোন করতে হবে।'

মই থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল মুসা। কোরির সঙ্গে সঙ্গে এগোল। ওদের পেছনে গেল রবিন। কিশোর বলল, 'তোমরা যাও। আমি এটুকু শেষ

করে আসি।'

কথা বলতে বলতে যাচ্ছে তিনজনে। রান্নাঘরে ঢুকে যেতে আর শোনা গেল না। মইয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কাজে মন দিল কিশোর। সিরিশ দিয়ে ঘষতে ঘষতে হাতের পেশী ব্যথা হয়ে গেছে। কিন্তু থামল না। ঘষেই চলল।

দশ কি পনেরো মিনিট পর কানে এল পদশব্দ। মুসারা নিশ্চয় ফিরে এসেছে।

ফিরে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল কিশোরের হাত।

মুসারা নয়। অবিকল ব্যারনের মত দেখতে একজন অপরিচিত লোক এসে দাঁড়িয়েছেন। সাদা চুল, সাদা গোঁফ। কিন্তু ব্যারনের মত হাসিখুশি নন, বরং উল্টো। পোশাকও পরিচ্ছন্ন নয়। কানা জলদস্যুদের মত এক চোখ কালো কাপড়ে ঢাকা। পরনে ঢোলা জিনস। প্যান্টের হাঁটুতে দাগ। গায়ে সাফারি জ্যাকেট। অসংখ্য পকেট তার। কাগজ, কলম, রুমাল আর নানা রকম জিনিসে উঁচু হয়ে আছে সেগুলো। ডান হাতে একটা হান্টিং রাইফেল। নল ধরে বাঁটটা ঠেকিয়ে রেখেছেন মেঝেতে। ভয়ানক বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে রাইফেলটাকে লাঠির মত ব্যবহার করে কাঠের মেঝেতে ঠকঠক শব্দ তুলে এগিয়ে এলেন কিশোরের দিকে।

'হাই,' হাসিমুখে বলল কিশোর।

জবাবে ঘোঁৎ করে উঠলেন তিনি। কালো একটা চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন কিশোরের দিকে।

'আমি কিশোর পাশা।' আশা করল নিজের পরিচয় দেবেন ভদ্রলোক। দিলেন না দেখে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নিশ্চয় মিলার মেলবয়েস?'

'ব্যারন মিলার ডি মেলবয়েস,' রাইফেলে ভর দিয়ে কিছুটা সামনে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। গলাটা তাঁর ভাই রোজারের মত গমগমে হলেও অতটা মসৃণ নয়। আচরণ ভদ্র তো নয়ই, বুনো।

চেহারা এক, অথচ দুই ভাইয়ের মধ্যে অত অমিল হয় কি করে?—ভাবল কিশোর। বলল, 'আমরা বেড়াতে এসেছি এখানে। আমি আর আমার তিন বন্ধু। থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করে দিচ্ছি।' মিলারের দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করছে সে।

'শুনেছি,' কিছুতেই সহজ হচ্ছেন না ভদ্রলোক। রাইফেলটাকে লাঠির মত ব্যবহার করে হেঁটে গেলেন জানালার কাছে। বাইরে তাকিয়ে রইলেন। উজ্জ্বল রোদে আরও স্পষ্ট দেখা গেল তাঁর পোশাকগুলো। অতিরিক্ত কুঁচকানো আর ময়লা।

রোজার বলেছেন, তাঁর ভাই বিষণ্ণতা রোগে ভুগছেন। কেন এই বিষণ্ণতা? আলাপ জমানোর জন্যে বলল কিশোর, 'দিনটা খুব সুন্দর, তাই না? জায়গাটাও দারুণ আপনাদের।' মই থেকে নামবে কি নামবে না সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে।

'কোথায় সুন্দর?' বিরক্তকণ্ঠে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন মিলার। 'প্রচণ্ড

গরম!' সাগরের দিকে তাকিয়ে থেকে নল ধরে ধীরে ধীরে ঘোরাচ্ছেন রাইফেলটা।

'ঘরের মধ্যে গরম।'

জবাব দিলেন না মিলার। অস্বস্তি আরও বাড়ল কিশোরের। ইচ্ছে করেই এমন পরিস্থিতি তৈরি করছেন তিনি যাতে সহজ হতে না পারে সে? মুসারা এত দেরি করছে কেন?

'তোমার বন্ধুরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন মিলার।

'কাজ করতে করতে ঘেমে গেছিল, পানি খেতে গেছে। আমি এই কোণাটা শেষ করে যাব,' হাত তুলে দেখাল কিশোর।

দেখার জন্যে ঘুরলেন না মিলার। বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'জায়গাটা অতিরিক্ত চুপচাপ।'

'হবেই। এতবড় জায়গা। মাত্র পাঁচ-সাতজন লোক।'

তার কথাটা মনে হয় পছন্দ হলো না মিলারের। মুখটাকে বিকৃত করে ঘনঘন রাইফেল ঠুকতে লাগলেন মেঝেতে এগিয়ে আসতে শুরু করলেন মইয়ের কাছে।

ভয় পেয়ে গেল কিশোর। মই থেকে টান মেরে ফেলে দেবেন না তো?

কিন্তু মইয়ের ফুটখানেক দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। এক পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে সশব্দে নাক ঝাড়লেন, গোঁফ মুছলেন, রুমালটাকে দলা পাকিয়ে ভরে রাখলেন আরেক পকেটে। কিশোরের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'মন দিয়ে কাজ করো।'

'হ্যাঁ...করছি...' ভয়ে ভয়ে বলল কিশোর। কি বললে আবার খেপে যান কে জানে।

'আমার ভাইকে দেখেছ?'

'না তো। সকালে নাস্তা খেতেও আসেননি।'

'হুঁ। ওর সঙ্গে কথা ছিল।'

'ঠিক আছে, আমার সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বলব আপনি খুঁজছিলেন।'

'মন দিয়ে কাজ করো।...হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমরা কি পার্টিতে যোগ দিতে এসেছ নাকি?'

পার্টি! চমকে গেল কিশোর। মোচড় দিয়ে উঠল পেটের মধ্যে। গতরাতের মহিলার কথা মনে পড়ল—প্লীজ, তোমার পায়ে ধরি, পার্টি দিয়ো না! কেন মানা করছিল মহিলা? পার্টিকে এত ভয় কেন তার?

'কিসের পার্টি?' জানতে চাইল কিশোর।

কর্কশ কণ্ঠে মিলার বললেন, 'থেকে যাও। পার্টিতে যোগ দিতে হবে তোমাদের। পালানোর চেষ্টা কোরো না।'

★

সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা। রবিনের মাথা ধরেছে। কোরির গা ম্যাজম্যাজ করছে। কথাই বলতে পারল না। কোনমতে খাওয়া শেষ করে ঘরে চলে গেল দুজনে।

এত তাড়াতাড়ি শুতে যেতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। মুসারও না। ডাইনিং রুমে বসে রইল ওরা।

'মিলারকে কি সত্যি পাগল মনে হয়েছে তোমার, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'পাগল কিনা জানি না, তবে আচরণ কেমন অদ্ভুত।'

'সেজন্যেই কোরি ভাবছে, ও ভূত।'

'যা খুশি ভাবুকগে। কারও আচরণ অদ্ভুত হলেই সে ভূত হয়ে যায় না। ভুলে যাচ্ছ কেন, মিলার বিষণ্ণতা রোগে ভুগছেন। সে যাকগে। আন্টি জোয়ালিনের ব্যাপারটা কি বলো তো? কোরি নাকি একবারও যোগাযোগ করতে পারেনি তাঁর সঙ্গে?'

'এটাও আমার কাছে রহস্যময় লাগছে।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল, 'বাইরে একটু ঘুরে আসিগে। রঙের মধ্যে শ্বাস নিতে নিতে মাথাটা গরম হয়ে গেছে।'

মুসাও বেরোল ওর সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল চন্দ্রালোকিত সৈকতে।

অপূর্ব দৃশ্য। হলদে আলোয় ঝলমল করছে বালি। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ভাঁজগুলোকে কালচে দেখাচ্ছে।

'কি পরিষ্কার আলো দেখো,' মুগ্ধকণ্ঠে বলল কিশোর। 'সব স্পষ্ট।'

'স্যান্ডেল খুলে বালিতে পা রেখে দেখো। ঠাণ্ডা। খুব আরাম লাগে।'

পানির কিনারে এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ফিরে তাকাল হোটেলের দিকে। বালির ঢালের লম্বা ঘাসগুলোতে ঢেউ তুলছে বাতাস। মনে হচ্ছে ওগুলোও তরল পদার্থ। চাঁদের আলো সবকিছুকেই কেমন অন্য রকম করে তুলেছে।

ডকের দিকে একটা খসখস শব্দ হলো। পাঁই করে ঘুরে তাকাল সে। ডকের ওপরে ছোট্ট পাথরের টিলার কাছে হয়েছে শব্দটা।

'কিসের শব্দ?' মুসাও শুনতে পেয়েছে।

'কেউ নজর রাখছে নাকি? চলো তো দেখি।'

'আমার ভয় করছে!'

'ভূতের ভয়?'

'সবদিকে নজর থাকে ওদের। নিজে অদৃশ্য থেকে সবখানে হাজির হতে পারে একমাত্র ওরাই...'

'চলো তো দেখি।'

বালির ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল কিশোর। নিচে কেউ থাকলে এখান থেকে দেখা যাবে।

কিন্তু অনেকখানি উঠেও কাউকে দেখতে পেল না। কোন শব্দও নেই। কেবল তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎ-ছল আর ঢেউয়ের মধ্যে বয়ে যাওয়া বাতাসের কানাকানি।

ক্লান্ত লাগছে। হাঁটতে আর ভাল লাগছে না। হোটেলে ফিরে চলল দুজনে।

নয়

পরদিন সকালে নাস্তার পর আবার কাজে লাগল ওরা।

দেয়াল ঘেঁষে রাখা মঞ্চটাতে ওঠা দরকার। ছাতের ঠিক নিচে দেয়ালে দশ বর্গফুটমত জায়গার রঙ ঘষতে হবে। কিন্তু সবাই একসঙ্গে উঠতে পারবে না ওটাতে। মাত্র দুজনের জায়গা হয়।

মুসা বলল, 'আমি আর রবিন উঠে ঘষতে থাকি। আমাদের হাত ধরে গেলে তোমরা দুজন উঠো।'

'খালি খালি বসে থাকব?' কিশোর বলল। 'মঞ্চের পাশে একটা মই ঠেস দিয়ে তাতে উঠে কাজ করা যায়।'

কোরি গেছে তার আন্টিকে ফোন করতে।

একটা ইলেকট্রিক স্যান্ডার দিয়েছে আজ উলফ। হাতে ঘষার চেয়ে এটা দিয়ে ঘষা অনেক সহজ। অনেক দ্রুত অনেক বেশি জায়গা ঘষা যায় যন্ত্রটা দিয়ে। যথেষ্ট ভারী। অন্য তিনজনের চেয়ে সহজে তুলে ধরে রাখতে পারবে মুসা, কারণ তার গায়ে শক্তি বেশি। সুতরাং ওটা নিয়ে মঞ্চে উঠে পড়ল সে।

রবিন উঠল তার পাশে। 'মঞ্চটার অবস্থা বিশেষ সুবিধের লাগছে না আমার। নড়ছে, দেখছ? দুলছে। ভেঙে পড়বে না তো?'

রবিনের সন্দেহটাকে গুরুত্ব দিল না মুসা। স্যান্ডার ঠেসে ধরতে গেল দেয়ালে। এই সময় ফিরে এল কোরি। মুখ থমথমে।

'পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। রিং হচ্ছিল ঠিকই। কেউ ধরল না। ভায়োলা আন্টি নাহয় হাসপাতালে গেছে। কিন্তু আন্ট জোয়ালিন?'

'রোজার মেলবয়েস কি বললেন? শোরটাউনে যাবেন?'

ঠোঁট ওল্টাল কোরি, 'জানি না। ফোন রেখে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। কোথাও খুঁজে পেলাম না।'

স্যান্ডারটা দেয়ালে ঠেসে ধরল মুসা। বিকট শব্দ করে রঙ তুলতে লাগল যন্ত্রটা। পাশে দাঁড়িয়ে টেনে টেনে দেয়ালের কাগজ ছিঁড়তে শুরু করল মুসা।

যন্ত্র দিয়ে কাজ করার ফলে বাতাসে রঙের কণা এত বেশি উড়ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল দুজনের। ব্যাপারটা লক্ষ করে একটা আলমারি থেকে গিয়ে দুটো মাস্ক বের করে আনল কিশোর। হাত লম্বা করে বাড়িয়ে দিল রবিনের হাতে। একটা নিজে রেখে আরেকটা মুসাকে দিল রবিন।

কাজ করতে করতে পাশে সরে গেল মুসা। দুলে উঠল মঞ্চ। কাত হয়ে যাচ্ছে একপাশে।

চিৎকার করে উঠল রবিন, 'আরি, পড়ে যাচ্ছে তো!'

ঠেকানো গেল না কোনমতে। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল মঞ্চ। মুসার হাত থেকে স্যান্ডারটা উড়ে গিয়ে পড়ল কিশোরের পায়ের কাছে। আরেকটু হলে তার পা-টা ছেঁচত। মেঝেতে পড়ে গেল মুসা আর রবিন।

দৌড়ে এল কোরি আর কিশোর।

কোনমতে উঠে বসল রবিন। হাতে মুঠো করে ধরা রয়েছে এখনও একটুকরো কাগজ। দেয়ালের দিকে চোখ পড়তে চিৎকার করে উঠল, 'আরে দেখো দেখো! একটা দরজা!'

চোখ তুলে তাকাল বাকি তিনজন। দেয়ালের গায়ে যেখান থেকে কাগজ ছিঁড়েছে রবিন, সেখানে একটা দরজার খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

এগিয়ে গেল কিশোর। টান দিয়ে নিচের দিকের বাকি কাগজটুকু ছিঁড়ে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল পুরো দরজাটা। বিড়বিড় করে বলল, 'দরজা ঢেকে দিয়েছিল কেন? আশ্চর্য!'

'সরো! সরো ওটার কাছ থেকে!' চিৎকার করে উঠল কোরি। 'আমি পড়েছি, ভূতের উপদ্রব ঠেকানোর জন্যে ভূতুড়ে ঘর কিংবা সুড়ঙ্গের দরজা এ ভাবে ফুলআঁকা কাগজ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। তাহলে নাকি ওসব দরজা দিয়ে আর বেরোতে পারে না ভূত।'

'রসুনের মালা ড্রাকুলার মত ভূতকে ঠেকায় শুনেছি, কিন্তু ফুলআঁকা কাগজ...' দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর।

'দেখো, আমি তোমাকে মানা করছি!' সাবধান করল কোরি। 'যেয়ো না! বের করে এনো না ভূতটাকে...'

চকচকে মসৃণ কাঠের দরজাটার একপাশে ফ্রেমে বাঁধাই একটা ছোট ছবি ঝোলানো। মঞ্চের আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল। সেটাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখেই কোণা ধরে সামান্য সরাতে বেরিয়ে পড়ল দরজার নব। হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। নব ধরে মোচড় দিতে খুলে গেল দরজার পাল্লা।

কোরির দিকে ফিরে তাকাল সে। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুখে।

'ঢুকো না!' কোরির দুচোখে ভয়। 'আমি এখনও বলছি, ভাল চাইলে বন্ধ করে দাও ওই দরজা!'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

হ্যাঁ-না কিছু বলল না মুসা। কোরির ভয়টা তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। ঢোকা উচিত কিনা বুঝতে পারছে না।

রবিন বলল, 'খুলেই যখন গেছে, চলো দেখি কি আছে?'

ওর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে ফড়ফড় করে বেরিয়ে এল কি যেন।

লাফ দিয়ে সরে গেল কোরি। মুসা হতভম্ব।

জানালার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রবিন, 'বাদুড়। ওই জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।' হাসতে হাসতেই বলল, 'কোরি, ভ্যাম্পায়ার নয়, শিওর থাকতে পারো। দিনে বেরোয় না ভ্যাম্পায়ারেরা। সূর্য ডোবার আগে

বেরোতে পারে না।'

'ইয়ার্কি মেরো না!' ঝাঁঝিয়ে উঠল কোরি। 'যখন পড়বে ভূতের খপ্পরে তখন বুঝবে মজা!'

যত ভয়ই পাক, কিশোর, রবিন আর মুসাও যখন ঢুকে গেল ভেতরে, আগ্রহ এবং কৌতূহল কোনটাই ঠেকাতে না পেরে কোরিও ঢুকে পড়ল ওদের পেছনে। অন্ধকারে আবার কিঁচ-কিঁচ করে উঠল কয়েকটা জীব। ফড়ফড় করতে লাগল মাথার ওপর। চামচিকে আর ছোট জাতের বাদুড়ে বোঝাই হয়ে আছে জায়গাটা।

'বাদুড় আমার সাংঘাতিক ভয় লাগে,' অন্ধকারে ফিসফিস করে বলল কোরি। 'মাকড়সা আর তেলাপোকাকেও।'

'শুঁয়াপোকাকে ভয় লাগে না?' হেসে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'বড় কালো কালো শুঁয়াপোকা? লম্বা লম্বা কাঁটার মত লোম, কিলবিল করে...'

'মাগো!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কোরি। 'দোহাই লাগে তোমার রবিন, আর বোলো না...প্লীজ! উফ্, দেয়ালেই হাত দিতে পারব না আর!'

ওর চিৎকারে মাথার ওপর ফড়ফড় করতে লাগল আবার বাদুড়ের ঝাঁক।

শক্ত করে গলার লকেটটা চেপে ধরল কোরি। অন্ধকারে কেউ দেখতে পেল না সেটা।

ধীরে ধীরে চোখে সয়ে এল অন্ধকার। পেছনের খোলা দরজাটা দিয়ে অতি সামান্য আলো আসছে। আবছামত দেখা যাচ্ছে এখন ভেতরটা। কংক্রীটে তৈরি সরু, নিচু ছাতওয়ালা একটা সুড়ঙ্গে ঢুকেছে ওরা।

'মুসা,' কিশোর বলল, 'আলমারিতে টর্চ আছে। নিয়ে এসো তো দুটো। ঢুকেছি যখন ভাল করেই দেখে নিই কি আছে না আছে?'

ভয়ের ভান করে রবিন বলল, 'না না, এগিয়ো না আর! বলা যায় না, কখন কাউন্ট ড্রাকুলার কফিন চোখে পড়ে যায়!'

'ফালতু কথা বোলো না তো!' লাফ দিয়ে দরজার দিকে সরে গেল কোরি। 'আমি যাব না!'

ওর পাশ কেটে বেরিয়ে গেল মুসা। আলমারি খুঁজে দুটো টর্চ বের করে নিয়ে এল।

মুসার কাছ থেকে একটা টর্চ নিল কিশোর। আগে আগে এগোল।

যাব না বললেও কৌতূহল দমাতে পারল না কোরি। এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।

'রোজার এসে যদি জিজ্ঞেস করেন, কাজ ফেলে কোথায় গিয়েছিলাম আমরা,' রবিন বলল, 'কি জবাব দেব?'

'সত্যি কথাই বলব,' জবাব দিল কিশোর। 'সুড়ঙ্গটা দেখে কৌতূহল হয়েছিল। ভেতরে কি আছে দেখতে গিয়েছিলাম। স্বাভাবিক কৌতূহল এটা। তিনি কিছু মনে করবেন না।' একটু চিন্তা করে বলল, 'তবে একটা কথা ভাবছি। এটার কথা কি উলফ জানে?'

শুকনো গলায় কোরি বলল, 'আমার ভয় লাগছে!'

'সেটা তো বুঝতেই পারছি।'

শূন্য সুড়ঙ্গ। পায়ের নিচে কংক্রীটের মেঝে। দেয়াল ছুঁয়ে দেখল কিশোর। ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা।

'ওই দেখো!' হাত তুলল মুসা।

ওর বলার ভঙ্গিতে চমকে গেল কোরি। আবার চিৎকার করে উঠল। তাকিয়ে দেখল দেয়াল বেয়ে এগিয়ে আসছে একটা বড় পোকা। গোঁ গোঁ শুরু করল সে। যেন চোখ উল্টে দিয়ে পড়ে যাবে। ওয়াক ওয়াক করে বলল, 'আমার বমি আসছে!'

'নাহ্, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এগোনোই তো মুশকিল!' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর। 'যাও, তুমি চলে যাও, আমাদের সঙ্গে আর যাওয়া লাগবে না!'

'ঠিক আছে, আর চেঁচাব না।' কিন্তু আধমিনিট পরেই বড় একটা মাকড়সা দেখে আবার চিৎকার করে উঠল কোরি। 'টারান্টুলা! ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার! পিষে ফেলো! কামড়ে দিলে সর্বনাশ!'

'আরে কিসের টারান্টুলা?' ধমক লাগাল কিশোর। 'খেয়ে আর কাজ পেল না। এখানে টারান্টুলা আসবে কোত্থেকে? না চিনেই চেঁচামেচি। একেবারে সাধারণ মাকড়সা।'

ডানে মোড় নিল সুড়ঙ্গ। ঢালু হয়ে গেছে মেঝে। গলিঘুপচির অভাব নেই। ওসবের মধ্যে না ঢুকে সোজা এগিয়ে চলল ওরা।

মুসা বলল, 'আমার মনে হয় সাগরের দিকে গেছে সুড়ঙ্গটা। পানির ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে।'

'বানিয়েছিল কারা?' রবিনের প্রশ্ন। জবাবটাও নিজেই দিল, 'বোধহয় প্রাচীন চোরাচালানির দল। রাতে জাহাজ থেকে গোপনে মাল খালাস করে এনে হোটেলে লুকিয়ে রাখত।'

টর্চের আলো সামনে ধরে রেখে সাবধানে নিচে নামতে লাগল কিশোর। আরও কয়েক মিনিট এগোনোর পর দেখা গেল দুভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। মূল সুড়ঙ্গটা বাঁয়ে মোড় নিয়ে সোজা এগিয়েছে। ওটা থেকে বেরিয়ে আরেকটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে ডানে।

রসিকতা করে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কোনদিকে যাব এবার, ক্যাপ্টেন কিড?'

'চলো আগে ডানেরটা ধরেই যাই,' কোরি বলল।

'কেন, কোন বিশেষ কারণ?'

'না না,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল কোরি, 'কোন কোন ভূত বিশেষজ্ঞ বাঁ দিকটাকে অশুভ মনে করে তো…'

আর কিছু বলা লাগল না। মুহূর্তে ডান দিকে ঘুরে গেল মুসা।

কয়েকশো গজ এগোনোর পর চিৎকার করে উঠল কোরি।

'কি হলো?' জানতে চাইল কিশোর।

'মুখে কি জানি লাগল!'

আলো ফেলল কিশোর। 'মাকড়সার জাল। তুমি কি ভেবেছিলে?'
জবাব দিল না কোরি।
'কি আর ভাববে,' হাসতে হাসতে বলল রবিন, 'ভ্যাম্পায়ারের ছোঁয়া।'
জালে দুলন্ত হালকা বাদামী মাকড়সাগুলো দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর, 'সৈকতে বাস করে এসব মাকড়সা, পানির কিনারে। তারমানে বাইরে থেকে এসেছে এগুলো। আর বাইরে থেকে যেহেতু এসেছে, ঢোকার পথ আছে। এবং ঢোকার পথ মানেই বেরোনোর পথও।'
গতি বাড়িয়ে দিল ওরা।
আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গের আরও কয়েকটা মোড় ঘুরে এসে দাঁড়াল একটা কাঠের দরজার সামনে। কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। ওপাশে ঘন অন্ধকার।
দরজায় হাত রাখল কিশোর। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ঠেলা দিল। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল পাল্লা। টর্চের আলোয় দেখা গেল ছোট একটা ঘর। মাঝখানে একটা কাঠের টেবিল। দু পাশে বেঞ্চ পাতা। টর্চের আলোয় দেখা গেল দেয়ালগুলোতে লাল রঙ লেগে আছে। যেন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।
টেবিলের দিকে চোখ পড়তে 'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। হাত থেকে খসে গেল টর্চ।
কিশোরের টর্চটা জ্বলছে।
বিড়বিড় করে কোরি বলল, 'মরার খুলি!'
এগিয়ে গেল কিশোর। চটচটে কি যেন লেগে রয়েছে। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। আঠা আঠা জিনিস। গন্ধ শুঁকল। কিছু বুঝতে পারল না।
'প্রোটোপ্লাজম!' ফিসফিস করে বলল কোরি। 'ভূতেরা যেখান দিয়ে চলে, সেখানে নরকঙ্কাল দেখলেই তাতে লাগিয়ে রেখে যায়। এবার তো বিশ্বাস করবে আমার কথা? খানিকক্ষণ আগে এখানে বসে ছিল একটা ভূত, মরার খুলিতে করে নিশ্চয় কফি কিংবা চা খেয়েছে, এটা তারই প্রমাণ।'
হেসে ফেলল রবিন, 'অতিরিক্ত ভূতের সিনেমা আর ভূতের গল্প পড়ার ফল এসব।' ধরতে গেল খুলিটা। নাড়া লাগতেই গড়িয়ে গেল ওটা। চোখ দুটো ওর ঘুরে গেল সে দিকে। ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে আনল সে।
'মাগো! খেয়ে ফেলল!' বলে চিৎকার দিয়েই পেছন ফিরে দৌড় মারতে গেল মুসা।
খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। 'আরে থামো! কি করছ পাগলের মত?'
মুসাকে শান্ত হওয়ার সময় দিল সে। আগেই লক্ষ করেছে দরজার পাশে সুইচবোর্ড আছে। আলো জ্বেলে দিল। তুলে নিল মাটিতে পড়ে যাওয়া টর্চটা।
আর কিছু দেখার নেই। ফিরে চলল ওরা ডাইনিং রুমে।
সুড়ঙ্গটা যেখানে দুভাগ হয়েছে সেখানে পৌঁছে রবিন জিজ্ঞেস করল,

'বাঁয়েরটায় ঢুকবে না?'

ঘড়ি দেখল কিশোর, 'নাহ্, এখন আর সময় নেই। কাজে অনেক ফাঁকি দিয়েছি। মিস্টার রোজার জানতে পারলে রাগ করবেন।'

যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সেটার কাছে ফিরে এল ওরা।

কিন্তু দরজা বন্ধ। শত ঠেলাঠেলিতেও খুলল না। আটকে গেছে কোন কারণে। এই সময় লক্ষ করল কিশোর, আলো কমে এসেছে টর্চের। ফুরিয়ে এসেছে ব্যাটারি।

শঙ্কিত কণ্ঠে রবিন বলল, 'আটকা পড়লাম না তো!'

★

দরজায় দুই হাতে কিল মারতে মারতে চিৎকার করে উঠল কোরি, 'অ্যাই, শুনছেন? কেউ আছেন ওপাশে? দরজাটা খুলুন!'

জবাব দিল না কেউ।

পদশব্দের আশায় কান পেতে রইল ওরা। কেউ এগিয়ে এল না।

'বাইরে থেকে তালা আটকে দেয়নি তো?' ককিয়ে উঠল কোরি।

দরজার কাছ থেকে সরে গেল কিশোর। 'বেরোনোর অন্য কোন পথ নিশ্চয় আছে। সময় থাকতে থাকতে সেটা খুঁজে বের করা দরকার। টর্চ নিভে গেলে মহাবিপদে পড়ব।'

'কি করবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সুড়ঙ্গের অন্য মাথা দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করব।'

মৃদু প্রতিবাদ করতে চাইল কোরি, কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। ফিরে চলল আবার ওরা।

সুড়ঙ্গের মাথাটা যেখানে দুই ভাগ হয়েছে সেখানে পৌঁছে এবারও ডানের সুড়ঙ্গটায় ঢুকল ওরা। কারণ কিশোরের ধারণা এটা দিয়ে সৈকতে বেরোনো যাবে। প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোল সরু সুড়ঙ্গ ধরে। ব্যাটারি ফুরিয়ে যাবার ভয়ে একনাগাড়ে জ্বেলে না রেখে মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে মুসা আর কিশোর।

পার হয়ে এল দরজাটা।

কিছুদূর এগোনোর পর আবার ভাগ হয়ে গেল সুড়ঙ্গ।

ডানেরটা দেখিয়ে বলল কোরি, 'এটাতেই ঢুকি, কি বলো?'

সেটাতে ঢুকল ওরা। কিছুদূর এগোনোর পর মনে হলো অনেক বড় বাঁক নিয়েছে সুড়ঙ্গটা। ঘুরে এগোচ্ছে। ছাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছে কংক্রীটের মেঝেতে। অসংখ্য মাকড়সার জাল। হাতে, মুখে, মাথায় জড়িয়ে যাচ্ছে।

চলেছে তো চলেছেই। পথ আর ফুরায় না। রবিন বলল, 'এ কোথায় চলেছি? বেরোনোর পথ পাওয়া যাবে তো?'

'কোথাও না কোথাও পথ একটা নিশ্চয় আছে,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর। 'কারণ সুড়ঙ্গগুলো মানুষের তৈরি।'

'আই,' কোরি বলল, 'পথ ভুল করে একই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঘুরে মরছি না তো

আমরা? বার বার একই জায়গায় ঢুকছি না তো?'
'পথ হারিয়েছি বলতে চাও?' শঙ্কিত স্বরে বলল মুসা।
'কিংবা এমনও হতে পারে ফাঁদ পেতেছিল কেউ আমাদের জন্যে। সেই ফাঁদে ধরা দিয়েছি আমরা। সুড়ঙ্গগুলো সব একই রকম লাগছে দেখতে। কোনদিনই আর এখান থেকে বেরোতে পারব না আমরা!'

দশ

'পারতেই হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। 'বেরোনোর পথ না পাওয়া পর্যন্ত এগিয়েই যেতে হবে আমাদের।' নানা রকম প্রশ্ন মনে—কে বন্ধ করল দরজাটা? কেন করল? কি লাভ তার? কিন্তু প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবার সময় নেই এখন।
একটা মোড় ঘুরে অন্যপাশে আসার পর দেখা গেল ক্রমশ খাড়া হয়ে ওপরে উঠে গেছে সুড়ঙ্গ। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এটা? বেরোনোর পথ সত্যি পাওয়া যাবে তো? সন্দেহ দেখা দিল কিশোরের। শুধু শুধু ঘুরে মরছে না তো?
আতঙ্ক এসে চেপে ধরতে শুরু করল। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে হৃৎপিণ্ডটা।
'দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে নিশ্চয়,' টর্চের আলো ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখে বলল মুসা। আলো কমে যাওয়ায় চারপাশে ছায়া বাড়ছে এখন। 'উলফ আমাদের খোঁজাখুঁজি করবে।'
'কি জানি!' অনিশ্চিত শোনাল রবিনের কণ্ঠ।
'তোমার কি মনে হয় সে-ই দরজাটা আটকে দিয়েছে?' বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি চেপে ধরেছে কোরি। ভেজা বাতাসে ঠাণ্ডা লাগছে।
'অসম্ভব কি?'
সামনে কমে আসছে অন্ধকার। একটা মোড় ঘুরতেই আলো দেখা গেল। আলোর দুটো ঝিলমিলে বর্শা তেরছা হয়ে মেঝেতে এসে পড়েছে। দেখেই দৌড় দিল মুসা। পেছনে ছুটল অন্যরা।
ছোট একটা দরজা। তার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। ঠেলে খুলতে দেরি হলো না। হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে এল সবাই। অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল সূর্যালোকে এসে চোখই মেলতে পারল না প্রথমে।
কিশোরের অনুমান ঠিক। সৈকতে বেরিয়েছে ওরা। উঁচু একটা ঢিবির ঢালে এমন জায়গায় এমন ভাবে রয়েছে সুড়ঙ্গমুখটা, সাগর থেকে দেখা যাবে না। নিচে সৈকতে দাঁড়িয়েও নয়। দেখতে হলে ঢাল বেয়ে উঠে আসতে হবে।
'তাজা বাতাস কেমন লাগছে?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'রোদ যে এত চমৎকার বুঝতে পারিনি কোনদিন,' আকাশের দিকে মুখ

তুলে বলল রবিন।

'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোদ আর বাতাস খেলে পেট ভরবে না,' তাগাদা দিল মুসা, 'হোটেলে যাওয়া দরকার।'

হাসাহাসি করতে করতে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে মুখে যেন খই ফুটছে। উঠে এল হোটেলের পেছনের নির্জন আঙিনায়। সুইমিং পুলের পাশ কাটাল। কাঁচের দরজা ঠেলে পা রাখল ঘরের ভেতর।

ডাইনিং রুমে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে মঞ্চটার দিকে। যেখানে ছিল ওটা সেখানে নেই। ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুড়ঙ্গে ঢোকার দরজার কাছে।

কেন খোলা যায়নি দরজাটা বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। মঞ্চটা দিয়ে ইচ্ছে করেই আটকে দেয়া হয়েছে যাতে সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে শত ঠেলাঠেলিতেও না খোলে।

বোঝা গেল না কে করেছে এই অকাজটা।

★

বিকেলটা সৈকতে কাটিয়ে উত্তেজনা দূর করার চেষ্টা করল ওরা। পারল না। থেকে থেকে মনে আসছে কেউ একজন ইচ্ছে করে ওদেরকে সুড়ঙ্গে আটকে মারতে চেয়েছিল। কে লোকটা? উলফ? মিলার?

'মিস্টার রোজারকে কথাটা জানানো দরকার,' কিশোর বলল। সবাই একমত হলো ওর সঙ্গে।

কিন্তু ডিনারের সময় পাওয়া গেল না ব্যারনকে। খেতে এলেন না তিনি। চামচ দিয়ে এক টুকরো মাংস নিয়ে সবে মুখে দিয়েছে কিশোর, এই সময় রাইফেলে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকলেন মিলার। রাগে মুখ লাল। এলোমেলো চুল। সেই সাফারি জ্যাকেটটাই পরে আছেন এখনও। বুকের কাছে খোলা। নিচে হলদে স্পোর্টস শার্টের দুটো বোতাম নেই।

'মিস্টার মিলার···এই যে, আমার বন্ধুরা···সকালে দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে,' অস্বস্তি কাটানোর জন্যে কথা শুরু করতে গেল কিশোর।

এমন ভঙ্গিতে তাকালেন মিলার, যেন ওকেও চিনতে পারছেন না। মুসা, রবিন আর কোরির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সে।

আনমনে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করলেন কেবল মিলার। হাত মেলালেন না। বিড়বিড় করে কি বললেন বোঝা গেল না। রাইফেলটা মেঝেতে শুইয়ে রেখে তাঁর ভাই রোজারের চেয়ারটায় বসে খাবারের প্লেট টেনে নিলেন। হাপুস-হুপুস করে খেতে শুরু করলেন নিতান্ত অভদ্রের মত।

সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। সুপ শেষ করে সালাদের বাটিটা টেনে নিলেন। চামচের পর চামচ মুখে পুরে আধ চিবান দিয়ে দিয়েই গিলে ফেলতে লাগলেন।

শেষে আর সহ্য করতে না পেরে ভয়ানক অস্বস্তি দূর করার জন্যে কথা শুরু করল কিশোর, 'আপনার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?···তিনি খেতে

আসবেন না?'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখভর্তি খাবার চিবাতে থাকলেন মিলার। গিলে নিয়ে কোনমতে বললেন, 'না, রোজার এখানে নেই,' বলেই আবার বড় এক চামচ সালাদ মুখে পুরলেন।

'কোথাও গেছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দায়সারা জবাব দিলেন মিলার। সশব্দে সালাদ চিবাতে লাগলেন।

অবাক লাগছে কিশোরের। এত বুনো কেন এই লোক? ভাইয়ের ঠিক উল্টো! দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে স্বভাবের এতটা পরিবর্তন কল্পনা করা যায় না।

কিশোরকে তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে অবশেষে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বললেন মিলার, 'রোজার গেছে শহরে। শোরটাউন।' তারপর আরও কি যেন বললেন, এতই অস্পষ্ট, বোঝা গেল না কিছু।

'আমার আন্টির খোঁজ নিতে গেলেন নাকি?' জানতে চাইল কোরি।

ভাল একটা চোখের দৃষ্টি কোরির ওপর স্থির করে মিলার বললেন, 'আন্টি? হ্যাঁ, তোমার আন্টি।'

আবার খাওয়ায় মন দিলেন তিনি। সালাদ শেষ করে আস্ত একটা মুরগীর রোস্ট আর আলুভাজার বাটিটা টেনে নিয়ে খেতে শুরু করলেন। কারও জন্যে একটুও অবশিষ্ট না রেখে শেষ করে ফেললেন পুরোটাই।

তাঁর এই কাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়ে গেল সবাই।

কিন্তু কারও পরোয়া করলেন না তিনি। কোন রকম ভদ্রতার ধার ধারলেন না। খাওয়া শেষ করে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কাত হয়ে তুলে নিলেন রাইফেলটা। চেয়ার থেকে উঠে সেটাতে ভর দিয়ে চলে গেলেন ডাইনিং রুম থেকে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন সবাই।

'এ তো রাক্ষস,' বলে উঠল মুসা। 'এর সঙ্গে খেয়ে আমিও পারব না।'

'রোজার না বললেন বিষণ্ণতা রোগ আছে?' কোরি বলল।

'আছেই তো,' কিশোর বলল, 'নইলে এমন আচরণ করে নাকি কেউ!'

'বিষণ্ণতা না ছাই!' মুখ ঝামটা দিয়ে বলল কোরি। 'আস্ত এক উন্মাদ!'

মিলারের সমালোচনা চলছে, এই সময় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল উলফ। মুখটা আগের চেয়ে গোমড়া। বলল, 'কি, বলেছিলাম না এখানে থাকা নিরাপদ নয়? এখনও সময় আছে, পালিয়ে যাও।'

'আর না পালালে?' ভুরু নাচাল মুসা। 'ভূত ছাড়া আর কিছুকে ভয় পাই না আমি। সত্যি করে বলুন, ভূত আছে কিনা? আপনাদের ওই মিলার ভূতফূত না তো?'

'দেখো, আমার কথা না শুনে ভুল করছ তোমরা...' দরজার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল উলফ। বড় বড় হয়ে গেল চোখ।

ফিরে তাকাল কিশোর। রাইফেলে ভর দিয়ে ফিরে আসছেন মিলার।

উলফের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন, 'থামলে কেন? চালিয়ে যাও তোমার বক্তৃতা।'

কুঁকড়ে গেল উলফ। জ্যাকেটের মধ্যে গুটিয়ে ফেলতে চাইল যেন শরীরটা। 'না, স্যার, আমি তো কিছু বলছি না...'

জ্বলন্ত এক চোখ মেলে উলফের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিলার। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারল না উলফ। চোখ নামাতে বাধ্য হলো।

বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় মিলার বললেন, 'তোমার ডিউটি রান্নাঘরে, সেখানেই যাও।'

'যাচ্ছি, স্যার!' ভীত ইঁদুরের মত রান্নাঘরের দিকে ছুটে চলে গেল উলফ। পালিয়ে বাঁচল যেন।

সন্তুষ্টির হাসি ফুটল মিলারের ঠোঁটে। উলফকে ভয় দেখাতে পেরে খুশি হয়েছেন। এই প্রথম তাঁর মুখে হাসি দেখল কিশোর। উলফ এত ভয় পায় কেন মিলারকে? রোজারকে পায় না। তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলে। এমনকি অনেক সময় চাপাচাপিও করে। তাতে মনে হয় মনিব-ভৃত্যের স্বাভাবিক সম্পর্কের চেয়ে কিছুটা বেশিই সম্পর্ক রোজারের সঙ্গে। অথচ তাঁরই ভাই মিলারকে দেখলেই যেন গুটিয়ে যায় উলফ।

উলফকে তাড়িয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে ঘুরলেন মিলার। পলকে মিলিয়ে গেল হাসিটা। কুঁচকে গেল ভুরু। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত একভাবে তাকিয়ে থেকে রাইফেলে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। পা টানতে টানতে বেরিয়ে গেলেন আবার ঘর থেকে।

★

খাওয়ার পর ডাইনিং রুমের বড় জানালাটার ধারে বসে কথা বলছে ওরা। ঘণ্টাখানেক পর ঘরে ঢুকলেন রোজার। সেই সাদা পোশাক পরনে। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ তোমরা?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'শোরটাউনে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, মিস্টার মিলার বলেছেন আমাদের,' কোরি বলল। 'আন্টি কেমন আছে?'

'ভাল। ফোন করেছিলেন। মিলার ধরেছিল। আমরা হোটেল বন্ধ করে দিয়েছি জেনে আর আসেননি। দুদিন ভালমত বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থেকে গেছেন। তোমরা কাজ করছ এখানে, সেটাও জানানো হয়েছে তাঁকে। সবই করেছে মিলার, কেবল তোমাদের বলতে ভুলে গেছে খবরটা। দুশ্চিন্তায় রেখে দিয়েছে। আজকাল আর কোন কথা মনে থাকে না ওর।'

'যাক, আন্টি তাহলে ভালই আছে। একটা দুশ্চিন্তা গেল। কিন্তু আমি যে ফোন করলাম, ধরল না কেন? বাড়িতে কেউ ছিল না নাকি?'

'কি জানি, জিজ্ঞেস করিনি। ভায়োলা চলে যায় হাসপাতালে। তোমার আন্টিও বোধহয় সাগরের ধারে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল, তুমি যখন ফোন করেছিলে ওই সময়।'

'তাই হবে। খবরটা এনে দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ও ঠিক আছে। কোন খবর না পেয়ে দুশ্চিন্তা আমারও হচ্ছিল। জোয়ালিন বললেন, কাল-পরশু নাগাদ চলে আসবেন এখানে।...তো ঠিক আছে, তোমরা গল্প করো। আমি যাই।'

এগারো

পরদিন সকালে নাস্তা খেতে এল না কোরি। অস্বাভাবিক লাগল না সেটা তিন গোয়েন্দার কাছে। এর আগেও এমন করেছে সে। দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছে। কাজ করার চেয়ে বিছানায় পড়ে থাকাটা ওর কাছে বেশি পছন্দের। ওকে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না কেউ।

ডিমভাজায় চামচ বসিয়ে দিয়ে বিশাল জানালাটা দিয়ে সাগরের দিকে তাকাল মুসা। 'সাঁতার কাটার দিন নয় আজ। আকাশের অবস্থা ভাল না।'

কিশোর আর রবিনও তাকাল। ভারী মেঘে ধূসর হয়ে আছে আকাশ। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। জোরাল বাতাস বালির ঢিবিতে জন্মানো ঘাসের মাথাগুলোকে চেপে নুইয়ে দিচ্ছে।

'না বেরোতে পারলে নেই,' কিশোর বলল। 'ঘষাঘষির কাজ যতটা পারি সেরে ফেলব।'

'আজকেও যদি আবার আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ বেরিয়ে পড়ে?' রবিনের প্রশ্ন।

'অবাক হব না। পুরানো বাড়ি। সুড়ঙ্গ, গুপ্তকুঠুরি থাকতেই পারে।'

সারাটা সকাল একনাগাড়ে কাজ করল ওরা। দেড়টায় লাঞ্চ খাওয়ার আগে আর থামল না।

রান্নাঘরের বড় সিংকে হাত ধুতে ধুতে কিশোর বলল, 'কোরি কি এখনও উঠল না? এতক্ষণ তো ঘুমানোর কথা নয়।'

'ওর ঘরে গিয়ে দেখা দরকার,' মুসা বলল।

'কি জানি, রোজার কিংবা মিলারের সঙ্গে গিয়ে হয়তো আড্ডা দিচ্ছে,' বলল রবিন। 'ওদের কাউকেও তো দেখলাম না।'

'তা ঠিক। নৌকা নিয়ে ব্যারনের সঙ্গে শোরটাউনেও চলে যেতে পারে, আন্টির সঙ্গে দেখা করার জন্যে।'

'তা কেন যাবে?' প্রশ্ন তুলল কিশোর। 'আন্টি যে ভাল আছেন, শুনলই তো।'

'কেন, তোমার কিছু সন্দেহ হচ্ছে নাকি?'

'বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'তবে ব্যাপারটা স্বাভাবিক লাগছে না আমার কাছে।'

নাস্তার পর উলফেরও আর দেখা মেলেনি। ওদের লাঞ্চের জন্যে রেফ্রিজারেটরে ঠাণ্ডা স্যাণ্ডউইচ আর ড্রিংকস রেখে গেছে। ডাইনিং রুমের ধূসর আলোয় দ্রুত খাওয়া শেষ করল ওরা। বাইরে মেঘের ঘনঘটা। কালো

আকাশ। সকাল থেকে সেই যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, থামছে না আর। কমছে, বাড়ছে, কমছে, বাড়ছে—চলছে এভাবেই।

খাওয়ার পর আবার কাজে লাগল ওরা। দেয়াল থেকে আরও অনেক কাগজ ছিঁড়ল। কিন্তু আর কোন গুপ্তদরজা বেরোল না। আগের দিনের দরজাটা তেমনি লাগানো রয়েছে। খোলার কথা একটিবারের জন্যে মনেও করল না কেউ। অন্ধকার সুড়ঙ্গে উঁকি দেয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আর।

সাড়ে চারটা নাগাদ যন্ত্রপাতি গুছিয়ে রেখে গোসল করতে চলল। নিজের ঘরে ঢোকার আগে কোরির দরজায় থামল কিশোর। টোকা দিল।

সাড়া নেই।

থাবা দিয়ে জোরে জোরে কোরির নাম ধরে ডাকল।

জবাব মিলল না।

নব ঘুরিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে আলো জ্বলছে। অগোছাল বিছানা। কিছু পোশাক এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে চেয়ারের হাতলে, কিছু বিছানায়। কিন্তু কোরি নেই।

'কোরি?' চিৎকার করে ডাকল কিশোর। 'বাথরুমে আছ নাকি?'

কোন জবাব পাওয়া গেল না।

★

ডাইনিং রুমে বসে ডিনার খাচ্ছে ওরা, এই সময় সামনের দরজা দিয়ে রোজারকে ঢুকতে দেখল। ওদের দিকে তাকালেন না তিনি। দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছেন।

'মিস্টার মেলবয়েস?' ডাক দিল কিশোর। কোরিকে দেখেছেন কিনা জিজ্ঞেস করবে।

কিন্তু শুনতেই যেন পাননি ব্যারন। সোজা চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে।

'কোরির জন্যে কিন্তু রীতিমত দুশ্চিন্তা হচ্ছে এখন আমার,' কিশোর বলল দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে।

দুশ্চিন্তাটা বাড়িয়ে দিতেই যেন রান্নাঘর থেকে খাবারের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল উলফ, 'মেয়েটা কোথায়?'

'ওকে দেখেননি?'

মাথা নাড়ল উলফ।

'আমরা তো ভাবলাম মিস্টার রোজারের সঙ্গে নৌকায় করে শোরটাউনে চলে গেছে।'

'না, সাহেবের সঙ্গে যেতে দেখিনি ওকে। সাহেব তো গেলেন ওয়ার্কারদের সঙ্গে কথা বলে জেনে আসতে কবে নাগাদ হোটেলের কাজ করতে আসছে ওরা।'

ভয় পেয়ে গেল কিশোর। রান্নাঘরে যাচ্ছে উলফ। তার দিকে তাকিয়ে রইল। আচমকা ফিরে তাকাল মুসা আর রবিনের দিকে। 'আর বসে থাকা যায় না। কোরিকে খুঁজতে যাব আমি। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে, না

ভাগাভাগি হয়ে খুঁজবে?'

'একসঙ্গে থাকাই ভাল,' মুসা বলল। 'ওর ঘর থেকে শুরু করা যাক। নাকি?'

মাথা নাড়তে নাড়তে আনমনে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রবিন, 'কোথায় আছে ও?'

'সত্যি সত্যি ভূতের খপ্পরে পড়েনি তো?' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা।

'ভূত না কচু,' কিশোর বলল। আঙুল তুলে মঞ্চটা দেখিয়ে বলল, 'ওটাও কি ভূতে নিয়ে রেখে এসেছিল দরজার কাছে?'

'কিশোর ঠিকই বলেছে।' মুসার দিকে তাকাল রবিন। 'কোন মানুষের কাজ। হয় উলফ, নয়তো মিলার।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

কোরির ঘর থেকে খোঁজা শুরু করল ওরা। কোন সূত্র নেই। জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় দেখে বোঝা গেল না কোনটা নিখোঁজ হয়েছে কিনা। রাতে বিছানায় ঘুমিয়েছে কিনা তা-ও বোঝার উপায় নেই।

বিছানার অন্য পাশে গিয়েই চিৎকার করে ডাকল রবিন, 'এই, দেখে যাও!'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল কিশোর আর মুসা। বিছানার পায়ের কাছে মেঝেতে চক দিয়ে আঁকা বিচিত্র কিছু নকশা আর চিহ্ন।

'পেন্টাকল এঁকেছে!' অবাক হয়ে বলল কিশোর। কাছেই পড়ে থাকতে দেখল একটা পুরানো বই। হাতে নিয়ে দেখল। জনৈক ভূত-গবেষকের লেখা। কি করে ভূত তাড়াতে হয়, কি করে ডেকে আনতে হয়, লিখে রেখেছে। কোথাও কোথাও নকশা এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

ভুরু কুঁচকে মুসা বলল, 'খাইছে, ভূতকে ডেকে এনেছিল নাকি কোরি! শেষে ভূতেই গাপ করে দিল!'

গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। জবাব দিল না।

কোরির ঘর, বাথরুম তন্নতন্ন করে খুঁজেও সন্দেহজনক আর কিছু পাওয়া গেল না।

ওল্ড উইংঙে হলওয়ের দুই পাশে যত ঘর আছে, সবগুলোতে খুঁজে দেখা হলো। লবি আর রেকর্ড রুমেও পাওয়া গেল না কোরিকে। অফিস রুমে ঢুকল। অন্ধকার। নীরব। টর্চ জ্বেলে খুঁজে দেখল। নেই সে।

হোটেলের পেছনের আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। বৃষ্টি থেমেছে। তবে আকাশ মেঘে ভারী হয়ে রয়েছে এখনও। বাতাস গরম, ভেজা ভেজা।

সুইমিং পুলের কাছে এসে দেখা গেল বৃষ্টির পানিতে কানায় কানায় ভরে গেছে। কোরির নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল কিশোর। জবাব পাওয়া গেল না। আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বলল, 'রোজার মেলবয়েসকে জানাতে হবে।'

রবিন বলল, 'পুলিশকেও জানানো দরকার।'

'পুলিশ পাবে কোথায়?' মুসা বলল, 'তার জন্যে শোরটাউনে যেতে

হবে। কিংবা ফোন করতে হবে।'

'পাইরেট আইল্যান্ডেও পুলিশ আছে।'

গোস্ট আইল্যান্ডের পাশের দ্বীপ পাইরেট আইল্যান্ড। গোস্ট আইল্যান্ডের চেয়ে বড়। মোটরবোটে যেতে দশ মিনিট লাগে।

'ওখানে পুলিশ আছে জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'উলফের কাছে।'

দ্রুতপায়ে হোটেলে ফিরে চলল ওরা।

★

'ঘুমিয়ে পড়েননি তো?' হোটেলে ঢুকে বলল রবিন।

হাতঘড়ি দেখল কিশোর। মাথা নাড়ল। 'মনে হয় না। মোটে তো সাড়ে আটটা।'

ব্যারনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। টোকা দিতে যাবে কিশোর, এই সময় ভেতর থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

পরক্ষণেই আরেকটা চিৎকার শোনা গেল। অন্য কণ্ঠ।

তারপরেই শুরু হলো তর্কাতর্কি। রেগে রেগে কথা বলছে দুজন মানুষ। মিলারকে ধমক মারছেন রোজার। থেকে থেকে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠছেন মিলার। চাপা গলায় জবাব দিচ্ছেন দু'একটা।

দুজনকে থামানোর চেষ্টা করল একজন মহিলা।

কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'শুনলে?'

'পাগল! আস্ত পাগল!' মহিলা বলল।

'কে পাগল?' খেঁকিয়ে উঠলেন মিলার।

'তোমরা দুজনেই। বদ্ধ উন্মাদ! দুজনকেই তালা দিয়ে রাখা দরকার।'

'দেখো কথাবার্তা একটু সাবধানে···'

'অ্যাই, থামো!' ধমক দিয়ে ভাইকে থামিয়ে দিলেন রোজার।

'দেখো, ওর পক্ষ নেবে না বলে দিলাম। ও তোমার সাহায্য চায় না। তুমি একটা গাধা। একটা রামছাগল।'

'মুখ খারাপ করছ কেন?' মহিলা বলল।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন রোজার, 'আরে কি করছ! আরে!'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। ভেতরে মারামারি বাধতে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

'যত কথাই বলো তোমরা ' দুই ভাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান তেজে চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, 'আমি তোমাদের পার্টিতে থাকছি না।'

'না থেকে যাবে কোথায়?' রাগে খসখসে হয়ে গেছে মিলারের কণ্ঠস্বর। 'যাওয়ার উপায় নেই তোমার।'

রোজার বললেন মহিলাকে, 'কি করব বলো? কত বোঝানো বোঝালাম ওকে—পায়ে ধরা বাকি রেখেছি শুধু। শুনল না। মিলার, শোনো···'

'না, কোন কথা শুনব না আমি!' ষাঁড়ের মত চিৎকার করে উঠলেন মিলার। 'তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি···'

'প্লীজ, মিলার,' ভীতকণ্ঠে বলল মহিলা, 'নামাও ওটা! নামাও!'
'আরে করছ কি?' রোজারও আঁতকে গেছেন কোন কারণে।
'না না, মিলার! প্লীজ!' রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এখন মহিলা।
'দোহাই তোমার, মিলার,' ভয় পেয়ে গেছেন রোজারও, 'মাপ চাই আমি তোমার কাছে! তুমি না আমার ভাই...'
গুলির প্রচণ্ড শব্দ হলো ঘরের মধ্যে।
তারপর সব চুপ।

বারো

দরজার দিকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে শুনে হলওয়ে দিয়ে দৌড় মারল কিশোর। দেখাদেখি রবিন আর মুসাও ছুটল। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ল একটা অন্ধকার কোণে।
ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রোজারের ঘরের দরজা। রাইফেল হাতে বেরিয়ে এলেন মিলার। পরনে সেই সাফারি জ্যাকেট। উদভ্রান্তের মত ছুটে গেলেন একদিকে। একটামাত্র চোখ দিয়ে মনে হয় ঠিকমত দেখতে পাননি, ধাক্কা খেলেন গিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে ফেললেন তিন গোয়েন্দাকে। বিশ্বাস করতে পারলেন না যেন নিজের চোখকে। ওদের এখানে আশা করেননি।
'অ্যাক্সিডেন্ট!' অস্বাভাবিক উঁচু গলায় ওদের বললেন তিনি। 'আমার ভাই রোজারের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'
রাইফেলটা ঘোরালেন চারপাশে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো যেন যে কোন দিক থেকে শত্রু ছুটে আসার ভয় পাচ্ছেন। সেই অদৃশ্য শত্রুকে ঠেকানোর জন্যে তৈরি হয়েছেন।
সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ওপরে উঠে এল উলফ। জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার মিলার? কি হয়েছে?'
টলতে শুরু করলেন মিলার। একপাশের দেয়ালে গিয়ে পড়লেন। সামলে নিলেন কোনমতে। 'অ্যাক্সিডেন্ট! একটা সাংঘাতিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে রোজারের!'
ভুরু কুঁচকে গেল উলফের। নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'অ্যাক্সিডেন্ট?'
'ডাক্তার ডাকুন, জলদি!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'মিস্টার রোজারকে গুলি করেছেন উনি!' এগিয়ে এসে রোজারের ঘরের দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়াল সে।
'খবরদার!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিলার। 'যাও এখান থেকে! সরো!'
এরকম হঠাৎ রেগে যাবেন মিলার, ভাবতে পারেনি কিশোর। ঢোক গিলে

বলল, 'কিন্তু একটা মানুষ গুলি খেয়ে পড়ে আছে ভেতরে…একজন মহিলাও আছেন…'

'তাতে তোমার কি? ভাগো এখান থেকে!' দরজা জুড়ে দাঁড়ালেন মিলার। একচোখে কালো পট্টি। আরেক চোখে আগুন।

'ডাক্তার ডাকতে বাধা দিচ্ছেন কেন?' সামলে নিয়েছে কিশোর। মিলারের ধমকের পরোয়া না করে বলল, 'ভাইকে তো গুলি করলেন…'

'ডাক্তার ডেকে আর কোন লাভ নেই এখন।'

'মানে?' লাল হয়ে গেছে উলফের মুখ।

'দেরি হয়ে গেছে অনেক। রোজার মরে গেছে।'

হাঁ করে মিলারের দিকে তাকিয়ে রইল উলফ। এগিয়ে গেল এক পা।

রাইফেল বাগিয়ে ধরলেন মিলার। প্রয়োজনে উলফকে গুলি করতেও দ্বিধা করবেন না।

উলফ বলল, 'অ্যাক্সিডেন্ট নয়, আপনি ভাল করেই জানেন…'

'না, জানি না,' রাগত স্বরে বললেন মিলার, 'এটা অ্যাক্সিডেন্টই…'

'না, অ্যাক্সিডেন্ট নয়! মিস্টার রোজারকে গুলি করে মেরেছেন আপনি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দুজনে। তারপর ঝটকা দিয়ে রাইফেল তুলে কাঁধে ঠেকালেন মিলার। উলফকে নিশানা করলেন।

'আরে একি করছেন! পাগল হয়ে গেলেন নাকি?' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

★

'সরান ওটা!' শান্তকণ্ঠে বলল উলফ।

লোকটার স্নায়ুর জোর দেখে অবাক হলো কিশোর। মাত্র তিন ফুট দূরে ওর বুকের দিকে তাকিয়ে আছে রাইফেলের নল। কিন্তু ভয় পাচ্ছে না।

'মিস্টার মিলার,' আবার বলল উলফ, 'সরান ওটা। আপনি জানেন, আমাকে গুলি করতে পারবেন না।'

জবাব দিলেন না মিলার। আস্তে আস্তে নামালেন রাইফেলটা।

উলফ বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি? আগেও যেমন বহুবার করেছি। আমাদের মেহমানদের অহেতুক ভয় দেখাচ্ছেন আপনি। ওদের ঘুমোতে দিচ্ছেন না।'

'কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তো অনেক…' বিড়বিড় করলেন মিলার।

'না, হয়নি। এখনও সময় আছে। আসুন।'

দ্বিধা করলেন মিলার। রাইফেলটা লাঠির মত করে ধরে ভর দিলেন তাতে। 'আবার আমার সঙ্গে চালাকি করছ না তো?'

'না না, করছি না।'

জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিলার। মাথা কাত করলেন, 'ঠিক আছে। চলো।'

তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরল উলফ, 'এই, তোমরা ঘরে যাও। শুতে যাও। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।'

মিলারকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

★

রোজারের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

জবাব না দিয়ে রোজারের ঘরের দরজা খুলে ফেলল কিশোর। ঢুকে পড়ল ভেতরে। বারুদের গন্ধ এসে ধাক্কা মারল নাকে। বড় একটা সিটিং-রুম। ঝকঝকে ক্রোমের আসবাবপত্র, সাদা চামড়ায় মোড়া গদি। কাঁচের কফি টেবিলে রাখা রুপার একটা কেটলি আর কয়েকটা চীনামাটির কাপ-পিরিচ। কাউচের পেছনে সাদা একটা কাঠের টেবিল।

পেছনের দেয়ালে দুটো দরজা। অন্য ঘরে যাওয়ার জন্যে নিশ্চয়। রবিন বলল, 'রোজার কোথায়?'

ঘরে রোজারও নেই, মহিলাও নেই। মেঝেতে রক্তও নেই।

'ভেতরের ঘরে আছে হয়তো,' মুসা বলল।

'কিন্তু চিৎকার তো এঘরেই শুনলাম।'

'গুলি খাওয়ার পর হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেছেন...'

'রক্ত কই?'

মেঝেতে সাদা কার্পেট পাতা। একফোঁটা রক্তের দাগ নেই।

এগিয়ে গিয়ে বাঁয়ের দরজাটা খুলে ফেলল কিশোর। ভেতরে উঁকি দিল। ছোট একটা বেডরুম। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। এলোমেলো হয়ে আছে চাদর, বালিশ সব। খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন স্তূপ করে রাখা হয়েছে একপাশের দেয়াল ঘেঁষে। আরেকপাশে একটা বুকসেলফ। তাকের বই সব এলোমেলো। কুঁচকানো, ময়লা কয়েকটা শার্ট-প্যান্ট অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে মেঝেতে।

এটা নিশ্চয় মিলারের ঘর, অনুমান করল সে।

'কই, রোজার তো এখানে নেই!' কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল বিস্মিত মুসা।

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। তাড়াতাড়ি গিয়ে ডানের দরজাটা খুলল। এটাও বেডরুম। আগেরটার চেয়ে বড়। এটা অন্যটার একেবারে বিপরীত। জিনিসপত্র সব নিখুঁতভাবে গোছানো। ঝকঝকে পরিষ্কার।

'এখানেও নেই কেউ!' এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। 'মিস্টার রোজার নেই। মহিলাও নেই।'

'অসম্ভব! গেল কোথায়?' বিড়বিড় করল মুসা। ভয় ফুটল চোখে। 'এই, ভূতের কারবার না তো! একটা লাশ এভাবে গায়েব হয়ে যেতে পারে না! সেই সঙ্গে একজন জ্যান্ত মানুষ...'

'একজন নয়,' মনে করিয়ে দিল রবিন, 'দুজন। কোরিকেও খুঁজে পাচ্ছি না আমরা!'

তেরো

'টোয়াইলাইট জোনে প্রবেশ করলাম নাকি আমরা?' ধপ করে বিছানায় মুসার পাশে বসে পড়ল রবিন।

'কথা বোলো না, আমাকে ভাবতে দাও,' ওদের সামনে পায়চারি করতে করতে বলল কিশোর। 'মাথা গরম হয়ে গেছে আমাদের। ঠিকমত চিন্তা করতে পারছি না। সেজন্যেই উল্টোপাল্টা মনে হচ্ছে সব।'

'কিশোর, প্লীজ, এভাবে পায়চারি কোরো না। মাথাটা আরও গরম হয়ে যাচ্ছে আমার।'

'বোঝার চেষ্টা করছি আমি,' আনমনে বলল কিশোর। রবিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি। পায়চারি থামাল না। 'বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে তিনজন মানুষকে কথা বলতে শুনেছি আমরা। তর্কাতর্কি করছিল। তারপর গুলির শব্দ। এবং তারপর ঘর থেকে ছুটে বেরোলেন মিলার।'

'লাশটাকে টেনেহিঁচড়ে কোথাও সরিয়ে ফেলেছেন মিলার,' অস্বস্তিতে বিছানায় নড়েচড়ে বসল রবিন। 'আশেপাশেই কোথাও আছে।'

থমকে দাঁড়াল কিশোর। দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে আরও ভালমত খোঁজা উচিত আমাদের। বিছানার নিচে। আলমারির ভেতর।'

'কিন্তু যদি মিলার চলে আসেন?' দরজার দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। 'রাইফেলটা এখনও তাঁর কাছে। আমাদের ঘরে দেখলে রেগে গিয়ে গুলি করে বসতে পারেন। একটা খুন ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন...'

'জলদি সারতে হবে আমাদের। তিনজন তিন ঘরে খুঁজব, তাতে তাড়াতাড়ি হবে। তোমরা অন্য ঘরে যাও, আমি এখানে খুঁজি। এটা নিশ্চয় মিলারের ঘর।'

'কিন্তু কিশোর...'

'যাও, দেরি কোরো না!' বিছানার নিচে উঁকি দেয়ার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কিশোর।

'বেশ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল রবিন। 'মুসা, এসো।'

ওরা দুজন বেরিয়ে আসার দুই মিনিটের মাথায় দরজায় এসে দাঁড়াল কিশোর। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'দেখে যাও! কি পেয়েছি!'

চমকে গেল মুসা। 'লাশটা নাকি?'

জবাব না দিয়ে দ্রুত আবার মিলারের ঘরে ফিরে এল কিশোর। পেছন পেছন এসে ঢুকল অন্য দুজন।

'এই দেখো,' বড় একটা ফটো অ্যালবাম তুলে দেখাল কিশোর।

দেখার জন্যে কাছে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।

দেখতে দেখতে রবিন বলল, 'পুরানো ছবি। যে রকম কালো হয়ে গেছে,

মনে হয় একশো বছরের পুরানো।'

'না, এত পুরানো নয়,' একটা ছবিতে আঙুল রাখল কিশোর, 'দেখো তো এটা চিনতে পারো কিনা?'

নাইট শ্যাডোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় সেডান গাড়ি। ফিফটির মডেল। সুন্দর রোদ ঝলমলে দিন। অলঙ্করণ করা দামী গাড়িটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন মানুষ—একজন পুরুষ, আরেকজন মহিলা।

'এ তো রোজার মেলবয়েস,' রবিন বলল। 'চুল এত কালো, চেনাই যায় না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সঙ্গের মহিলাটিকে চিনতে পারো নাকি দেখো তো?'

'খাইছে!' চিনে ফেলল মুসা। 'এ তো কোরির আন্টি! আন্ট জোয়ালিন!'

'হ্যাঁ। অবাক লাগছে না? তারমানে জোয়ান বয়েসে খাতির ছিল দুজনের...'

হলওয়েতে শব্দ হলো। হাত কেঁপে গেল কিশোরের। অ্যালবামটা মেঝেতে পড়ে গেল। তোলার চেষ্টা করল না। দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

কেউ এল না।

'বেরোনো দরকার,' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'মিলার কখন ঢুকে পড়েন...'

'হ্যাঁ,' ওর সঙ্গে একমত হলো মুসা। 'অ্যালবামের ছবি দেখে কোন লাভ হবে না আমাদের। বরং তাড়াতাড়ি গিয়ে পুলিশকে খবর দেয়া দরকার। ওরা এসে খোঁজাখুঁজি যা করার করুক।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এখানে কোথাও একটা ট্র্যাপডোর আছে নিশ্চয়। রোজারকে গুলি করার পর লাশটা ওই পথে সরিয়ে ফেলেছেন হয়তো মিলার। মহিলাও ওখান দিয়েই পালিয়েছে।'

'কিন্তু রক্ত কই?' প্রশ্ন তুলল রবিন। 'এক ফোঁটা রক্তের দাগও তো নেই কোথাও।'

'এটাই গোলমাল করে দিচ্ছে সব। কিছু বুঝতে পারছি না!'

'কিশোর, আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। এসব কথা বাইরে গিয়েও আলোচনা করতে পারব আমরা। মিলার ঢুকে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'দাঁড়াও, আরেকটু দেখে নিই।'

খুঁজতে শুরু করল কিশোর। দেয়ালে থাবা দিয়ে দেখল ফাঁপা আছে কিনা। টেবিল ল্যাম্প উল্টে দেখল। ড্রেসার-ড্রয়ারের নব ঘুরিয়ে দেখল।

'কি করছ তুমি?' জানতে চাইল রবিন।

'দেখছি গুপ্তদরজা খোলার কোন গোপন সুইচ আছে কিনা,' দেয়ালে একটা লাইট সুইচ দেখে সেটা টিপে দিল কিশোর। 'আরি দেখো দেখো!'

বুকসেলফটা রিভলভিং ডোরের মত ঘুরতে আরম্ভ করেছে। অর্ধেক ঘুরে থেমে গেল। বইয়ের তাক চলে গেল অন্যপাশে, এপাশে চলে এল একটা ডেস্ক।

আবার সুইচ টিপল কিশোর। ডেস্কটা ঘুরে আবার বুক শেলফটা ঘুরে এপাশে আসতে শুরু করতেই সুইচ টিপে অফ করে দিল সে। মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল ঘোরা। ফাঁক দিয়ে দেখা গেল অন্যপাশে আরেকটা ঘর।

ফাঁকটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। ফিরে তাকিয়ে বন্ধুদের বলল, 'এটা স্টাডিরুম। দেখে যাও।'

'লাশটা আছে?' উঁকি দিল রবিন। কিন্তু অন্ধকারের জন্যে কিছু দেখতে পেল না। টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেয়া একটা কাগজের দিকে চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল কাগজটা। একবার পড়েই হাত কাঁপতে শুরু করল। 'কিশোর!'

'কি?'

'জলদি এসো! কি লিখেছে দেখো!'

এপাশে বেরিয়ে এল কিশোর। রবিনের গা ঘেঁষে এল মুসা।

জোরে জোরে পড়তে শুরু করল রবিন,

'ডিয়ার জোয়ালিন,

'মর্মান্তিক এই খবরটা তোমাকে জানাতে কি যে কষ্ট লাগছে আমার বলে বোঝাতে পারব না। তোমার বোনঝি কোরি আর ওর তিন বন্ধু কিশোর, মুসা এবং রবিন হঠাৎ করে দ্বীপ থেকে রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ওদের কি হয়েছে, কোথায় গেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

'কি যে মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছে আমার বলে বোঝাতে পারব না। পাইরেট আইল্যান্ডের পুলিশকে খবর দিয়েছি। ওরা এসে দ্বীপের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখেছে। কিছুই পায়নি। কোন সূত্র নেই।

'দিনেরাতে বহুবার ফোনে তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। না পেরে শেষে এই চিঠি লিখে জানাতে বাধ্য হলাম।

'ঘটনাটা অদ্ভুত। মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না। পুলিশ কোন আশা দিতে পারছে না। রহস্যময় এই ঘটনায় ওরাও পুরোপুরি বিমূঢ় হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েগুলোর বাবা-মাকে যে কি জবাব দেব ভেবে ভয়ে পালাতে ইচ্ছে করছে আমার। তোমার মুখোমুখি হওয়ার সাহসও আমার নেই।

'যাই হোক, ওদেরকে খুঁজে বের করার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করছি। ওদের এই উধাও হওয়ার রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। সারাক্ষণ দোয়া করছি, ছেলেমেয়েগুলো সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসুক। কিন্তু বুঝতে পারছি, সেটা ঘটার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। অতীতেও এধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে এই দ্বীপে। হারানো মানুষকে আর জ্যান্ত ফিরে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে তাদের গলিত লাশ, কিংবা শুকনো কঙ্কাল। কি আর বলব, বলো? দ্বীপের এই বদনামের কথা তুমি তো সবই জানো।'

মুখ তুলল রবিন। কাঁপা গলায় বলল, 'নিচে সই করেছেন মিলার মেলবয়েস! তারিখটা আজ থেকে দুদিন পরের!'

চোদ্দ

'আমাদের খুন করার প্ল্যান করেছে সে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন এখনও? চলো না পালাই!'

'পাগল! বদ্ধ উন্মাদ!' রবিনের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নীরবে আরেকবার পড়ল কিশোর। বিশ্বাস হতে চাইছে না তার। 'রসিকতা করেনি তো?'

'কার সঙ্গে করবে? কেন?'

'আমাদের খুন করতে চায় কেন?'

'কি করে বলব? পাগলের তো কত রকম ইচ্ছেই থাকে। অকারণেও অনেক কিছু করে। লোকটা একটা স্যাডিস্ট।'

'হুঁ!' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর, 'উলফও কি এতে জড়িত আছে নাকি? নইলে রোজারকে খুন করা হয়েছে শুনেও পুলিশে খবর দেয়নি কেন?'

'দেয়নি, কি করে বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তাহলে এতক্ষণে পুলিশ চলে আসার কথা। পাইরেট আইল্যান্ড থেকে আসতে ওদের দশ-বারো মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'আমরাও তো খবরটা দিতে পারি।'

'কি ভাবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'ফোন করতে গেলেই দেখে ফেলবে উলফ। ওদিকেই রয়েছে সে আর মিলার।'

'তাহলে নৌকা নিয়ে নিজেরাই চলে যেতে পারি পাইরেট আইল্যান্ডে। ঘাটে তো নৌকা বাঁধাই আছে।'

'আমাদের ব্যাগট্যাগ সব সঙ্গে নিয়ে চলে যাব। একবার বেরোতে পারলে এখানে ফিরে আসার আর কোন মানে হয় না।'

'কিন্তু কোরির কি হবে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ওকে এখানে ফেলে যেতে পারি না। মিলার ওকে দেখলেই খুন করবেন।'

'কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে ওকে?' রবিন বলল, 'তাড়াতাড়ি গিয়ে পুলিশ নিয়ে এলে ওরাই ওকে খুঁজে বের করবে। উলফ আর মিলার এসে আমাদের আটকে ফেলার আগেই পালানো দরকার। চলো চলো, আর দেরি করা যায় না।'

দাঁড়িয়েই রইল কিশোর। সমস্ত প্রশ্নের জবাব না জেনে যেন বেরোতে ইচ্ছে করছে না তার। বলল, 'কিন্তু উলফ যদি আমাদেরকে মারার প্ল্যানই করে থাকে, তাহলে শুরু থেকেই জায়গা দিতে চাইল না কেন? কেন সময় থাকতে আমাদের পালাতে বলল?'

'আরে বাবা, এসব কথা তো বাইরে গিয়েও ভাবা যাবে!' পুরোপুরি

অধৈর্য হয়ে পড়েছে রবিন। ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল দরজার দিকে। 'মিলার ঢুকে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না।' কিশোরের হাত ধরে টান দিল সে, 'এসো।'

হলওয়েতে বেরিয়ে এল ওরা। এদিক ওদিক তাকাল। কাউকে চোখে পড়ল না। ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'সামনে দিয়ে বেরোনো যাবে না। উলফ কিংবা মিলারের চোখে পড়ে যেতে পারি। পেছন দিক দিয়ে পথ আছে, দেখেছি। ওটা দিয়ে বেরোব।'

'আমিও দেখেছি,' মুসা বলল। 'কিন্তু ওটা তো রান্নাঘর দিয়ে গিয়ে বেরিয়েছে। যদি উলফ থাকে সেখানে?'

'থাকবে না। খেতে তো আর নিয়ে যায়নি মিলারকে। কথা বললে ওরা ডাইনিং রূমে বসে বলবে।'

যার যার ঘরে ঢুকে দ্রুতহাতে ব্যাগ গুছিয়ে নিল ওরা। ঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে চলে এল হলওয়ের মাথায়। কয়েক ধাপ সিঁড়ি আছে। নিচে আরেকটা করিডর। নামতে শুরু করল। মচমচ করে উঠছে পুরানো কাঠের সিঁড়ি। ওদের মনে হচ্ছে বোমা ফাটার শব্দ হচ্ছে যেন। মিলার কিংবা উলফের চলে আসার ভয়ে সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত রইল।

সিঁড়ির গোড়ায় করিডর এগিয়ে গেছে রান্নাঘরের দিকে। করিডরের একপাশে আরেকটা দরজা, অর্ধেক খোলা। সেটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। কান পাতল কেউ আছে কিনা বোঝার জন্যে। কারও কথা শোনা গেল না। কানে আসছে শুধু ওদের নিঃশ্বাসের শব্দ।

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। কৌতূহল হলো কিশোরের। কেউ যদি না-ই থাকবে আলো কেন? সাবধানে ভেতরে উঁকি দিল সে। কোনও ধরনের স্টোর রূম ওটা। একধরনের তেলতেলে ভাপসা গন্ধ। ভালমত দেখে বুঝল, স্টোর রূম নয়, ট্রফি রূম। শিকার করা জন্তু-জানোয়ারের স্টাফ করা আস্ত দেহ সাজানো রয়েছে টেবিল আর বেদীতে। দেয়ালে বসানো হরিণ, ভালুক, আর নেকড়ের মাথা। আরেকদিকের দেয়ালে চোখ পড়তেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল কিশোর।

'কি হলো?' জানতে চাইল মুসা।

নীরবে হাত তুলে দেখাল কিশোর।

তাকাল মুসা আর রবিন। পাথর হয়ে গেল যেন মুহূর্তে।

দেয়ালে হরিণের মাথার মতই বসানো রয়েছে চারজন মানুষের কাটা মুণ্ড।

★

বাইরে উষ্ণ রাত। ঝিঁঝির কর্কশ চিৎকার। গাঢ় অন্ধকার।

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা। উলফের চোখে পড়েনি। বেরিয়েই দৌড় দিল সৈকতের দিকে।

লম্বা ঘাসে পা লেগে হুসহুস শব্দ হচ্ছে। কেয়ারই করল না। ঢাল, বালি, ঘাসের বাধা, কোনটারই পরোয়া করল না। একটাই ভাবনা, কোনভাবে

নৌকার কাছে পৌঁছে যাওয়া। ধরা পড়লে ভাগ্যে কি ঘটবে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। আরও তিনটে মানুষের মাথা যোগ হবে ট্রফি রুমের দেয়ালে বসানো চারটে মাথার সঙ্গে।

কিশোর ভাবছে—হতভাগ্য মানুষগুলো কে ছিল? নিশ্চয় হোটেলের গেস্ট। কোন কারণে হোটেল যখন বন্ধ ছিল, তিন গোয়েন্দার মতই হ তো তখন এসেছিল বেড়াতে। উন্মাদ খুনী মিলারের পাল্লায় পড়ে আর ফিরে যে ত পারেনি। মরে গিয়ে ট্রফি রুমের শোভা বাড়াচ্ছে ওরা।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইল হাত-পা কোরিকে ইতিমধ্যেই খুন করে ফেলেনি তো মিলার? করে হয়তো গুম করে রেখেছে কোনখানে। ওদের তিনজনকেও শেষ করার পর ধীরেসুস্থে মুণ্ড কেটে নেবে। আর ভাবতে চাইল না সে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডকের গেটে পৌঁছে গেল ওরা। গেট খোলার জন্যে পাল্লা ধরে টান দিয়েই থেমে গেল মুসা। 'খাইছে! আটকানো!'

'ডিঙিয়ে যাব,' রবিন বলল।

'যাওয়া যাবে না। গেটের ওপর কাঁটা বসানো।'

'তাহলে?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'হোটেলে ফেরা ছাড়া উপায় নেই।'

'কি বলছ!'

'হ্যাঁ, আর কোন উপায় নেই।'

তর্ক করল না মুসা বা রবিন। কিশোর যখন বলেছে, নিশ্চয় না ভেবে বলেনি।

দেরি না করে ছুটল আবার ওরা।

কিছুদূর এসে ফিরে তাকাল হোটেলের দিকে। ওপরতলার আলো দুটোও এখন নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে আছে বাড়িটা। কালো আকাশের পটভূমিতে হালকা কালো এক বিশাল ছায়ার মত দেখাচ্ছে।

ঢালে জন্মে থাকা লম্বা ঘাসের পরে বন। সেদিক দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ওদের। হোটেল থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চায়।

বৃষ্টিতে ভেজা ঢাল বেয়ে নামাটা তেমন কঠিন না হলেও ওঠা খুব মুশকিল। তার ওপর সঙ্গে রয়েছে ব্যাগের বোঝা। কয়েক মিনিটেই হাঁপিয়ে গেল।

মেঘের ফাঁকে উঁকি দিল মলিন চাঁদ। ঘোলাটে আলোয় অন্ধকার কাটল কিছুটা। বনের মধ্যে একটা পেঁচা ডেকে উঠল।

বালির ঢিপির মাথায় সবার আগে উঠল রবিন। ডকের দিকে তাকিয়েই থমকে গেল।

সেটা লক্ষ করল কিশোর। কাছে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

হাত তুলে দেখাল রবিন।

ডকের দিকে তাকিয়ে একই অবস্থা হলো কিশোরেরও। চাঁদের আলোয়

দেখা গেল, ছোট্ট ডকে যেখানে নৌকাগুলো বাঁধা থাকত, সেখানটা এখন খালি। একটা নৌকাও নেই।

'খাইছে!' মুসার মনে হচ্ছে বরফের মত শীতল একটা হাত খামচি দিয়ে ধরেছে তার মেরুদণ্ড। 'যাব কি করে?'

'যেতে পারব না,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'দ্বীপ থেকে বেরোনোর পথও বন্ধ করে দিয়েছে।'

পনেরো

কোন রকম জানান না দিয়ে বৃষ্টি এল। ভিজিয়ে দিতে লাগল ওদের। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। আবার কুচকুচে কালো হয়ে গেছে আকাশটা। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ।

কালো আকাশটাকে চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুতের শিখা। গুড়ুগুড়ু মেঘ ডাকল।

'ইস্, একেবারে ভিজে গেলাম!' বজ্রের শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'এভাবে ভেজা ঠিক হচ্ছে না। সরে যাওয়া দরকার কোথাও,' রবিন বলল। 'কিন্তু কোথায় যাব?'

আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাল। দিনের আলোর মত আলোকিত করে দিল চতুর্দিক। বজ্রপাতের শব্দ। হাত দিয়ে মাথার পানি মোছার চেষ্টা করল কিশোর। মাথা থেকে মুখ বেয়ে গড়িয়ে নামছে পানি। চোখের সামনে জমে গিয়ে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

বিকট শব্দে বাজ পড়ল আবার। থরথর করে কেঁপে উঠল মাটি। সাদা আলোয় দেখা গেল বালির ঢিবিতে জন্মানো ঘাসগুলো বাতাসের ঝাপটায় আন্দোলিত হচ্ছে। একবার এদিক মাথা নোয়াচ্ছে, একবার ওদিক। ওদের মতই ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

'পুলহাউজে চলে গেলে কেমন হয়?' কিশোর বলল।

সুইমিং পুলের পেছনে লম্বা ঘরটায় সাঁতার কাটার পোশাক আর পুল পরিষ্কারের জিনিসপত্র রাখা হয়। দুর্গন্ধ আর ধুলাবালি-ময়লা নিশ্চয় আছে। কিন্তু মাথা গোঁজার ঠাঁই তো হবে।

মুসা বলল, 'চলো, যাই।'

দৌড়াতে শুরু করল ওরা। ভেজা মাটিতে পা পিছলে আছাড় খেল কিশোর। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল আবার। ব্যাগটা মনে হচ্ছে কয়েক মন ভারী। আবার ছুটল মুসা আর রবিনের পেছনে। ঘরের দরজাটায় এখন তালা দেয়া না থাকলেই হয়।

নাহ্, তালা নেই।

পাল্লা ঠেলে খুলে ফেলল মুসা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল তিনজনে। এত জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর, ফুসফুসটা যেন ফেটে যাবে। বাতাসে ক্লোরিনের কড়া গন্ধ। বন্ধ থাকায় অতিরিক্ত গরম। চালে ঝমঝম শব্দ তুলেছে বৃষ্টির ফোঁটা।

বাতি জ্বালার জন্যে সুইচ টিপল মুসা। আলো জ্বলে উঠল।

'না না, জলদি নেভাও!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'মিলার দেখতে পেলে...'

'জানালা নেই। আলো বেরোবে কোন দিক দিয়ে?'

আর কিছু বলল না কিশোর। ভিজে কপালের সঙ্গে লেপ্টে আছে চুল।

হাত দিয়ে মাথা থেকে পানি মুছতে মুছতে রবিন বলল, 'আপাতত তো ঢুকলাম। এরপর কোথায় যাব?'

'এখানে ফোনটোন আছে নাকি?' চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর।

থাকার সম্ভাবনা খুব কম, তবু 'যদি থাকে?' এই আশায় খুঁজতে শুরু করল ওরা। লম্বা, নিচু চালার নিচে লাগানো উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট লাইটের আলোয় সবুজ দেখাচ্ছে ভেজা শরীরগুলোকে, মনে হচ্ছে সাগর থেকে উঠে আসা তিনটে জলজন্তু।

টেলিফোন সেট পাওয়া গেল না।

'এখন এই দ্বীপ থেকে বেরোব কি করে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'ইচ্ছে করেই ডকের গেটে তালা লাগিয়ে রেখেছেন মিলার। নৌকাগুলো সরিয়ে ফেলেছেন।'

'কে বলল?' পেছনে বোমা ফাটাল যেন গমগমে কণ্ঠ।

ভীষণ চমকে গেল তিন গোয়েন্দা। নিজের অজান্তেই ছোট্ট চিৎকার বেরিয়ে এল রবিনের মুখ দিয়ে। কিশোরও চিৎকার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আটকে গেল গলায়। কুঁকড়ে গেল মুসা।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিলার মেলবয়েস। হাতে সেই হান্টিং রাইফেল। লাঠির মত ধরে তাতে ভর দিয়ে রেখেছেন। আরেক হাতে ছাতা। গায়ের হলদে রঙের রেইন স্লিকারের ঝুল গোড়ালি ছুঁই ছুঁই করছে।

ছাতাটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাইফেল হাতে এগিয়ে এলেন কয়েক পা। আলোর নিচে ভয়ঙ্কর লাগছে চেহারাটা। সাদা চুল এলোমেলো হয়ে আছে। ঘাড়ের কাছে বেশ কিছু চুল খাড়া। এক চোখে কালো কাপড়। আরেকটা ভাল চোখ জ্বলছে। ঠোঁটের এককোণ বেঁকে গেছে বিচিত্র হাসিতে।

'কি পচা একটা রাত। কিন্তু এখানে কি করছ তোমরা?'

কেউ জবাব দিল না।

কিশোর ভাবছে, এত তাড়াতাড়ি আমাদের খুঁজে পেল কি করে? কিভাবে জানল আমরা এখানে আছি?

'কি, কথা বলছ না কেন?' মিলারের হাসিটা মুছে গেল ঠোঁটের কোণ থেকে।

বজ্রপাতের শব্দ যেন মুখ খুলে দিল কিশোরের। কোনমতে বলে ফেলল,

'আমরা চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছ?' জবাবটা অবাক করল মিলারকে। রাইফেলে ভর দিয়ে আরেক হাতে গাল চুলকালেন।

'হ্যাঁ। এখানে আর থাকব না আমরা,' মুসা বলল।

মুসার কথায় আহত হয়েছেন মনে হলো মিলার। 'কিন্তু তোমরা তো যেতে পারবে না।'

'পারতে হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। চমকের প্রথম ধাক্কাটা অনেকখানি সামলে নিয়েছে। দরজাটা খোলা রেখে দিয়েছেন মিলার। সেদিকে তাকাল। বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কড়াৎ করে বাজ পড়ল। বেড়ে গেল বৃষ্টির বেগ।

ওদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলেন মিলার। নড়লেন না। 'কিন্তু তোমাদের তো যাওয়া হবে না,' কঠিন, শীতল গলায় বললেন তিনি, 'পার্টিতে যেতে হবে। আমি নিজে তোমাদের দাওয়াত দিতে এলাম।'

'পার্টি?' পেটের মধ্যে একধরনের শূন্য অনুভূতি হলো কিশোরের।

'হ্যাঁ, পার্টি। শুরু হতে বেশি দেরি নেই,' মিলারের একমাত্র চোখটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক পা এগিয়ে এলেন। সরে যেতে চাইল কিশোর। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

'পার্টি শুরু করার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি আর রোজার,' বিচিত্র হাসিটা ফিরে এল মিলারের ঠোঁটের কোণে। 'কি ধরনের পার্টি, অনুমান করতে পারো?'

'মিস্টার মিলার,' রবিন বলল, 'দয়া করে আমাদের যেতে দিন। এসব পার্টিফার্টিতে যেতে চাই না আমরা। আপনাদের যা ইচ্ছে করুনগে...'

'কি ধরনের পার্টি, অনুমান করতে পারো?' রবিনের কথা যেন কানেই যায়নি তাঁর। 'বলতে পারবে না তো? ঠিক আছে, বলেই দিই, হান্টিং পার্টি।' খেকখেক করে হাসতে লাগলেন তিনি। হায়েনার হাসির মত লাগল রবিনের কাছে। 'এ মৌসুমে কাদের শিকার করব আমরা জানো?' হাসিটা বাড়ছে তাঁর।

বুঝে ফেলল কিশোর। মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল ঠাণ্ডা শিহরণ। কল্পনায় ভেসে উঠল ট্রফি রুমের চারটে নরমুণ্ড।

কি করতে চাইছেন মিলার, মুসা আর রবিনও বুঝেছে। তাঁর হাতে হান্টিং রাইফেল। তিনি শিকারী, ওরা শিকার।

'পাগল! উন্মাদ হয়ে গেছেন আপনি!' কথাগুলো যেন বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে।

ঝট করে রাইফেলটা তুলে নিলেন মিলার।

সরে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু লুকানোর জায়গা দেখতে পেল না।

'আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলা উচিত হয়নি তোমার!' রেগে গেছেন

মিলার। 'তোমাকে এলাম পার্টিতে দাওয়াত করতে, আর তুমি করছ আমাকে অপমান!'

'পার্টির দরকার নেই,' অনুরোধ করে বলল মুসা, 'বেরোতে দিন আমাদের।'

'আমাকে পাগল বলছ কেন? আমি কি পাগল?' রাইফেলটা আরও উঁচু করে ধরলেন মিলার। কিশোরকে নিশানা করলেন। দু'পা আগে বাড়লেন আরও।

মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর। কোন রকম চিন্তাভাবনা না করে ছুটে গেল সামনের দিকে। একথাবায় সরিয়ে দিল নলের মুখ।

গুলি ফুটল বিকট শব্দে।

চিৎকার করে উঠলেন মিলার। রাইফেলের ধাক্কা এবং সেই সঙ্গে কিশোরের হাতের ঠেলা লেগে পেছনে উল্টে পড়ে গেলেন। একটা টেবিলের কোণায় বাড়ি খেল মাথা।

তাঁর ওঠার অপেক্ষা করল না আর তিন গোয়েন্দা। ব্যাগগুলো যেখানে রেখেছিল সেখানেই রইল। খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ওরা। মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যে।

ষোলো

'এদিক দিয়ে!' চিৎকার করে বলল মুসা।

সেদিকে ছুটল কিশোর। ভেজা মাটিতে জুতো পিছলে যাচ্ছে। মুসার পেছন পেছন বনে ঢুকে পড়ল। ফিরে তাকাল। ওর ঠিক পেছনেই রয়েছে রবিন। গাছপালার ফাঁক দিয়ে পুলহাউজটা দেখা যাচ্ছে। এখনও বেরোয়নি মিলার।

থামল না ওরা। যতটা সম্ভব দূরে সরে যাওয়া দরকার। বনের ভেতরের আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটছে। বৃষ্টি কমেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে এখন। কিন্তু বাতাসে পাতা নড়লেই ঝরঝর করে বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে গায়ে।

চাঁদের ওপর থেকে সরে গেল মেঘ। গাছের মাথার ওপর দেখা গেল ফ্যাকাসে চাঁদ। ভূতুড়ে রূপালী করে তুলল বনভূমিকে। ভেজা পাতাগুলোকে কেমন বিকৃত দেখাচ্ছে। মাটি থেকে হালকা ধোঁয়ার মত উঠছে গরম বাষ্প।

'যাচ্ছি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কথা বোলো না,' জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর, 'ছুটতে থাকো।' কপালে ডালের বাড়ি খেয়ে 'আঁউক' করে উঠল। ব্যথাটা এতই তীব্র, দাঁড়িয়ে গেল নিজের অজান্তে। ডলতে শুরু করল কপাল।

একঝলক দমকা বাতাস আবার পানির ফোঁটা ফেলল গায়ে। সরে

যাওয়ার চেষ্টা করল। পারল না। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল।

বনের ভেতর আরও খানিকক্ষণ দৌড়াল ওরা। পথ শেষ হয়ে গেল হঠাৎ। সামনে যেন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে পথরোধ করে দিল কাঁটাঝোপ।

'যাচ্ছি কোথায় আমরা?' আবার জিজ্ঞেস করল রবিন। 'এভাবে দৌড়ে লাভটা কি?'

বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়াল ওরা। মাটি এখানে অনেকটাই শুকনো। গাছের পাতা এত ঘন, বৃষ্টির পানি নিচে পড়তে বাধা পেয়েছে।

দমকা বাতাস বয়ে গেল। জ্বোরো রোগীর মত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল গাছের পাতা।

'পাগলটা কি আসবে নাকি?' গাছের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল রবিন।

কান পেতে আছে তিনজনেই। কোন শব্দ নেই, শুধু বাতাসের ফিসফাস আর ওদের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া।

'জানোয়ারের মত খুঁজে বের করে আমাদের খুন করবে সে,' কিশোর বলল। দেয়ালের চারটে নরমুণ্ড আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর। আগের বছরের হান্টিং পার্টিতে ওদেরকেও নিশ্চয় এভাবেই দ্বীপময় তাড়িয়ে নিয়ে খুন করেছেন মিলার।

'আসলেই এ ভাবে দৌড়াদৌড়ি করার কোন মানে হয় না,' শার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে বাড়ি লাগা জায়গাটায় ব্যথা পেল কিশোর। কেয়ার করল না। 'একটা প্ল্যান দরকার আমাদের।'

'এ দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে,' রবিন বলল। পেছনে তাকিয়ে দেখল মিলার আসছেন কিনা।

'সে চেষ্টা তো ইতিমধ্যেই করেছি,' হাতে বসা একটা মশাকে থাপ্পড় মারল কিশোর। 'নৌকা ছাড়া যাব কি নিয়ে?'

'গাছের বাকল দিয়ে বানিয়ে নিতে পারি,' মুসা বলল, 'আমাজানের ইনডিয়ানদের মত।'

হাত নেড়ে ওর কথাটা উড়িয়ে দিল কিশোর, 'ফ্যান্টাসি বাদ দাও এখন। গাছ কাটবে কি দিয়ে? বাঁধবে কি দিয়ে? কাটার শব্দ শুনে মিলার চলে আসবে না? তা ছাড়া অত সময় কই?'

চুপ হয়ে গেল মুসা। ভাবতে লাগল তিনজনেই। বৃষ্টি এখন পুরোপুরি থেমে গেছে।

রবিন বলে উঠল, 'পাইরেট আইল্যান্ডের পুলিশকে একটা ফোন করা গেলেই হত…'

'ফোনগুলো রয়েছে সব হোটেলে।' চাপড় মেরে আরেকটা মশা তাড়াল কিশোর।

'তাহলে ওখানেই যাওয়া উচিত আমাদের,' মুসা বলল।

'পাগল নাকি!' ওর কথাটা নাকচ করে দিল রবিন।

'ও ঠিকই বলেছে,' মুসার সঙ্গে একমত হলো কিশোর। 'চুপি চুপি হোটেলে ঢুকে পুলিশকে ফোন করব।'

'কিন্তু উলফ আর মার্টিন যদি…'

'আমরা হোটেলে ঢোকার সাহস করব এটা এখন কল্পনাও করবে না ওরা। 'চটাস করে বাহুতে চাপড় মারল মুসা, 'শালার মশা!'

'কল্পনা করবে না এটা বলা যায় না,' গাল থেকে টিপে একটা মশা মারল কিশোর। 'উলফ নিশ্চয় জানে না আমরা কোথায় আছি। রান্নাঘর কিংবা ডাইনিং রুমেই হয়তো এখন বসে আছে সে।'

'দুজনেই বন্দুক নিয়ে তেড়ে আসবে না তো আমাদের?' কেঁপে উঠল রবিনের গলা। চটাস চটাস চাপড় মারতে আরম্ভ করেছে সে-ও। 'উফ্, ড্রাকুলার বাচ্চা সব! খেয়ে ফেলল!…যেমন মনিব, তেমনি তার চাকর। দুজনেই হয়তো মানুষ শিকারে আনন্দ পায়। এ দ্বীপের সবাই রক্তলোভী। দেখছ না মশাগুলোর কাণ্ড!'

'উপায় এখন একটাই,' কিশোর বলল, 'রিস্ক নিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারি গিয়ে হোটেলে ঢুকে ফোন করে আবার পালাব। ওরা না আসা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকব কোথাও।'

'কোথায়?'

'জানি না,' অধৈর্য শোনাল কিশোরের কণ্ঠ, 'হোটেলের ভেতরই কোনখানে।'

'বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকাটা বরং নিরাপদ।'

'কতক্ষণ?' মুসার প্রশ্ন।

'হোটেলের মধ্যেও বেশিক্ষণ লুকিয়ে বাঁচতে পারব না আমরা,' মুসার কথার পিঠে বলল কিশোর। 'ওরা আমাদের খুঁজে বের করবেই। যে ভাবেই হোক বাঁচার একটা বুদ্ধি বের করতে হবে। আরেকটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, কোরিকে খুঁজে পাইনি আমরা এখনও। হোটেলে গিয়ে কোনমতে অন্তত একটা ফোন যদি করতে পারি, পরের ভাবনা পরে ভাবব।'

আরও কয়েক সেকেন্ড আলোচনার পর রওনা হলো ওরা। কিশোর বলল, 'রাস্তা থেকে সরো। যতটা সম্ভব গাছপালার আড়ালে থেকে এগোব…'

কথা শেষ হলো না তার। বাতাসে ঝরে পড়ল পানির ফোঁটা। পরক্ষণে শোনা গেল গুলির শব্দ।

চমকে মুখ তুলে তাকাল সবাই। সামনে দুটো গাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন মিলার। রাইফেলটা ওদের দিকে তাক করা। গুলি করেছেন ওদের লক্ষ্য করেই।

সতেরো

আবার গুলি করলেন মিলার।

বিকট শব্দ গাছের গায়ে বাড়ি খেয়ে খেয়ে ফিরল দীর্ঘ সময় ধরে। মনে

হলো যেন চতুর্দিক থেকে গুলি চলছে।

বুকে কিংবা মাথায় গুলি লাগার অপেক্ষায় ছিল কিশোর। লাগল না দেখে মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল। কার গায়ে লেগেছে? ওরাও কেউ আর্তনাদ করল না। দেরি না করে প্রায় ডাইভ দিয়ে লুকাল এসে একটা গাছের আড়ালে। উপুড় হয়ে পড়ায় হাঁটুতে ব্যথা পেল।

হামাগুড়ি দিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল তিনজনেই। এখানে থাকলেও বাঁচতে পারবে না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঝোপের অন্যপাশে। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল। দুহাতে গাছের ডাল সরাতে সরাতে ছুট লাগাল প্রাণপণে।

আবার শোনা গেল গুলির শব্দ।

খুব কাছে থেকে।

তারপর শোনা গেল কুৎসিত, কর্কশ হাসি খুব মজা পাচ্ছেন উন্মাদ মিলার।

একটা বিখ্যাত গল্পের কথা মনে পড়ল রবিনের—দা মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম! লেখকের নামটা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। ঝড়ের মধ্যে জাহাজডুবী হয়ে বনে ছাওয়া এক দ্বীপে উঠতে বাধ্য হয় এক নাবিক। দুর্গের মত এক পুরানো বাড়িতে ওঠে রাতের আশ্রয়ের জন্যে। প্রথমে খুব খাতিরযত্ন করে তাকে বাড়ির মালিক। তারপর হাতে একটা অস্ত্র ধরিয়ে দিয়ে বলে পালিয়ে যেতে। রাইফেল আর শিকারী কুকুর হাতে নাবিকের পিছু নেয় সে, খুন করার জন্যে। রাতের অন্ধকারে তাড়া খেয়ে ভীত জানোয়ারের মত বনের মধ্যে প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে বেচারা নাবিক···অবিকল সেই গল্পের নকল চলছে এখন ওদের ওপর। ওই ভয়ঙ্কর গল্প পড়েই কি হান্টিং পার্টির উদ্ভট আইডিয়া মাথায় এসেছে মিলারের?

আতঙ্কে মাথা গরম হয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো ওর। মনে হচ্ছে বাস্তবে ঘটছে না এই ঘটনা। সামনে পথজুড়ে থাকা ঝোপঝাড়, পিচ্ছিল ভেজা মাটি, চাঁদের আলোয় বিকৃত দেখানো ওই যে পাতাগুলো, কোনটাই বাস্তব নয় রাইফেলের শব্দ, গুলি ফোটার পর প্রতিধ্বনি, সবই ঘটছে যেন ভয়াবহ কোন দুঃস্বপ্নে।

শিকারের উত্তেজনায় হেসে ওঠা মিলারের ওই শিকারী-হাসিও অবাস্তব।

কিশোরের চিৎকারে বাস্তবে ফিরে এল সে। কিশোর বলছে, 'অ্যাই দেখো, কোথায় বেরিয়েছি আমরা!'

সাগরের কিনারে চলে এসেছে ওরা। ঝোড়ো বাতাসে ফুঁসে ওঠা বড় বড় ঢেউ চাঁদের আলোয় রূপালী হয়ে ভীমবেগে এসে আছড়ে পড়ছে নীলচে-সাদা বালিয়াড়িতে।

থমকে দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। সমতল, সরু এখানে সৈকত কোথাও একটা বালির ঢিপিও নেই যে তার আড়ালে লুকাতে পারবে।

'এখানে থাকা যাবে না,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, একেবারেই খোলা,' মুসা বলল।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে মিলারের আসার অপেক্ষা করছে ওরা। কান পেতে আছে গুলির শব্দের জন্যে। কার গায়ে বুলেট লাগবে প্রথমে কে জানে!

'যাব কোথায়?' কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে রবিনের। মোছার চেষ্টা করল না আর। চুলে আটকে আছে ভেজা পাতা। সেটাও সরাল না।

'হোটেলেই ফিরে যাব,' বলল কিশোর। 'বাঁচার এটাই একমাত্র উপায়।'

'সে-ই ভাল,' মুসা বলল। 'এখানে থাকলে ডানাভাঙা হাঁসের মত গুলি করে মারবে।'

'শব্দ কিসের?' শোনার জন্যে ঘাড় কাত করল রবিন।

মুসা আর কিশোরও কান পাতল।

তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের একটানা গুমগুম ছাড়া আর কোন শব্দ কানে ঢুকল না।

রাইফেলের গুলি হলো না আর। প্রতিধ্বনি নেই।

গাছের আড়াল থেকে ভেসে এল না উন্মাদের অট্টহাসি

দাঁড়িয়ে থাকলে সময় নষ্ট। কিশোর বলল, 'চলো।'

ফিরে এসে আবার বনে ঢুকল ওরা। সাবধান রইল আগের বার যেখান দিয়ে চলেছিল সেখানে যাতে আর না যায়। রাস্তায় উঠল না। গাছের আড়ালে আড়ালে খুব সাবধানে, নিঃশব্দে এগিয়ে চলল বাষ্প ওঠা গরম বনের ভেতর দিয়ে।

ভীত জানোয়ারের মত—ভাবল কিশোর। পা কাঁপতে শুরু করল হঠাৎ। ক্লান্তি, নাকি ভয়ে কাহিল হয়ে গেছে, বুঝতে পারল না। ভাঁজ হয়ে এল হাঁটু বসে পড়ল ভেজা মাটিতে।

এগিয়ে এল মুসা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'

'না, কিছু না। পা দুটো চলতে চাইছে না আর। বেশি সাঁতরালে যেমন মাংসপেশীতে খিঁচ ধরে যায়, তেমন।'

'হুঁ। জিরিয়ে নাও খানিক। ঠিক হয়ে যাবে।'

শান্তিতে বসারও উপায় নেই। কোনদিক দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবেন মিলার, বোঝা যাচ্ছে না। তবু হাঁটতে যখন পারছে না, না বসে উপায় কি?

কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। হাঁটু ভাঁজ হচ্ছে না আর। গোড়ালির ওপরের মাংসে খিঁচধরা ভাবটাও কমেছে। পা বাড়াল আবার।

'কি, অসুবিধে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। চলো।'

যতটা সম্ভব দ্রুত হেঁটে হোটেলের পেছন দিকে চলে এল ওরা। সামনে একচিলতে বালিতে ঢাকা জমি পেরোলে গিয়ে পড়বে ঘাসের মধ্যে। তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে হবে।

জমিটা পেরোল ওরা। সামনে পাহাড়ের মত উঁচু বালির ঢিবির দিকে তাকিয়ে দমে গেল কিশোরের মন। বেয়ে ওঠা বড় কঠিন আর ভীষণ পরিশ্রমের

কাজ।

কিন্তু উঠতেই হবে।

ওঠার পর কি দেখবে? মিলার কি কোনভাবে আন্দাজ করে ফেলেছেন ওরা হোটেলে ফিরে যাচ্ছে? সেখানে গুলিভরা রাইফেল নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছেন? অন্ধকারে ওদের যাতে কায়দামত পেতে পারে, সেই সুযোগের জন্যেই কি সব আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে?

উলফ কোথায়? হান্টিং পার্টিতে যোগ দিয়েছে কি সে-ও?

এমনও হতে পারে মিলার যখন বনের মধ্যে ওদের তাড়া করে ফিরছেন, হোটেলে তখন রাইফেল হাতে ঘাপটি মেরে বসে আছে উলফ। ওদের ঢুকতে দেখলেই দেবে গুলি মেরে।

ভাবনাটা অস্থির করে তুলল কিশোরকে। বলল, 'ছড়িয়ে পড়ো। রাইফেল হাতে উলফ কিংবা মিলারকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে যেদিকে পারো ঝেড়ে দৌড় মারবে। নিশানা করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে যাবে তাহলে ওরা।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল ওরা। মাথা নিচু করে, পিঠ বাঁকিয়ে উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। পেছন থেকে গায়ে এসে লাগছে বাতাস।

পেছনের আঙিনায় উঠে এল কিশোর। পুল হাউজের দরজাটা খোলা। তবে আলো নেভানো। সারা বাড়ির সমস্ত আলো নেভানো।

অন্ধকারে শিকার করতেই ভালবাসেন বোধহয় মিলার।

কাছেই একটা জোরাল শব্দ হলো। গুলির শব্দ ভেবে আরেকটু হলে চিৎকার করে উঠেছিল কিশোর। বুকের মধ্যে এত জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, মনে হচ্ছে পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনে সব যেন সাদা হয়ে গেল। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

বুঝতে পারল কিসের শব্দ। একটা ধাতব ডেকচেয়ার সিমেন্টে বাঁধানো চত্বরে উল্টে ফেলেছে বাতাস।

শব্দটা রবিন আর মুসার কানেও গেছে। ওরা দুজনও যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে গেছে পাথর হয়ে। কান পেতে আছে। মিলারের কানেও কি গেছে চেয়ার পড়ার শব্দ? ভাবছেন ওরাই ফেলেছে? তাহলে খুঁজতে চলে আসবেন এদিকে।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

এলোমেলো দমকা বাতাসে আরেকটা চেয়ার উল্টে পড়ল।

হোটেলের দিকে কোন নড়াচড়া নেই। রাইফেল হাতে এগিয়ে এলেন না মিলার।

'চলো,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

লম্বা দম নিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়াল সে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই অন্ধকার ডাইনিং রুমে ঢুকে পড়ল ওরা। বদ্ধ বলে বাইরের চেয়ে এখানে গরম কম। নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে এল মিস্ত্রিদের মঞ্চটার। লবির ডাবল ডোরটার দিকে এগোল।

'কেউ নেই,' লবিতে উঁকি দিয়ে কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রবিন।

'দুজনেই বোধহয় বনে চলে গেছে,' অনুমান করল মুসা।

'গেলেই ভাল,' বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।

দেয়াল ঘেঁষে থেকে লবির দিকে এগোল ওরা।

'সামনের ডেস্কে যে ফোনটা আছে,' রবিন বলল, 'সেটাই ব্যবহার করতে পারব আমরা।'

লবিতে ঢুকে টেলিফোনের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল মুসা। 'ডায়াল টোন নেই,' হতাশ ভঙ্গিতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিল কিশোরের হাতে। 'দেখো।'

'সর্বনাশ!' ফিসফিস করে কথা বলার কথা ভুলে গিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন। 'ফোন খারাপ হলে করবটা কি?'

রিসিভার কানে চেপে ধরে বার কয়েক ক্রেডল খটখট করল কিশোর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'টোন এসেছে!'

'জলদি করো!' উত্তেজনায় কিশোরের কাঁধ খামচে ধরল মুসা।

'নম্বর দেখব কি করে? অন্ধকারে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না...'

কোমরে ঝোলানো টর্চটা খুলে নিল মুসা। আলো ফেলল সেটের ওপর। 'করো।'

'নম্বরও তো জানি না। রবিন, জলদি গাইড দেখো।'

নম্বর বলল রবিন।

বোতামগুলো দ্রুত টিপে দিয়ে মুসাকে বলল কিশোর, 'লাইট নেভাও।'

'অপারেটর,' অন্যপাশ থেকে কিশোরের কানে ভেসে এল একটা নাকি কণ্ঠ।

'পাইরেট আইল্যান্ড পুলিশকে দিন, প্লীজ!'

'জরুরী?' সন্দেহ ফুটল নাকি কণ্ঠটায়।

'হ্যাঁ। প্লীজ, তাড়াতাড়ি করুন।'

'এক মিনিট।'

অন্যপাশে খটাখট শব্দ হচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে হোটেলে ঢোকার দরজার দিকে তাকাল কিশোর। মিলারকে ঢুকতে দেখলেই ঝট করে বসে পড়বে ডেস্কের আড়ালে।

অনেক সময়, যেন দীর্ঘ এক যুগ পর কানে বেজে উঠল একটা ভোঁতা গলা, 'পুলিশ!' কণ্ঠটা এমন কেন? যেন মাউথপিসে রুমাল চাপা দিয়ে কথা বলছে।

ভাবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'আঁ!...হালো, আমাদের সাহায্য দরকার। এখুনি।'

'শান্ত হোন। কি সাহায্য?'

'কয়েকজন লোক পাঠান এখানে। ফাঁদে ফেলে আমাদের খুন করার চেষ্টা চলছে...'

'কোনখান থেকে বলছেন?'
'আঁ?…নাইট শ্যাডো…গোস্ট আইল্যান্ড। প্লীজ, এখুনি পাঠান। সাংঘাতিক বিপদে রয়েছি আমরা। ও আমাদেরকে খুন করতে চাইছে।'
'নাইট শ্যাডো?' ওপাশে মনে হয় নামটা লিখে নিচ্ছে পুলিশ।
বড় বেশি ধীরে কাজ করছে মনে হলো কিশোরের। বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন, প্লীজ!'
'শান্ত হোন। বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা। আরও কমও লাগতে পারে।'
কট করে কেটে গেল লাইন।
'ওরা আসছে,' দুই সহকারীকে জানাল কিশোর।
'কতক্ষণ লাগবে?' জানতে চাইল রবিন।
'বিশ মিনিট। বা তারও কম।'
'এই সময়টুকু উলফ আর মিলারের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারলেই বেঁচে যাব,' মুসার কণ্ঠে স্বস্তি। 'চলো, লুকিয়ে পড়ি।'
'কোথায় লুকাব?' রবিনের প্রশ্ন।
কেউ কোন জবাব দেয়ার আগেই দপ করে জ্বলে উঠল লবির লাইট। অফিসের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল একজন মানুষকে।
'খাইছে!' হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। দৌড়ানো দেয়ার কথাও ভুলে গেছে।

আঠারো

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন রোজার মেলবয়েস। পরনে সেই সাদা স্যুট। গলায় লাল রুমাল জড়ানো। উজ্জ্বল আলোর দিকে মুখ করে চোখ মিটমিট করছেন। দ্বিধায় পড়ে গেছেন মনে হলো।
কয়েক সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলল না। তারপর চিৎকার করে উঠল রবিন, 'মিস্টার মেলবয়েস! আপনি বেঁচে আছেন!'
'কি বলছ?" এগিয়ে এসে ডেস্কের ধার খামচে ধরলেন তিনি। অবাক হয়েছেন। 'বেঁচে আছি মানে?'
হুড়াহুড়ি করে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। খুব খুশি হয়েছে। এই দ্বীপে একমাত্র তিনিই ওদের বন্ধু।
সাদা গোঁফের কোণ টানতে টানতে বললেন তিনি, 'তোমাদের এখানে দেখতে পাব ভাবিনি।'
'আমরাও ভাবিনি আপনাকে দেখব,' রবিন বলল। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'
'আছি,' প্রশ্নটাও যেন অবাক করল তাঁকে। 'না থাকার কি কোন কারণ

আছে? এখানে হচ্ছেটা কি?'

'এখানে...' বলতে যাচ্ছিল রবিন।

কিন্তু বাধা দিয়ে বললেন রোজার, 'এত রাতে তোমরা এখানে কেন? ঘরে কি হয়েছে? চেহারার এই অবস্থা কেন! ভিজে চুপচুপে, সারা গায়ে কাদামাটি...এখানে করছটা কি তোমরা?'

'আপনি আমাদের সাহায্য করুন,' তাড়াতাড়ি বলল রবিন। 'পুলিশকে ফোন করেছি আমরা...'

সতর্ক হয়ে উঠল ব্যারনের চোখজোড়া। 'পুলিশ?'

'উলফ আর আপনার ভাই মিলার...'

'কোথায় ওরা?'

'কোরিকেও পাওয়া যাচ্ছে না,' মুসা বলল। 'মিলার আর উলফ রাইফেল নিয়ে তাড়া করেছে আমাদের। বনের মধ্যে গুলিও করেছিল।'

দ্বিধান্বিত ভাবটা অনেক কমল। গাল ডললেন ব্যারন। রবিনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'নিশ্চয় আরেকটা হান্টিং পার্টি?'

'হ্যাঁ। তাই তো বললেন মিস্টার মিলার,' রবিন বলল। 'আপনি আমাদের বাঁচান। থামান ওদের।'

'থামাব?' অদ্ভুত হাসি খেলে গেল ব্যারনের মুখে। পিছিয়ে গেলেন এক পা। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, 'থামাব?'

'হ্যাঁ। আমাদের খুন করতে চায় ওরা। একমাত্র আপনিই আমাদের বাঁচাতে পারেন...'

থেমে গেল রবিন। বদলে যাচ্ছে ব্যারনের চেহারার ভাব। হাসিটা বাড়ছে। হাসছেন কেন ওরকম করে? ওই অদ্ভুত হাসি মুখটা বিকৃত করে দিয়েছে। চেহারাটাও কেমন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

মুসাও তাজ্জব হয়ে গেছে। বেঁচে আছেন তো রোজার? না মরে ভূত হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনার কি অসুস্থ লাগছে, ব্যারন?'

'চমৎকার কথা বলেছ—ওদের থামান! থামান ওদের! হাহ্-হাহ্-হাহ্!' পাগলের মত হেসে উঠলেন রোজার।

'আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। আপনি বসুন।'

'এমন করছেন কেন?' ব্যারনের এই পরিবর্তন দেখে রবিনও অবাক। 'কি যে হলো...আজকের রাতটাই যেন কেমন...'

'ওদের থামাব?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্যারন, 'কেন থামাব?' মাথার চুল খামচি দিয়ে ধরে টানতে শুরু করলেন। হ্যাঁচকা টানে গলা থেকে রুমালটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কোটের বোতাম খুলে ফেললেন।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল রবিন। 'ব্যারন! কি হয়েছে আপনার? অমন করছেন কেন?'

কথাটা কানেই তুললেন না ব্যারন। কোট খুলে ছুঁড়ে ফেললেন ডেস্কে। দুই হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন ডেস্কের ওপর। কয়েক সেকেন্ড ওভাবে

থেকে প্যান্টের পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন। বের করে আনলেন একটুকরো কালো কাপড়। চোখে বাঁধার সেই কাপড়টা। বেঁধে দিলেন চোখের ওপর। এলোমেলো করে দিলেন মাথার সমস্ত চুল। মিলারের কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'হান্টিং পার্টি! হান্টিং পার্টি! কোন কিছুর বিনিময়েই পার্টি আমি বন্ধ করব না!'

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। পায়ে শেকড় গজিয়ে গেছে যেন। স্তব্ধ বিস্ময়ে বোবা হয়ে তাকিয়ে আছে সামনের পরিবর্তিত মানুষটার দিকে।

বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের, এই লোক রোজার নন, তাঁর ভাই মিলার। কোন কারণে রোজার সেজেছিলেন। হয়তো ওদের বোকা বানানোর জন্যেই।

উনিশ

'হান্টিং পার্টি বন্ধ করব?' ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে ওদের মুখোমুখি হয়েছেন এখন মিলার। রোজারের ভদ্র, সৌজন্যে ভরা চেহারা উধাও হয়েছে, সেই জায়গায় বেরিয়ে এসেছে মিলারের বন্য, হিংস্র মুখ। পেছনে মাথা হেলিয়ে অট্টহাসি হেসে ওদের দিকে এক পা এগিয়ে এলেন। 'তোমরা আমাকে হান্টিং পার্টি বন্ধ করতে বলছ?'

'মিস্টার রোজার···মানে, মিলার···প্লীজ!' অনুরোধ করল কিশোর।

গটমট করে একটা চেয়ারের কাছে হেঁটে চলে গেলেন মিলার। ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলটা তুলে নিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল বলে এতক্ষণ চোখে পড়েনি ওদের।

রাইফেলটা চোখের সামনে এনে দেখতে লাগলেন মিলার। পানি মুছলেন বাঁট থেকে।

এদিক ওদিক তাকাল কিশোর। পালানোর পথ নেই। ডাইনিং রুমে যাওয়ার দরজাটা খোলা। কিন্তু ওটা দিয়ে বেরোতে হলে মিলারের পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। আর তা করতে গেলে দরজার কাছে যাওয়ার আগেই গুলি খাবে।

ইস্, গাধার মত ইচ্ছে করে এসে ধরা দিলাম—ভাবল সে। মরার জন্যে! এবার আর মুক্তি নেই। মিলারের হান্টিং পার্টি শেষ হওয়ার পথে।

চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল ট্রফি রুমের দেয়ালে বসানো চারটে নরমুণ্ড। আরও তিনটে যোগ হবে ওগুলোর সঙ্গে। ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা মন থেকে দূর করার জন্যে ঘনঘন মাথা নাড়তে লাগল সে।

ওদের দিকে রাইফেল ঘোরালেন মিলার।

পুলিশ কই? ভাবল কিশোর। এতক্ষণে তো পৌঁছে যাওয়ার কথা।

ওরা না আসা পর্যন্ত ঠেকানো দরকার মিলারকে। কথা বলানো দরকার, যাতে গুলি করার কথা ভুলে থাকে।

রাইফেলের সিলিন্ডার চেক করলেন মিলার। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'লোডেড।'

'এ সব করে পার পাবেন না আপনি!' চিৎকার করে উঠল রবিন। নিজের কানেই বোকা বোকা লাগল কথাটা।

কিশোর বলল মিলারকে, 'ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারি তো আমরা, নাকি?'

আড়চোখে মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল সে। দরজার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ওরা। পুলিশ আসে কিনা দেখছে বোধহয়। রবিনের চেহারা ফ্যাকাসে। ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট মুছছে মুসা। বার বার ঢোক গিলছে। হাত ঢোকানো প্যান্টের পকেটে।

'আলোচনা?' প্রশ্নটা যেন অবাক করেছে মিলারকে।

'আপনি…আপনি সত্যি এখন গুলি করবেন আমাদের?' কোনমতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

রাইফেল নামালেন মিলার। 'না…' বিড়বিড় করে কি বললেন আরও, বোঝা গেল না। টান মেরে শার্টের কয়েকটা বোতাম ছিঁড়লেন। রাইফেলটা মাটিতে নামিয়ে তাতে ভর দিলেন। আরেক হাতে খোলা বুক চুলকালেন। একমাত্র ভাল চোখটা কিশোরের ওপর নিবদ্ধ।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। স্বস্তির। রবিনের চেহারা থেকেও দুশ্চিন্তা কমে গেল। গুলি করবেন না বলেছেন মিলার।

কিন্তু কিশোর স্বস্তি পেল না। এই পাগলের কথায় বিশ্বাস নেই। 'গুলি করবেন না?'

মাথা নাড়লেন মিলার। লবিতে চোখ বোলালেন। 'রোজার গেল কই?'

'রোজার?' জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে আছে মিলারের মুখের দিকে। আশ্চর্য! ভাইকে গুলি করে মারার কথাটা বেমালুম ভুলে গেলেন নাকি? পাগল তো। যেতেই পারেন। মনে করাল না সে। আলোচনা চলুক। সময় নষ্ট হোক। ততক্ষণে পুলিশ চলে আসবে।

'কোথায় ও?' রাগত কণ্ঠে জানতে চাইলেন মিলার। 'আমার এই ভাইটাকে কোনদিন আর পার্টি পছন্দ করাতে পারলাম না। স্পোর্টস ও একদম বোঝে না।'

'শিকার পছন্দ করেন না নাকি তিনি?'

'বোঝে না, এটাই হলো কথা। সেজন্যেই আজ পার্টি শুরুর আগেই ওকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আমি চাইনি বাধা দিয়ে আমার সমস্ত মজা নষ্ট করুক।'

নাহ্, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন মিলার। গুলি করার পর বলেছিলেন রোজার মরে গেছে, এখন বলছেন সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বুক কাঁপছে কিশোরের। এই পাগলকে বিশ্বাস করে কে! বলছেন বটে ওদেরকে বেরোতে দেবেন,

কিন্তু যদি না দেন? অকারণেই খেপে গিয়ে এখনই গুলি শুরু করেন? বাইরে বেরোনোর ছুতো খুঁজতে লাগল সে। বলল, 'চলুন না সবাই মিলে তাঁকে খুঁজে বের করি। আমরা কি দেখব গিয়ে?' মুসা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কিশোর, ওরা ওর চালাকিটা ধরতে পেরেছে কিনা।

'যাবে কোথায় ও, ঠিকই ফিরে আসবে,' তিক্তকণ্ঠে বললেন মিলার। জঘন্য হয়ে উঠেছে মুখের ভঙ্গি। 'ওকে সরানোর কত চেষ্টাই না করলাম। কিন্তু ঠিকই বেঁচে যায়। ফিরে ফিরে আসে।'

'আমাদের কি বেরোতে দেবেন?' মুসা জিজ্ঞেস করল। কিশোরের পেছনে দাঁড়িয়ে একটা হাত রাখল ওর কাঁধে। হাতটা বরফের মত শীতল।

'হ্যাঁ।'

'সত্যি দেবেন?' বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর।

'হ্যাঁ,' হাসি ফুটল মিলারের মুখে।

হঠাৎ যেন শরীরটা পালকের মত হালকা হয়ে গেল কিশোরের। মনে হলো শূন্যে ভাসতে শুরু করেছে। ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে হোটেল থেকে দূরে, দ্বীপ পেরিয়ে, সাগর পেরিয়ে...'

'একঘণ্টা আগে বেরোতে দেব তোমাদের,' হাসছেন মিলার।

ওপর থেকে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল যেন কিশোর। 'কি করবেন?'

'এক ঘণ্টা সময় দেব,' ঘড়ি দেখলেন মিলার। 'তারপর তোমাদের পিছু নেব। আলফ্রেড হিচককের বইতে সেই গল্পটা পড়োনি? দা মোস্ট ডেঞ্জারাস গেম?'

'কিন্তু...আ-আ-আপনি...

'শিকারের এটাই আনন্দ। শিকারকে সুযোগ দেয়া। এ ধরনের স্পোর্টস খুব ভাল লাগে আমার।'

দরজার দিকে তাকাল কিশোর। পুলিশ আসছে না কেন এখনও?

'কথা বলার আর সময় নেই,' ঘড়ি দেখলেন আবার মিলার। মুখ তুলেই চিৎকার করে উঠলেন, 'রেডি, গো! খেলা শুরু!'

'মিলার...প্লীজ...' হাত তুলল কিশোর।

মুসার ঠাণ্ডা হাতটা এখনও খামচে ধরে আছে তার কাঁধ।

রবিন পাথর।

'গুলি করবেন না, প্লীজ!' আবার অনুরোধ করল কিশোর।

ভয়ানক রাগে লাল হয়ে গেল মিলারের মুখ। ঝটকা দিয়ে রাইফেল তুলে বাঁট ঠেকালেন কাঁধে। দেয়াল সই করে ট্রিগার টিপে দিলেন। দুবার। বদ্ধ জায়গায় কামানের গর্জনের মত শব্দ হলো।

চিৎকার করে উঠল রবিন।

'যাও, বেরোও!' তার চিৎকার ছাপিয়ে শোনা গেল মিলারের গলা। 'খেলা শুরু!' তাকিয়ে আছেন রাইফেলের নলের দিকে। দুটো নলের মুখ দিয়েই ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

হিংস্র লোকটার সামনে থাকার সাহস হলো না আর গোয়েন্দাদের। দৌড় দিল দরজার দিকে।

বিশ

আবার ছোটার পালা। কিন্তু যাবে কোনদিকে?

লবি থেকে বেরিয়ে অন্ধকার ডাইনিং রুমে ঢুকল ওরা। চোখ মিটমিট করে দৃষ্টির সামনে থেকে অন্ধকার দূর করতে চাইল কিশোর। বদ্ধ, ভাপসা, ভারী বাতাসে দম আটকে আসতে চাইছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল তিনজনে। বড় জানালাটা দিয়ে আকাশ চোখে পড়ছে। রাতের আকাশ, কিন্তু তারা নেই। মেঘে ঢাকা। ঘর আর বাইরে অন্ধকারের কোন তফাৎ নেই।

বাইরে চলে যাবে? বনে ঢুকে পড়বে আবার? বনই হলো তাড়া খাওয়া জানোয়ারের আশ্রয়স্থল।

'কোথায় যাব?' ফিসফিস করে জানতে চাইল মুসা।

লবির দরজার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। মিলার বেরোন কিনা দেখল।

বেরোলেন না।

কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। 'সুড়ঙ্গটায় ঢুকে পড়লে কেমন হয়?'

'ঠিক!' সমর্থন করল কিশোর। 'পুলিশ না আসাতক লুকিয়ে থাকতে পারব ওখানে।'

পুলিশ! কোথায় ওরা? বিশ মিনিটের বেশি হয়ে গেছে।

'আমারও মনে হচ্ছে ওখানেই নিরাপদ,' ভীতকণ্ঠে বলল রবিন।

অন্ধকারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোল ওরা। খুঁজে বের করল মঞ্চটা। ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'ধরাধরি করে এমনভাবে সরাতে হবে, যাতে শব্দ না হয়...'

ঘরের অন্যপ্রান্তে খসখস শব্দ হলো।

মিলার নাকি?

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মঞ্চটা খুঁজতে শুরু করল কিশোরের চোখ সয়ে এসেছে। আবছামত দেখতে পাচ্ছে চেয়ার-টেবিলগুলোর অবয়ব।

কেউ নেই।

মঞ্চটা সরাল ওরা। সতর্ক থাকার পরেও শব্দ হয়েই গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল কেউ আসে কিনা। এল না দরজাটা খুলল তখন।

সুড়ঙ্গের মধ্যে আরও বেশি গরম। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি। আঠা হয়ে যায় শরীর। ছত্রাকের গন্ধ।

পিঠ চুলকাচ্ছে কিশোরের। দুই কাঁধ ব্যথা করছে। পায়ে তো ব্যথা আছেই। অন্ধকারে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গে পাগলের মত দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল। তাড়াতাড়ি ছুটে কোন লাভ নেই।

রবিনও বুঝতে পারছে সেটা। মনের ভাবনাটাকেই প্রকাশ করে ফেলল, 'লুকানো হয়তো যায়, কিন্তু পালাতে পারব না।'

ওর কাঁধে হাত রাখল মুসা, 'ভয় পাচ্ছ?'

'তুমি পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি।'

'হাঁটো,' কিশোর বলল। 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাও ঠিক নয়।'

'বেশি দূরে যাওয়াটাও ঠিক হবে না,' রবিন বলল। 'পুলিশ এলে শুনতে পাব না।...মুসা, টর্চটা জ্বালো তো। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।'

কোমরে হাত দিয়েই বলে উঠল মুসা, 'যাহ্, গেল!'

'কি?'

'আনতে মনে নেই। লবির টেবিলেই রয়ে গেছে।'

'দারুণ! মরণ বোধহয় আজ ঠেকাতে পারলাম না।'

'দৌড়ে গিয়ে ডাইনিং রুমের আলমারি থেকে খুঁজে নিয়ে আসব নাকি?'

'না, সময় নেই,' বাধা দিল কিশোর। 'হাঁটতে থাকো।'

এগিয়ে চলল ওরা। কান পেতে রেখেছে। মিলার পিছু নিলে যাতে শুনতে পায়। মুখে, মাথায় জড়িয়ে যাচ্ছে মাকড়সার জাল। হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে জ্যান্ত মাকড়সা লাগছে হাতে। কিলবিল করে উঠে যাচ্ছে গায়ের ওপর। থাবা দিয়ে সরাতে গিয়ে একটাকে ভর্তা করে দিল মুসা। ভেজা চটচটে পদার্থ লেগে গেল হাতে। প্যান্টে ডলে মুছল হাতটা।

কতক্ষণ হাঁটল ওরা বলতে পারবে না। অন্ধকারে সময়ের হিসেব রাখা কঠিন। ঢালু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গের মেঝে। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'খাইছে!'

'কি?'

'কি হয়েছে?'

জানতে চাইল রবিন আর কিশোর।

'দরজা!'

'কি করে বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এই তো, কাঠ। হাত দিলেই বোঝা যায়...নিশ্চয় ওই ঘরটা, যেটাতে মড়ার খুলি...' ভয়ে কথাটা আর শেষ করল না মুসা।

কাছে সরে এল কিশোর। 'কই, দেখি?'

ঠেলা দিতে খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে ঢুকে পড়ল তিনজনে। দরজার পাশে দেয়ালে হাত রাখতে সুইচবোর্ডটা পেয়ে গেল কিশোর। আলো জ্বলল। ছাত থেকে ঝুলে থাকা মৃদু পাওয়ারের একটা বাল্ব।

ছোট ঘর। যে ঘরটাতে খুলি দেখেছিল, সেটা নয়। এটা অন্য ঘর। একটা বড় বিছানা আছে। একটা নাইটস্ট্যান্ড, দুই ড্রয়ারের ড্রেসার এবং একটা

টেলিফোনও আছে।

'আরেকবার ফোন করে দেখো না পুলিশকে,' গলা থেকে মাকড়সার জাল টেনে সরাতে সরাতে বলল রবিন, 'ওরা লোক পাঠাল কিনা?'

কথাটা মন্দ না। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর।

নীরব। ডায়াল টোন নেই।

'ডেড,' আনমনে বলল সে।

'হুঁ, আমাদের মত,' বিড়বিড় করল মুসা। 'পার্থক্য শুধু এটা হয়ে গেছে, আমাদের হতে বাকি আছে...'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'এখানকার সব ফোনই কিন্তু একটা সুইচবোর্ডের ভেতর দিয়ে গেছে। মনে নেই সেদিন, গেট থেকে ফোন করার সময়...'

ঝট করে রবিনের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। 'তাই তো! ইস্, কি বোকা আমি! সামনের অফিসে রয়েছে সুইচবোর্ডটা।'

'তাতে কি হয়েছে?' মুসার প্রশ্ন।

'কি হয়েছে এখনও বুঝতে পারছ না?' রিসিভারে আঙুলগুলো চেপে বসেছে কিশোরের। 'সমস্ত কল যায় সুইচবোর্ডের ভেতর দিয়ে। পাইরেট আইল্যান্ডে পুলিশকে যে ফোন করেছি সেটাও গেছে।' রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে দুর্বল ভঙ্গিতে বিছানায় বসে পড়ল সে।

'অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিল মিলার,' রবিন বুঝে ফেলেছে। মুখ কালো হয়ে গেছে তারও। মুসার দিকে তাকাল, 'ওর মুখের রহস্যময় হাসিটা লক্ষ করোনি?'

'আমি করেছি,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কিশোর, 'এতক্ষণে বুঝলাম পুলিশ এল না কেন। ওদের সঙ্গে কথাই বলতে পারিনি। বলেছি মিলারের সঙ্গে। কণ্ঠস্বরটা অমন ভোঁতা শোনাচ্ছিল কেন এখন পরিষ্কার। রিসিভারে রুমাল চেপে ধরে কথা বলছিল।'

'হুঁ, পাগল হলেও বুদ্ধি ঠিক আছে ষোলোআনা,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। ধপ করে কিশোরের পাশে বসে পড়ল সে। 'তারমানে আমাদের উদ্ধার করতে আর আসছে না কেউ।'

'নাহ্,' দরজার দিকে তাকাল কিশোর। 'যা করার আমাদের নিজেদেরই করতে হবে এখন।' ছাতের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, 'আন্ট জোয়ালিন!'

'কি?'

'আন্ট জোয়ালিনের কথা বলছি। কোরি যতবার ফোন করেছে, ততবার সুইচবোর্ডের কাছে বসে বোর্ডটা কন্ট্রোল করেছে মিলার। একটা কলও আন্ট জোয়ালিনের কাছে যেতে দেয়নি। সেজন্যেই মিস ভায়োলার বাড়িতে ফোন করে কোন জবাব পায়নি কোরি। আন্ট জোয়ালিন এখানে আসেন এটা চায়নি মিলার। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে খুশি হয়েছে। তার পার্টির ব্যাপারে নাক গলাতেন তিনি, ঝামেলা তো অবশ্যই করতেন...'

'চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই,' উঠে দরজার কাছে চলে গেল মুসা। 'ডাইনিং রুমের খুব কাছাকাছি রয়েছি আমরা। যে কোন সময় চলে আসতে পারে পাগলটা।'

'কোথায় যাব?' হাতের তালুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে রইল কিশোর।

'সৈকতে। ওখানেই তো পালিয়েছিলাম।'

'কি হবে তাতে?'

'হয়তো হবে না কিছু। কিন্তু এখানে যেমন, ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুরের অবস্থা তো আর হবে না। দৌড়াদৌড়ি করার অন্তত সুযোগ থাকবে।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। ঘরটা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আলোটা নিভিয়ে দিল। তাতে আগের চেয়ে অন্ধকার লাগল সুড়ঙ্গটা। গরমও বেশি লাগছে কেন যেন। বদ্ধ বাতাসে বিশ্রী একধরনের ভাপসা গন্ধ।

'ওই দেখো,' হাত তুলে ফিসফিস করে বলল মুসা।

কিশোরও দেখল। সামনে কয়েক গজ দূরের একটা দরজার ফাঁক দিয়ে হলদে আলো আসছে।

পাতলা আলোর ফালিটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, এই সময় ঘরের ভেতর পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর কাশি।

'খাইছে!' ভয়ে কেঁপে উঠল মুসার গলা। 'ভূত না তো?'

একুশ

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

'ভূতে কখনও কাশে না,' ভয় পাচ্ছে রবিন। ভূতের ভয় নয়।

'তবে কি মিলার?' মুসার প্রশ্ন।

'মেয়েমানুষের কাশি মনে হলো আমার কাছে,' কিশোর বলল।

'মিলারের ঘরের সেই মহিলা!'

'চলো তো দেখি।' পা বাড়াল কিশোর।

'সাবধান,' পেছন থেকে বলল মুসা, 'যা অন্ধকারের অন্ধকার। দেখেশুনে পা ফেলো।'

হঠাৎ কিশোরের চিৎকার কানে এল তার।

দরজার কয়েক ফুট সামনে দাঁড়িয়ে গেল সে আর রবিন।

'কিশোর?' ডাক দিল মুসা।

জবাব নেই।

আশ্চর্য! মুহূর্তে চলে গেল কোথায়? ভূতে গাপ করে দিল নাকি? আতঙ্কিত কণ্ঠে ডাকল আবার, 'কিশোর?'

আলোকিত দরজার অন্যপাশে হুটোপুটি শুরু হলো। ছুটে আসছে যেন কেউ। আবার কাশি শোনা গেল।

'কিশোর, কোথায় তুমি?'

এবারও মুসার ডাকের সাড়া দিল না কিশোর।

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' ফিসফিস করে রবিন বলল, 'গেল কোথায়?'

মিলার শুনে ফেলবে, এই পরোয়া আর করল না মুসা। গলা চড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'কিশোর! কিশোর!'

মুসার হাত আঁকড়ে ধরল রবিন। 'গেল কোথায় ও? একেবারে গায়েব!'

★

বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন কিশোর।

আতঙ্কিত কণ্ঠে রবিন বলল, 'চুপ করে থাকলে হবে না। কিছু একটা করা দরকার।'

'কি করব?'

'অ্যাই কোথায় তোমরা?' কিশোরের ডাক শোনা গেল। 'মুসা?'

'কিশোর!'

'তোলো আমাকে এখান থেকে।'

মুসার মনে হলো মাটির নিচে কোনখান থেকে আসছে কথা। 'কোথায় তুমি?'

'সাবধান, মেঝেতে বিরাট একটা গর্ত আছে। দেয়াল ঘেঁষে।'

'কোন ধরনের ভেন্টিলেশন হবে,' রবিন বলল, 'বাতাস চলাচলের পথ। মুখটা খুলে রাখল কে?'

'যে খুশি রাখুক। আমাকে আগে বের করো এখান থেকে।'

গর্তটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। ওপর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর। তার হাত দুটো চেপে ধরল দুজনে। ওপরে তুলে আনতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না।

'বাপরে বাপ,' ফোঁস করে বাতাস ছেড়ে বলল রবিন, 'আজ এত ভারী লাগল কেন তোমাকে? এক টন ওজন!'

'ক্লান্ত হয়ে পড়েছ আরকি...'

একটা কণ্ঠ থামিয়ে দিল কিশোরকে। আলোকিত ঘরটা থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল কেউ, 'বাইরে কে?' দরজা বন্ধ থাকায় স্পষ্ট হলো না কণ্ঠটা। চাপা, ভোঁতা স্বর।

'আমরা!' জবাব দিল কিশোর।

'বাঁচাও আমাদের! বের করো এখান থেকে!' ককিয়ে উঠল ঘরের ভেতরের কণ্ঠটা।

খোলা ভেন্টের কাছ থেকে সরে এসে দরজাটার দিকে এগোল কিশোর। আবার যাতে অন্য কোন গর্তে পড়ে না যায় সেজন্যে সাবধান রইল। দরজাটা খোলার চেষ্টা করে বলল, 'তালা দেয়া।'

ওর পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। পাল্লায় কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলা দিল। মচমচ করে উঠল পুরানো কাঠ। 'মনে হচ্ছে ভেঙে ফেলা যাবে। তোমরাও এসো।

তিনজনে মিলে ঠেলে দেখি।'

হাসল রবিন, 'ঢুকে যদি দেখো তোমার ভূতটা দাঁড়িয়ে আছে?'

'দেখব না। কারণ দরজা বন্ধ করে ভূত আটকে রাখা যায় না। ঠিক বেরিয়ে চলে আসত। ভেতরে মানুষই আছে।'

পিছিয়ে এসে 'রেডি ওয়ান টু থ্রী' বলে তিনজনেই একসঙ্গে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজাটার ওপর। মড়মড় করে ভেঙে গেল পাল্লা। এত সহজে কাজ হয়ে যাবে ভাবেনি ওরা। পুরানো কাঠ আর কজা বলেই সম্ভব হলো।

ঘরের ভেতর চোখ পড়তে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল তিনজনেই।

বাইশ

'কোরি! তুমি এখানে?' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'আমরা তো ভাবলাম...'

আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। ছোট ঘরটার অন্য প্রান্তে নড়াচড়া চোখে পড়ল। অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে এলেন আন্ট জোয়ালিন।

'আন্টি! আপনি!'

'আমাদের খুঁজে পেলে কি করে?' কোরির মুখে হাসি চোখে পানি।

'তোমরা এখানে এলে কি করে, সেটাও তো আমাদের প্রশ্ন!'

'সে এক লম্বা কাহিনী,' মাথা নেড়ে বললেন আন্ট জোয়ালিন।

'কবে এসেছেন?'

'তোমাদের পরদিনই,' চুলে আঙুল চালিয়ে সোজা করার চেষ্টা করলেন তিনি। অনেকদিন চিরুনি ব্যবহার করতে পারেননি। 'পরদিন সকালে উঠেই ব্যথা সেরে গেল। ভাল বোধ করলাম। চলে এলাম সেদিনের লঞ্চেই। গাড়িতে করে রোজার আমাকে হোটেলে নিয়ে এল। কিন্তু তারপর... তারপর...'

'আন্টিকে জোর করে এনে এই ঘরের মধ্যে আটকে রাখল,' আন্টির কথা আটকে যেতে কোরি বলে দিল। 'জানা গেল ওই লোক রোজার নয়, মিলার।'

'দেখতে রোজারের মতই,' অনিশ্চিত শোনাল আন্ট জোয়ালিনের কণ্ঠ। 'বিশ বছর হলো ওর সঙ্গে দেখা নেই আমার। কোরিকে বলেছি সেকথা। রোজার আমার দূর সম্পর্কের খালাত ভাই।'

'তাই নাকি?' রবিন বলল। 'তাঁর সঙ্গে আপনার ছবি দেখে আমরা তো অবাক...'

কোরি বলে উঠল, 'মেলবয়েসরা আমাদের আত্মীয়।'

'শোনো,' জরুরী গলায় কিশোর বলল, 'অনেক কিছু ঘটে গেছে। আমাদের খুন করার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে মিলার।'

'কি?' চিৎকার করে উঠল কোরি। আন্টির দিকে তাকাল। চুপ করে রইলেন তিনি।

কিশোর বলল, 'মিলার একটা উন্মাদ।'

'এজন্যেই এনে আমাকে এখানে আটকে রাখতে পারল,' আনমনে মাথা নাড়তে লাগলেন আবার আন্ট জোয়ালিন।

'সব বলার সময় নেই এখন। মস্ত বিপদের মধ্যে রয়েছি আমরা।'

'আসার পর থেকে এখানেই আটকে আছেন নাকি আপনি?' জানতে চাইল রবিন। 'হান্টিং পার্টি নিয়ে আপনিই মিলারের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন?'

'পার্টি? আমি তর্ক করেছি?' ভুরু কুঁচকে গেল আন্ট জোয়ালিনের। রবিনের কথা যেন বুঝতে পারছেন না।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কোরি, তুমি এখানে এলে কি করে?'

'আমি? মিলার আমাকে এই সুড়ঙ্গে ঢুকতে দেখেছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল আমি আন্টিকে দেখে ফেলব। রাতে পেন্টাকল বানিয়ে যখন প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলাম, পা টিপে টিপে আমার ঘরে ঢুকল সে। পেছন থেকে এসে মুখ চেপে ধরে গলায় ছুরি ঠেকিয়ে নিয়ে চলে এল এখানে। ভয়ে টুঁ শব্দ করিনি।'

'সুড়ঙ্গে ঢুকেছিলে কেন?'

লাল হয়ে গেল কোরির গাল। লজ্জা পাচ্ছে বলতে। মুখ নিচু করে বলল, 'তোমাদের কাছে মাপ চাওয়া উচিত আমার।'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। কেন মাপ চাওয়া উচিত, বুঝতে পারছে না।

'সুড়ঙ্গটার কথা আমি আগে থেকেই জানতাম। তোমাদের বলিনি। সৈকতের দিক দিয়ে যে ঢুকতে হয় জানতাম। সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে যাই ঢোকার মুখটা।'

'কিন্তু আমাদের বলতে অসুবিধেটা কি ছিল?' জানতে চাইল কিশোর।

'ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম তোমাদের। ভূত দেখানোর কথা বলে নিয়ে এসেছি তোমাদের। কিন্তু দেখাতে পারছিলাম না। সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখটা পেয়ে গিয়ে ঠিক করলাম ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটাব, যাতে তোমরা দ্বিধায় পড়ে যাও। ভাবো, ভূত আছে। তোমাদের ভয় দেখানোর জন্যে খুলিতে ক্রীম মাখিয়ে নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছিলাম টেবিলে। ওটাও পেয়েছিলাম সুড়ঙ্গে। ঘরের দেয়ালে লাল রঙ মাখিয়ে রেখেছিলাম।'

'এই ব্যাপার!' হতাশ মনে হলো মুসাকে। সে ভেবেছিল সত্যি সত্যি ভূত আছে ঘরটায়।

মাথা ঝাঁকাল কোরি। 'তোমাদেরকে ভূত বিশ্বাস করানোর জন্যে আরও অনেক কাণ্ড করেছি আমি। সেদিন সন্ধ্যায় গরম কাপড় নিতে হোটেলে গিয়ে অহেতুক চিৎকার করে উঠেছিলাম। তোমাদের বলেছি ভূত দেখেছি। আসলে কোন কিছু দেখিনি। কিশোর যখন রাতে উঠে পানি খেতে রান্নাঘরে যাচ্ছিল, ওর পিছু নিয়েছিলাম। ফিসফিস করে ওর নাম ধরে ডাকা, শেকলের শব্দ, বীণা

বাজানো, সব শব্দ রেকর্ড করা। ওর পেছনে লুকিয়ে থেকে আমার মিনি ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজিয়েছি। শুধু এই না, আরও অনেক শয়তানি করেছি। ডাইনিং রুম দিয়ে তোমাদের সঙ্গে সুড়ঙ্গে ঢুকে ভয় পাওয়ার অভিনয় করেছি, কোন দিক দিয়ে বেরোতে হয় জানা থাকা সত্ত্বেও ঘুরিয়ে মেরেছি·তবে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে যদি বাঁয়ের সুড়ঙ্গটায় ঢুকে পড়তাম, তাহলেই কাজ হয়ে যেত। এ ঘরের দরজাটা দেখে ফেলতাম। পেয়ে যেতাম আন্টিকে। কাজের কাজ তো কিছু করলামই না, অকারণে···'

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল সে, 'আমাকে মাপ করে দাও। এসব ছেলেমানুষীর জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। গাধামি করেছি।'

'যাকগে, ভুলে যাও ওসব কথা। আমরা কিছু মনে করিনি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু আর সময় নষ্ট করা চলবে না। তাড়াতাড়ি সরে যেতে হবে এখান থেকে। দরজা ভাঙতে গিয়ে অনেক শব্দ হয়েছে। উলফ কিংবা মিলারের কানে গিয়ে থাকলে যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে।'

'চলো,' রবিন বলল, 'সবাই সৈকতে বেরিয়ে যাই।'

'আমার কোন আপত্তি নেই,' আন্ট জোয়ালিন বললেন। 'এখানে আটকে থেকে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আমার। মরেই যেতাম। এই দুর্গন্ধের মধ্যে মানুষ থাকতে পারে নাকি···'

পা বাড়াতে গিয়ে টলে উঠলেন তিনি। পড়ে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল কোরি। লাফ দিয়ে গিয়ে আরেকপাশ থেকে ধরল মুসা।

'কি হলো? আন্টি?' চিৎকার করে উঠল কোরি।

চোখ মেললেন আন্ট জোয়ালিন। দুর্বল কণ্ঠে বললেন, 'মাথা ঘুরছে। চোখে অন্ধকার দেখছি। খোলা বাতাস দরকার।'

'মনে হয় এসবের জন্যে খিদেও দায়ী,' উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে কোরি। 'সারাদিনে একবার মাত্র খাবার দিয়ে গেছে মিলার। তাতে কি কিছু হয়।'

'এত দুর্বল শরীর নিয়ে এতবড় সুড়ঙ্গ পেরোতে পারবেন না আপনি,' কিশোর বলল। 'খাবার দরকার। যাই, দেখি কিছু আনতে পারি কিনা।'

'রান্নাঘরে গেলেই পাওয়া যাবে,' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল রবিন।

'কোনদিক দিয়ে যাবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'উলফ আর মিলার···'

'যেদিক দিয়েই যাই না কেন,' কিশোর বলল, 'ওদের সামনে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিটা থাকবেই। যা হয় হবে। দৌড়ে গিয়ে আগে কিছু খাবার নিয়ে আসি। আমরা যাচ্ছি। তোমরা আন্টিকে ধরে ধরে আনো।'

আগে আগে চলল কিশোর আর রবিন। আন্ট জোয়ালিনকে নিয়ে সাবধানে এগোল মুসা আর কোরি।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'জালের ছড়াছড়ি। মাকড়সাকে ভয় পান, আন্টি?'

'না।'

'তাহলে হাঁটতে থাকুন। আর তেমন কোন অসুবিধে নেই।'

ভয় না পেলেও মাকড়সার জাল মুখে, মাথায় জড়িয়ে গেলে বিশ্রী লাগে। অস্বস্তিকর। অন্ধকারে ওগুলোকে দেখাও যায় না। এড়ানোরও উপায় নেই।

আরেকটা ভয় পাচ্ছে মুসা, অন্ধকারে পথ হারানোর। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই দরজাটা পেয়ে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আস্তে করে পাল্লাটা ঠেলে ডাইনিং রুমে পা রাখল কিশোর। পেছনে ঢুকল রবিন।

কেউ আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল কিশোর। নেই দেখে আন্টিকে নিয়ে মুসা আর কোরিকে ঢুকতে বলল।

'কি করব?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এত অন্ধকারে খাবার বের করা যাবে না। আলো জ্বালতেই হবে,' কিশোর বলল।

রান্নাঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল সে। স্টেনলেস স্টীলের ওঅর্ক কাউন্টারটা ঝকঝকে পরিষ্কার। তাকে সাজানো বড় বড় তামার পাত্র।

দরজার দিকে তাকাল কিশোর। উলফ আর মিলার এখন কোথায়? নিশ্চয় বনের ভেতর ওদের খুঁজছে। কিছুক্ষণের জন্যে এখানে ওরা নিরাপদ। কিন্তু বন থেকে ফিরে এলেই রান্নাঘরের আলো চোখে পড়বে ওদের। তারপর···

যা হয় হবে। ভাবতে চাইল না আর সে।

রান্নাঘরের একটা টেবিলের সামনে আন্ট জোয়ালিনকে বসিয়ে দেয়া হলো। রক্তশূন্য হয়ে গেছে তাঁর মুখ। রেফ্রিজারেটরে খাবার খুঁজতে লাগল রবিন। বড় এক বাটি টিউনা সালাদ বের করে এনে রাখল আন্ট জোয়ালিনের সামনে। 'চলবে এতে? আর কিছু পেলাম না।'

'খুব চলবে,' লোভাতুর চোখে খাবারের বাটিটার দিকে তাকালেন আন্ট জোয়ালিন।

দুটো প্লেট আর দুটো কাঁটা চামচ এনে দিল রবিন। কোরিও আন্টির মতই ক্ষুধার্ত। কেবল বয়েস অল্প আর আন্টির মত অসুস্থ নয় বলে দুর্বল হয়ে পড়েনি।

খাবারের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্ট জোয়ালিন। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলেন। কোরি তাঁর মত গোগ্রাসে না হলেও বেশ দ্রুতই খাচ্ছে।

কয়েক মিনিট পর চামচটা রেখে সোজা হলেন আন্ট জোয়ালিন। খানিকটা রক্ত ফিরে এসেছে মুখে। কাগজ দিয়ে মুখ মুছে পানি খেলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ, এবার বলো দেখি কি ঘটছে এখানে?'

জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। ঝুলে পড়ছে নিচের চোয়াল।

কি দেখে ভয় পেল সে দেখার জন্যে ঘুরে তাকাল মুসা। চমকে গেল কিশোরের মতই।

ঘুরে ঢুকেছে উলফ।

তেইশ

'পালাও!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল উলফ। এলোমেলো চুল।

'কিশোর, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

অনেকটা কোমল হয়ে এল উলফের দৃষ্টি। মুসার চিৎকার দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে তাকে। এতক্ষণে নজর পড়ল আন্ট জোয়ালিনের ওপর। স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি। চোখে অবিশ্বাস। 'মিস জোয়ালিন! আপনি!'

'উলফ, তুমি! আছ তাহলে এখনও রোজারের সঙ্গেই,' আন্ট জোয়ালিন বললেন। 'হচ্ছে কি এখানে বলো তো? আমাকে তালা দিয়ে রেখেছিল কেন? এত ভয় পাচ্ছে কেন ছেলেগুলো?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল উলফ। ঝুলে পড়ল কাঁধ। পুরো শরীরটাই কুঁকড়ে ধসে পড়বে যেন। ওর হাতে রাইফেল নেই দেখে স্বস্তি বোধ করছে কিশোর।

'নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছেন রোজার,' উলফের ছোট কাঁধ দুটো সামান্য ওপরে উঠে আবার নেমে গেল।

'ওকে আমাকে আনতে গেল যখন,' আন্ট জোয়ালিন বললেন, 'চুল উস্কখুস্ক, ময়লা কুঁচকানো কাপড়-চোপড়। একেবারে বুনো। অবাক হয়েছিলাম। ভাবছিলাম এ রকম তো সে ছিল না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেই ভালবাসত। যাই হোক, আমাকে নিয়ে গিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে নোংরা একটা ঘরের মধ্যে ভরে তালা দিয়ে রেখেছিল। এইমাত্র এই ছেলেগুলো আমাকে বের করে এনেছে।'

মাথা নেড়ে উলফ বলল, 'আমি এসবের কিছুই জানি না।' এগিয়ে এসে আন্ট জোয়ালিনের দুহাত চেপে ধরল। 'সত্যি জানি না। বিশ্বাস করুন। তাহলে অনেক আগেই বের করে নিয়ে আসতাম।'

তাকিয়ে আছে কিশোর। উলফের আচরণে অবাক হচ্ছে। লোকটাকে বিশ্বাস করার কিছু নেই। তবে হাতে যেহেতু বন্দুক নেই, কিছু করতে পারবে না। আন্ট জোয়ালিনের আচরণেও অবাক হলো সে। মনে হচ্ছে লোকটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন তিনি।

'আপনাকে তালা দিয়ে রেখেছিল, বিশ্বাসই করতে পারছি না আমি,' উলফ বলছে। 'তারমানে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে। তাকে দিয়ে এখন সবই সম্ভব।' আন্ট জোয়ালিনের হাত ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে ধপ করে একটা বেঞ্চে বসে পড়ল সে।

উলফের এটা অভিনয় কিনা বুঝতে পারছে না কিশোর। সাবধানে রান্নাঘরের দরজার দিকে সরে যেতে শুরু করল। আড়চোখে মুসার দিকে

তাকাল। কোরি আর রবিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। দুই হাত প্যান্টের পকেটে। উলফের দিকে নজর।

'কিন্তু এই অবস্থা হলো কি করে উলফ?' আন্ট জোয়ালিন বললেন। 'ও তো এমন ছিল না।'

'না, ছিল না। তিরিশ বছর ধরে দেখছি মেলবয়েসদের। শুধু রোজারের চাকরিই করছি পনেরো বছর। ওকে আর এখন মনিব মনে করি না আমি, ভাইয়ের মত দেখি।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল উলফ, 'ভয়ানক অসুস্থ একজন ভাই।'

'কোথায় এখন ও?'

'বনের মধ্যে,' চট করে একবার কিশোরের দিকে তাকিয়ে নিল উলফ, 'আর কোথায়।'

'বনে? এ সময়ে?' উলফকে জবাব দেয়ার সুযোগ দিলেন না আন্ট জোয়ালিন। মনে জমে থাকা প্রশ্নগুলো হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে শুরু করল, 'হোটেলটা বন্ধ কেন? রোজার আমাকে বলল, ছেলেমেয়েগুলোকে কাজ দেবে হোটেলে। গেস্টরাই বা কোথায়? সবাইকে তালা আটকে রেখেছে নাকি?'

আন্ট জোয়ালিনের কোন কথারই জবাব দিল না উলফ। কোলের ওপর দুই হাত রেখে আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। 'আমি ভেবেছিলাম রোজারকে সামলাতে পারব। কিন্তু ভুল করেছি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে চুপচাপ বসে রইল একটা মুহূর্ত। তারপর বলল, 'এই নির্জন দ্বীপে ওকে নিয়ে আসার কারণ, প্রথমবার যখন বেড়াতে এলাম, খুব আনন্দ পেয়েছিল সে এখানে এসে। সমস্যা আছে ওর। সাংঘাতিক সমস্যা। ভেবেছিলাম এখানে এলে ঠিক হয়ে যাবে। হোটেলটাকে ঠিকঠাক করে নিয়ে এখানেই থাকার বন্দোবস্ত করলাম। নিয়মিত শোরটাউনে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতাম। ভাবলাম সেরে উঠবে। কিছুই হলো না। রোগটা আরও বাড়ল।'

'কিন্তু ও তো ভাল ছিল,' আন্ট জোয়ালিন বললেন। 'অবশ্য সেটা বহুকাল আগের কথা। অনেক দিন আর তার সঙ্গে দেখা নেই...যদি বুঝতাম এই অবস্থা, কিছুতেই আসতাম না...'

'আপনাকে যে আসতে বলেছে, ছেলেমেয়েদের কাজ দেবে বলেছে, আমিও জানি না। চলে আসার পর ওদের বিদেয় করার জন্যে বহু চেষ্টা করেছি আমি,' আন্ট জোয়ালিনের দিকে তাকাল উলফ। 'কোরিকে সুড়ঙ্গে ঢুকতে দেখেছি। বুঝলাম, সবাই ঢুকবে ওরা। একটা বুদ্ধি করলাম। কিছু সময়ের জন্যে সুড়ঙ্গে আটকে দেব। ভয় পেয়ে পালাবে তখন। নজর রাখলাম। সুযোগ পেয়ে আটকে দিলামও। কিন্তু গেল না ওরা।'

আবার জোরে নিঃশ্বাস ফেলল উলফ। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'রলিনের মৃত্যুর পরই রোগটা হয়েছে ওর। মানসিক রোগ। রীতিমত খেপে ওঠে একেক সময়। মানুষ খুন করার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। ও বলে মানুষ

শিকার। প্রথম যখন বলল আমাকে, ভাবলাম রসিকতা করছে। কয়েকটা মোমের মুণ্ডু এনে যখন ট্রফি রুমে দেয়ালে সাজাল, তখনও ভাবলাম রসিকতা। কিন্তু পরে বুঝলাম, রসিকতা নয়। কাউকে খুন করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। মাথাটা যখন বিগড়ে যায়, সত্যি সত্যি মানুষ খুন করতে পারবে। ভয়ানক অসুস্থ সে, বললাম না।'

উলফের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। তাহলে মুণ্ডুগুলো আসল মানুষের নয়। উন্মাদ রোজারের প্রথম আসল শিকার তাহলে ওরাই হতে যাচ্ছে।

'পাগল হলো কেন?' জানতে চাইলেন আন্ট জোয়ালিন।

'আপনি কি জানেন কয়েক বছর আগে শিকারে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যায় রলিন? তারপর থেকেই খেপা হয়ে যায় রোজার। মনটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অদ্ভুত এক রোগ। এ রোগ হলে নিজেকে অন্য কেউ কল্পনা করতে থাকে রোগী। রোজারের বেলায়ও তাই ঘটল। নিজেকে অন্য কেউ কল্পনা করে নিজের মানসিক যন্ত্রণার বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাঁচতে চায়। যন্ত্রণা যখন বেড়ে যায়, নিজেকে ইচ্ছেমত অন্য মানুষ কল্পনা করে নেয়। একা একা কথা বলে।'

'এতই খারাপ অবস্থা!'

মাথা ঝাঁকাল উলফ। 'আপনার সঙ্গে ডকে দেখা করার সময় নিশ্চয় নিজেকে মিলার কল্পনা করেছে সে। বুনো, খেপাটে মিলার।'

'তাই হবে!'

খোলা রান্নাঘরে নিরাপদ বোধ করছে না কিশোর। ভয়ঙ্কর ওই পাগলকে দিয়ে সব সম্ভব। দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে উলফকে জিজ্ঞেস করল, 'মিলার কি এখনও বনেই আছেন?'

'তাই তো মনে হয়।'

'আমরা কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারি না?'

'কোনও জায়গা নেই। সব চেনে সে। ঠিক খুঁজে বের করে ফেলবে।'

'বের করে কি করবে?' বুঝতে পারছেন না আন্ট জোয়ালিন।

'কি আর, খুন,' বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল উলফ, 'যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে সে, বললামই তো। সে এখন নিজেকে মিলার কল্পনা করছে। আর যখন তা করে, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়।'

কড়া চোখে উলফের দিকে তাকাল কিশোর। 'সবই যদি জানেন, পুলিশকে খবর দিচ্ছেন না কেন? কেউ খুন হয়ে যাক চান নাকি?'

হতাশ ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল উলফ, 'কি করে দেব? টেলিফোনের লাইন সব ছিঁড়ে ফেলেছে। নৌকা নিয়ে ডাক্তার কিংবা পুলিশকে খবর দিতে যাব ভেবে নৌকাগুলোও লুকিয়ে ফেলেছে। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে ওগুলোই খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'তারপর?' উলফের চেহারা দেখেই আন্দাজ করতে পারছে কিশোর জবাবটা কি হবে।

'খুঁজে পাইনি। ডুবিয়ে দিল কিনা কে জানে!'

'কি খুঁজে পাচ্ছ না? কিছু হারিয়েছ নাকি?' রান্নাঘরের দরজার কাছে গমগম করে উঠল একটা ভারী কণ্ঠ।

ভীষণ চমকে গেল কিশোর।

রাইফেল হাতে ঘরে ঢুকলেন রোজার মেলবয়েস।

চব্বিশ

মিলার সেজেছেন এখন ব্যারন। চোখে কালো কাপড়। হাতে হান্টিং রাইফেল। চুলগুলো সব এলোমেলো। গায়ে ময়লা কুঁচকানো সাফারি জ্যাকেট আর পরনে ময়লা কাদামাখা প্যান্ট বনে ঘুরে আসার চিহ্ন বহন করছে।

ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে একেবারে ছিটকানি তুলে দিলেন তিনি। যাতে কেউ বেরোতে না পারে। বুনো, উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন সবার দিকে।

'রোজার...' বলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা বোঁ করে উঠল আন্ট জোয়ালিনের। দেয়ালে ঠেস দিয়ে সামলে নিলেন।

'রোজার চলে গেছে,' ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠলেন ব্যারন। 'শিকারের মজা ও বোঝে না।'

'যাও, রোজারকে নিয়ে এসো,' আদেশ দিলেন আন্ট জোয়ালিন। 'যাও। আমি তোমাকে যেতে বলছি। ওর সঙ্গে কথা আছে আমার।'

জ্বলন্ত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্যারন।

'যাও,' কণ্ঠস্বর চড়িয়ে আদেশ দিলেন আবার আন্ট জোয়ালিন, 'নিয়ে এসো রোজারকে!'

কয়েক সেকেন্ড তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে উলফের দিকে ঘুরলেন ব্যারন, 'এখানে কি তোমাদের?'

'রোজার...' কোমল গলায় বলতে গেল উলফ।

'আমি মিলার!' গর্জে উঠলেন ব্যারন।

'যাও, রোজারকে নিয়ে এসো,' আবার বললেন আন্ট জোয়ালিন।

বদলে গেল ব্যারনের দৃষ্টি। দ্বিধান্বিত ভঙ্গিটা নেই আর। বোঝা গেল আন্ট জোয়ালিনের নির্দেশ অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। রাইফেলটা তুলতে শুরু করলেন।

'না না, নামান! নামিয়ে রাখুন!' চিৎকার করে উঠল উলফ। দৌড় দিল ব্যারনকে ঠেকানোর জন্যে।

রাগে প্রচণ্ড চিৎকার করে রাইফেলের বাঁট দিয়ে উলফের মাথার একপাশে বাড়ি মারলেন ব্যারন।

চিৎকারের ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে গেল উলফের মুখ। কিন্তু স্বর বেরোল না। চোখ উল্টে কাটা কলাগাছের মত ধড়াস করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। তার অনড় দেহটার দিকে তাকিয়ে আছেন ব্যারন। এই সুযোগে রান্নাঘরের দরজার দিকে দৌড় মারল তিন গোয়েন্দা।

চিৎকার শুরু করল কোরি, 'ছিটকানি খোলো! ছিটকানি খোলো!' দিশেহারার মতো সে-ও দৌড় দিল একদিকে।

কারও দিকে নজর নেই ব্যারনের। ভারী হয়ে গেছে নিঃশ্বাস। উলফের দিকে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলতে লাগলেন, 'আমার বিরুদ্ধে বানিয়ে কথা বলবে আর? তুমি ভেবেছ আমি কিছুই জানব না। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সব শুনেছি আমি।' ঝট করে ফিরে তাকালেন দরজার দিকে, চোখ পড়ল কিশোরের ওপর—ছিটকানি খোলার চেষ্টা করছে সে। গর্জে উঠলেন, 'খবরদার! হাত সরাও!'

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন আন্ট জোয়ালিন। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দরজাটা খুলে দাও, রোজার। সবাইকে বেরোতে দাও।'

তাঁর কথা কানেই তুললেন না ব্যারন। উলফের দিকে তাকালেন, 'কেন এতগুলো মিথ্যে কথা বললে উলফ? আমি মনে করেছিলাম তুমি আমার বন্ধু,' জুতোর ডগা দিয়ে উলফের পাঁজরে গুঁতো মারলেন তিনি। 'কিন্তু তুমি তো আমার ভয়াবহ শত্রু। নইলে এত মিছে কথা কেউ বলে?'

ফিরে তাকালেন আবার দরজার দিকে। তিন গোয়েন্দা আর কোরি সবাই গিয়ে জড়ো হয়েছে সেখানে।

'উলফ আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে,' ক্রূর হাসি ছড়িয়ে পড়ল ব্যারনের মুখে। 'সবাইকে একজায়গায় করে রেখেছে।'

রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। কি যেন মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। শান্ত থাকার চেষ্টা করল সে। বাঁচতে চাইলে এখন আর হুড়াহুড়ি না করে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

'অনেক সহজ,' চওড়া হচ্ছে ব্যারনের হাসিটা।

তাকিয়ে আছে কিশোর।

রাইফেল তুলে বাঁট কাঁধে ঠেকালেন ব্যারন।

রাইফেল!

বনের মধ্যে ওই রাইফেল দিয়ে ওদের গুলি করেছেন তিনি।

হোটেলের লবিতে করেছেন।

'ঘরের মধ্যেই কাজটা সারতে পারব,' শিকারকে কোণঠাসা করতে পেরে শিকারী নেকড়ের মত ঠোঁট চাটলেন ব্যারন। ভয়ানক উন্মাদ, কোন সন্দেহ নেই।

নিশানা করার ভঙ্গিতে রাইফেলটা শক্ত করে চেপে ধরলেন তিনি।

চোখ সরায়নি কিশোর।

'না, রোজার না!' চিৎকার করে বললেন আন্ট জোয়ালিন। 'প্লীজ, গুলি কোরো না ওদের! তোমাকে মিলার ডাকলে যদি খুশি হও, তাহলে তাই সই!

গুলি কোরো না, মিলার!'

রাইফেলের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। মনে পড়ছে না কেন? কি মনে করতে চাইছে সে?

'না না, প্লীজ, মিলার,' বলেই চলেছেন আন্ট জোয়ালিন, 'গুলি কোরো না!'

মুসার দিকে নিশানা করলেন ব্যারন। রবিনের দিকে সরালেন। আবার ফেরালেন মুসার দিকে।

বিদ্যুৎ চমকের মত কথাটা মনে পড়ে গেল কিশোরের। সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল সে। ব্যারনের দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'ঠিক আছে, গুলি যখন করতেই চান, আমাকে আগে করুন।'

পঁচিশ

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করলেন ব্যারন। তারপর রাইফেলের নল ঘোরালেন কিশোরের দিকে। হেসে বললেন, 'বাহ্, সাহসী ছেলে। স্পোর্টসম্যান সুলভ আচরণ। আরও সহজ করে দিলে আমার কাজ। আমার তরফ থেকে স্পোর্টস বলা যাবে না এটাকে। তবে সুযোগ একটা তোমাদের দিয়েছিলাম আমি। পালাতে পারোনি, আমার কি দোষ?'

'গুলি করুন,' আরেক পা আগে বাড়ল কিশোর।

নিশানা করলেন ব্যারন। কাঁধ থেকে নামালেন রাইফেলটা। অনিশ্চিত ভঙ্গি।

'করুন। গুলি করুন,' আরও সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর।

রাইফেল আরেকটু নিচে নামালেন ব্যারন।

'কিশোর,' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি?' দৌড়ে এসে টেনে সরানোর চেষ্টা করল কিশোরকে।

ঝাড়া দিয়ে মুসার হাত ছাড়িয়ে নিল কিশোর। ব্যারনের চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে আগে বাড়ল। 'দিন, মিস্টার রোজার, রাইফেলটা আমার হাতে দিন,' কোমল স্বরে বলে ওটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল সে।

'আমি রোজার নই, মিলার,' ভোঁতা গলায় বললেন ব্যারন।

হাত সরাল না কিশোর। 'দিন, রাইফেলটা।'

শূন্য দৃষ্টি ফুটেছে ব্যারনের চোখে।

'রাইফেলটা,' কোমল কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল কিশোর।

কুঁচকে যাচ্ছে ব্যারনের চেহারা। কপাল আর গালের ভাঁজগুলো গভীর হচ্ছে। দ্বিধায় পড়ে গেছেন। শেষে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে আবার কাঁধে তুলে নিলেন রাইফেল।

'দিন রাইফেলটা,' সেই একই কণ্ঠে বলল কিশোর।

'কিশোর, সরো!' চিৎকার করে বলল মুসা, 'তুমি বুঝতে পারছ না, ওই পাগলটা তোমাকে গুলি করবেই!'

'করুক না,' আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেছে কিশোরের কণ্ঠ। 'করুন, মিস্টার মিলার, গুলি করুন আমাকে।'

কিশোরের বুকের দিকে নিশানা করলেন ব্যারন। দ্বিধা করলেন না আর। পর পর দুবার ট্রিগার টিপলেন। বন্ধ ঘরে ভয়াবহ শব্দ। থরথর করে কেঁপে উঠল জানালার কাঁচ।

একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সকলে। তাদের সম্মিলিত চিৎকারও রাইফেলের বিকট শব্দের তুলনায় কিছু না।

ছাব্বিশ

'মিস্টার রোজার,' কিশোর বলল, কাঁপছে এখন কণ্ঠ, 'গুলি তো করলেন। এবার দিয়ে দিন রাইফেলটা।'

ব্যারনের চোখে অবিশ্বাস। কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। রাইফেলের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

'কিশোর...' আবার চিৎকার করে উঠল মুসা।

ফিরল না কিশোর। ব্যারনের দিকে তাকিয়ে আছে। 'দিন, রাইফেলটা।'

ঝট করে আবার রাইফেল কাঁধে তুলে কিশোরকে সই করে গুলি করলেন ব্যারন।

আবার চিৎকার করে উঠল সকলে।

কিশোর তার জায়গা থেকে নড়ল না।

'তুমি...তুমি মানুষ নও!' বিড়বিড় করে বললেন ব্যারন। 'ভূত! প্রেতাত্মা!' এক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি। নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেটার দিকে তাকালেন। ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে ছাতের দিকে। সেদিকে তাকালেন। তাঁর পেছনে প্রায় দলা পাকিয়ে বেঞ্চে বসে আছেন আন্ট জোয়ালিন। শরীরটাকে ধরে রাখতে পারছেন না আর।

'রাইফেলটা দিন,' কিশোর বলল।

'না!' চিৎকার করে উঠলেন ব্যারন। 'তুমি যদি ভূত হয়ে থাকো, অন্য কাউকে গুলি করব আমি। গুলি করে দেখব মরে কিনা।'

আরও এক পা পিছিয়ে গেলেন ব্যারন। রাইফেলের নল ঘোরালেন রবিনের দিকে। দ্বিধা করলেন। কেঁপে গেল হাত। বদলে যাচ্ছে চেহারার ভঙ্গি।

'না, মিলার! অনেক হয়েছে, আর গোলাগুলির দরকার নেই!' বলে উঠল একটা মহিলাকণ্ঠ।

কিশোর ভাবল, আন্ট জোয়ালিন বলেছেন। কিন্তু ব্যারনের পেছনে

নেতিয়ে রয়েছেন তিনি। কপাল টিপে ধরেছেন। কথা বলারও শক্তি নেই। তারমানে তিনি বলেননি।

'আমার ইচ্ছে!' মহিলার কথার জবাবে মিলারের কণ্ঠে কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন ব্যারন। 'তুমি বাধা দেবার কে? রলিন, সরো এখান থেকে। এটা হান্টিং পার্টি!'

'না, আমি সরব না। হান্টিং পার্টির সময় শেষ,' মহিলা বলল।

হঠাৎ বুঝে ফেলল কিশের। পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্যটা। কথা বেরোচ্ছে ব্যারনের মুখ থেকে। মস্ত অভিনেতা তিনি। মহিলা-কণ্ঠে বললেন, 'রাইফেল রেখে দাও, মিলার। পার্টি শেষ।'

'না!' প্রতিবাদ করল মিলারের ষাঁড়ের মত কণ্ঠ, 'রাইফেল আমি রাখব না। বাধা দিতে এসো না আমার কাজে। রোজারকে গুলি করে মেরেছি আমি। প্রয়োজন হলে তোমাকেও মারব।'

'মিলার, আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছ কিন্তু!' জবাব দিল অসহিষ্ণু মহিলাকণ্ঠ।

ব্যারনের ঘরে কোন্ মহিলা সেরাতে তর্ক করছিল, বুঝতে পারল কিশোর। রহস্যময় কোন মহিলা নেই এই হোটেলে। রোজারই একবার মিলার সাজেন, একবার রলিন। নিজেই নিজের সঙ্গে একেক রূপে কথা বলেন।

'বেরিয়ে যাও!' মিলারের কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন ব্যারন। 'গেট আউট! সরো আমার সামনে থেকে!'

'না, যাব না, যতক্ষণ না তুমি এই হান্টিং পার্টির সমাপ্তি ঘোষণা করছ,' সমান তেজে জবাব দিল মহিলা।

কল্পিত রলিনের সঙ্গে ঝগড়া করে চলেছেন কল্পিত মিলার। কিশোর তাকাল আবার রাইফেলটার দিকে। লম্বা দম নিয়ে আচমকা লাফ দিল সামনে। এক থাবায় ওটা ছিনিয়ে নিল ব্যারনের হাত থেকে। নিয়েই দৌড়।

হতবাক হয়ে গেলেন ব্যারন। দৌড় দিলেন কিশোরের পেছনে। উলফের গায়ে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন।

নড়ে উঠল উলফ। চোখ মিটমিট করতে লাগল।

পা চেপে ধরে গোঙাতে শুরু করলেন ব্যারন। ককাতে ককাতে বললেন, 'উফ্, গেছে আমার হাঁটুটা!'

'কি হয়েছে?' মাথার একপাশে আলুর মত ফুলে যাওয়া জায়গাটায় নিজের অজান্তেই হাত বোলাতে শুরু করল উলফ।

'হ্যাঁ, তাই তো! কি হয়েছে?' তার সঙ্গে সুর মেলালেন ব্যারন। রোজার হয়ে গেছেন আবার তিনি। ভদ্র কণ্ঠস্বর। 'আমার পায়ে এত ব্যথা কেন? মেঝেতে পড়লাম কি করে? উলফ, তোমার কি হয়েছে? মিলার কোথায়? এসব নিশ্চয় ওর কাণ্ড?'

উঠে বসলেন তিনি। 'খুব খিদে পেয়েছে। ফ্রিজে কিছু আছে নাকি? শুধু স্যান্ডউইচ হলেও চলবে।'

★

পরদিন সকালবেলা। ঢেউয়ে দুলছে মোটরবোট। একবার কেশে উঠে চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। মেইনল্যান্ডের দিকে ওটাকে চালিয়ে নিয়ে চলল উলফ।

মুসা বসেছে পেছনে। তার পাশে কিশোর। ওদের সামনে রবিন আর কোরি। সবার সামনে উলফের এক পাশে আন্ট জোয়ালিন। অন্য পাশে ব্যারন। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। বোটের পাটাতনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ফুসফুস ভরে তাজা নোনা হাওয়া টেনে নিল কিশোর। ফিরে তাকাল গোস্ট আইল্যান্ডের দিকে। শেষবারের মত দেখল ছোট্ট দ্বীপটাকে।

এঞ্জিনের গর্জনে কথা বলা কঠিন। কিশোরের প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলল মুসা, 'এতটা বেপরোয়া হওয়া কিন্তু উচিত হয়নি তোমার।'

বুঝতে পারল না কিশোর। 'কিসের কথা বলছ?'

'ওই তো, রাইফেল।'

'কোথায় রাইফেল?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কিশোর।

'আরে এখানে না। কাল রাতে আমাদের যখন গুলি করার হুমকি দিচ্ছেন ব্যারন, রাইফেলের সামনে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়ালে। তোমার বেপরোয়া ভঙ্গি দেখে রীতিমত চমকে গিয়েছিলাম।'

'ও, এই কথা,' মুচকি হাসল কিশোর। 'অত বেপরোয়া ভাবার কিছু নেই। চিন্তাভাবনা করেই এগিয়েছিলাম। মনে পড়ল, বনের মধ্যে বেশ কাছে থেকে আমাদের গুলি করেছেন ব্যারন। একটা গুলিও লাগাতে পারেননি। আশেপাশে অনেক গাছ ছিল। ওগুলোতে গুলি বেঁধার শব্দ শুনিনি। ডালপাতা ছিঁড়েও বেরিয়ে যায়নি বুলেট। মাটিতে বেঁধেনি। বিঁধলে শব্দ শুনে বোঝা যেত।'

'তাতে কি?'

'অনেক কিছু। ব্যারন একজন পাকা শিকারী। তাঁর নিশানা এতটা খারাপ হওয়ার কথা নয় যে কাছে থেকে গুলি করে তিনজন মানুষের একজনের গায়েও লাগাতে পারবেন না।'

'কিন্তু তাতেই বা কি…'

'আমাকে কথা শেষ করতে দাও। হোটেলের লবির কথা ভাবলাম। সেখানেও দুবার গুলি করেছিলেন তিনি। কোন ক্ষতি হয়নি। দেয়াল, মেঝে কিংবা কোন জিনিসের ক্ষতি করেনি বুলেট, কোন জিনিস ভাঙেনি, কারও গায়ে লাগেনি। ভাবতে ভাবতে বুঝে ফেললাম ক্ষতি না হওয়ার রহস্যটা। রাইফেলে ব্ল্যাঙ্ক কার্তুজ ভরা।'

'খাইছে!' মাথা নাড়তে শুরু করল মুসা। 'কে করল কাজটা?'

'উলফ ছাড়া আর কে? ও যখন বুঝল কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না রোজারকে, হান্টিং পার্টি বন্ধ করতে পারবে না, কোন এক সুযোগে রাইফেলের ম্যাগাজিন থেকে আসল বুলেটগুলো খুলে নিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ভরে রেখেছিল। আমার অন্তত সেরকমই ধারণা।'

'তারমানে শিওর ছিলে না!'

'না…'

'শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে এক উন্মাদের রাইফেলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে? যদি তোমার অনুমান ভুল হত? যদি আসল গুলি থাকত?'

'মারা পড়তাম,' হাসিমুখে বলল কিশোর।

'তুমি হাসছ!' কুঁচকে গেছে মুসার ভুরু।

'তো কি করব?'

'তোমার মত দুঃসাহসী আমি জীবনে দেখিনি! বিশ্বাস করো!'

'না, করলাম না,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। 'তুমি আসলে বোকাই। আমাকে সাহসী দেখলে কোথায়? আরে আমি তো একটা মস্ত ভীতু। স্বার্থপর। যেই বুঝলাম, গুলি করবেনই ব্যারন, সবার আগে চলে গেলাম রাইফেলের সামনে। জানতাম এমনিতেও মরব, ওমনিতেও—মরতেই যখন হবে, সবার আগে মরে যাওয়াই ভাল…অন্যের মৃত্যু, বন্ধুর মৃত্যু দেখার মত কলজে আমার নেই…।' হাত নেড়ে বলল, 'বাদ দাও তো ফালতু কথা। দেখো, একটা বাজপাখি। কি সুন্দর করে উড়ছে। সেদিন যেটাকে দেখেছিলাম, সেটাই হবে, তাই না?'

ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি,, ১৯৯১

'আগে চলো পিজ্জা কোভে যাই,' মুসা বলল। 'আজকাল ওদের পিজ্জাগুলো আরও ভাল হয়েছে। বীফ আর মাশরুম দিয়ে যা বানায় না!'

ওর বলার ধরনই বুঝিয়ে দিল, জিভে পানি এসে গেছে।

হাসল রবিন, 'বেরিয়েই আগে খাওয়ার চিন্তা?'

'তো আর কিসের চিন্তা করবে? খাওয়াই তো জীবন,' মুসার কথায় সায় দিয়ে বলল টনি হাওয়াই। ঝাড়ুর শলার মত খাড়া খাড়া চুলে আঙুল চালানোর চেষ্টা করল। ছেঁটে এত খাটো করে ফেলেছে, আঙুল ঢোকেই না। 'ওদের পিজ্জা আমারও খুব ভাল লাগে। প্রায়ই খাই।'

আবার মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'সেটাও জানি। তোমাকে চিনতেও কি আর বাকি আছে নাকি আমার।'

'পিজ্জা কোভ আমার মোটেও ভাল লাগে না,' জানিয়ে দিল টনির ছোট বোন সিসি। বছর সাতেক বয়েস। কিন্তু পাকা পাকা কথা বলার ওস্তাদ। 'পিজ্জা তো আরও পচা।'

স্কুলে গরমের ছুটি হতেই খালার বাড়ি বেড়াতে চলে গিয়েছিল সিসি। সেজন্যে বাবা-মা আর ভাইয়ের সাথে একসঙ্গে আসেনি। দু'দিন হলো ওর খালাত ভাই রেখে গেছে ওকে স্যান্ডি হোলোতে।

এসেই ভাইয়ের পেছনে লেগেছে সিসি। ভাই যেখানে যায়, তারও সেখানে যাওয়া চাই। নিতে চায় না টনি। কিন্তু না নিলে মায়ের ধমক খেতে হয়। কি আর করে বেচারা। নিতে বাধ্য হয়।

খেঁকিয়ে উঠল টনি, 'চুপ! তোকে কেউ জিজ্ঞেস করছে না। আইসক্রীমখোরের পিজ্জা কোভ ভাল লাগার কারণ নেই।'

মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকাতে লাগল রবিন। সেই আগের মতই আছে স্যান্ডি হোলো। মিনি মার্কেটটা ছাড়া আর কোথাও তেমন কোন পরিবর্তন নেই।

আজই রকি বীচ থেকে মুসার সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে সে। জিনাকে ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে সাত দিন আগে। তার অবস্থা দেখে সেদিনই তাকে নিয়ে রকি বীচে ফিরে গেছেন তার বাবা-মা। সঙ্গে গিয়েছিল মুসা।

জিনার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। কোন কথা মনে করতে পারে না। উল্টোপাল্টা আচরণ করে। বাধ্য হয়ে তাকে মেন্টাল হোমে ভর্তি করতে

হয়েছে। ডাক্তারের ধারণা, বিষাক্ত কোন কিছু রক্তে ঢুকে যাওয়াতে মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে জিনার। ভ্যাম্পায়ারের কথা ডাক্তার কিংবা জিনার আব্বা-আম্মাকে বলতে যায়নি মুসা, তাকেও যদি পাগল ভেবে হাসপাতালে আটকে রাখে, এই ভয়ে। জন আর লীলার কথাও গোপন রেখেছে।

তবে কিশোর আর রবিনকে সব ঘটনা খুলে বলেছে সে।

ভ্যাম্পায়ারের কথা বিশ্বাস করেনি দুজনের কেউই, তবে কোন একটা রহস্য যে আছে, এ ব্যাপারে কিশোর নিশ্চিত। মুসা আর রবিনের সঙ্গে আসতে পারেনি সে। জরুরী কাজে রাশেদ পাশার সঙ্গে কোথায় নাকি যেতে হবে। রবিনকে নিয়ে স্যান্ডি হোলোতে ফিরে যেতে বলেছে মুসাকে। তদন্ত চালিয়ে যেতে বলেছে। সময় করতে পারলে সে নিজেও স্যান্ডি হোলোতে চলে আসবে।

গালে এসে লাগছে ভেজা নোনা বাতাস। লম্বা, বাদামী চুল উড়ছে রবিনের। কেঁপে উঠল, 'বাপরে, খুব ঠাণ্ডা! শীত লাগছে!'

'শীতই তো মজা,' টনি বলল। 'খোলা সৈকতে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসতে আরাম। ঠাণ্ডা পড়লে পার্টি জমে ভাল।'

'সবগুলো পাগল,' সিসি বলল। 'নইলে শীতের মধ্যে কেউ করে এসব। ঘরে লেপের নিচে থাকা অনেক আরাম।'

'তাহলে সেটাই থাকতি, আমাদের সঙ্গে এলি কেন?'

'আমার ইচ্ছে।'

'তাহলে ওদেরও ইচ্ছে। কোনটা বেশি আরাম, তোর কাছে জিজ্ঞেস করবে নাকি?'

'করলে ভাল করত...' কথা শেষ না করেই চিৎকার করে উঠল সিসি, 'দেখ্ দেখ্, ওই যে আইসক্রীমের দোকান! নতুন হয়েছে, তাই না, টনি? আগের বার কিন্তু দেখিনি।'

ভাইকে নাম ধরে ডাকে সিসি। 'ভাইয়া' ডাকতে বললে ডাকে না, বলে ওসব পুরানো ঢঙ তার ভাল লাগে না। নাম ধরে ডাকাটা অনেক বেশি আধুনিক।

মুচকি হাসল রবিন। ভাইবোনের এই ঝগড়া ভালই লাগছে ওর। টনিকে বোকা বোকা লাগছে।

প্রিন্সেস-এর আইসক্রীম পারলার আর ভিডিও আর্কেডের দিকে তাকিয়ে চোখ চকচক করছে সিসির। ভাইয়ের হাত আঁকড়ে ধরে কোঁ-কোঁ শুরু করল, 'টনি, দে না একটা আইসক্রীম কিনে। বেশি করে যদি দিস, যা, আজ থেকে তোকে ভাইয়া ডাকাই শুরু করব।'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে টনি বলল, 'পরে।'

'দিবি তো?'

'দেখা যাক। তুই কতখানি জ্বালাতন করিস, দেয়া না দেয়া তার ওপর নির্ভর করবে।'

মেইন স্ট্রীটের শেষ মাথায় গিয়ে ঘুরে আবার যেদিক থেকে এসেছিল

সেদিকে ফিরে চলল ওরা।

মিনি মার্কেটটায় লোকের ভিড় তেমন নেই। সৈকতে চলে গেছে সব। এখানে তো আর কেনাকাটা করতে আসে না ট্যুরিস্টরা, বেড়াতেই আসে।

'গরমকালটা এখানে ভালই কাটত,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল মুসা, 'যদি না...'

'থাক থাক,' কি বলতে চায় মুসা বুঝে ফেলেছে রবিন, তাড়াতাড়ি বাধা দিল, 'এখন ওসব কথা...'

'কি কথা?' জানতে চাইল টনি।

'বললাম তো থাক। তারচেয়ে বরং নাটকের কথা বলো। হচ্ছে তো এবার?'

'হ্যাঁ, হবে। না হওয়ার কোন কারণ নেই। কবে লোক বাছাই করা হবে, দু'একদিনের মধ্যেই ঘোষণা দেবেন মিসেস রথরক...'

'নাটকের কথা শুনতে আমার ভাল্লাগে না,' সিসি বলল।

'তুই থাম!' ধমক দিল টনি। 'কোনটাই তো তোর ভাল লাগে না, তাহলে এসেছিস কেন?'

'লাগে তো—বেড়াতে আর আইসক্রীম খেতে...'

'চুপ থাক! নইলে পাবি না।'

মেইন স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ডানে মোড় নিল ওরা। এগিয়ে চলল সৈকতের দিকে। গোমড়া মুখে তিনজনের পিছে পিছে চলল সিসি। আইসক্রীম ছাড়া সৈকতে যেতে মোটেও ইচ্ছুক নয় সে।

একটা উঁচু বালিয়াড়ির গায়ে কাঠের সিঁড়ি আছে। সেটা বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। এতজনের ভারে মড়মড় করে উঠল পুরানো সিঁড়ি। ভেঙে পড়ার হুমকি দিতে লাগল।

চারপাশে তাকাল রবিন। ওরা বাদে আর কেউ নেই সৈকতে। তবে আসবে। রাত বাড়লে ভিড় বাড়ে।

চাঁদের আলোয় ঢেউয়ের মাথাগুলোকে লাগছে রূপালী মুকুটের মত। দূরে দেখা যাচ্ছে পাথরের জেটি। সাগরের মধ্যে বেশ অনেকখানি ঢুকে গেছে।

'কিসের শব্দ!'

আচমকা এমনভাবে কথাটা বলল রবিন, মুসা আর টনি দুজনেই চমকে উঠল। ভয় পেয়ে গেল সিসি।

শব্দটা কানে গেছে সবারই। অসংখ্য ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ।

'ওই দেখো!' আকাশের দিকে হাত তুলল সিসি। 'ওরিব্বাবা! কত বাদুড় রে!'

মুসাও দেখছে। আতঙ্কের ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে। তাকিয়ে আছে ওগুলোর দিকে।

'অবিশ্বাস্য দৃশ্য!' বিড়বিড় করল রবিন। 'আগের বার কিন্তু এত বাদুড় ছিল না এখানে।'

'কি বলেছিলাম!' প্রায় ফিসফিস করে বলল মুসা। 'বিশ্বাস তো করোনি!'

'তুমি যা বলেছ, এখনও করছি না। পৃথিবীর বহু জায়গাতেই এ রকম বাদুড়ের ঝাঁক দেখা যায়। বাদুড়ের সঙ্গে ভূতের কাল্পনিক সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু বাস্তবেও আছে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

ভাইয়ের গা ঘেঁষে বসল সিসি। শীতে না ভয়ে বোঝা গেল না। তবে যতদূর জানে মুসা আর রবিন, ভয়ডর একটু কমই আছে মেয়েটার।

আসছে তো আসছেই। বাদুড়ের ঝাঁক চাঁদ ঢেকে দিয়েছে। সৈকত অন্ধকার।

ধীরে ধীরে কমে এল বাদুড়। পেছনের পাহাড়ের দিকে চলে গেল। আবার বেরিয়ে এল চাঁদের মুখ।

'কোত্থেকে এল ওগুলো?' মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল সিসি।

'সাগরের মাঝের দ্বীপটা থেকে,' মুসা বলল। 'বাদুড়ের অত্যাচার আর ভ্যাম্পায়ারের ভয়ে ওখানকার সব মানুষ পালিয়েছে। পোড়ো বাড়িগুলো এখন...'

প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্যে রবিন বলল, 'এতদিন হলো পড়ে আছে, সিনেমার লোকেরা দেখে না নাকি দ্বীপটাকে? হরর ছবির চমৎকার শূটিং করতে পারত।'

'তা পারত,' টনি বলল। 'তেমন করে নজরেই পড়েনি হয়তো কারও। তাই আসেনি।'

সিনেমা থেকে আবার নাটকের প্রসঙ্গ এসে পড়ল। স্যান্ডি হোলোতে একটা থিয়েটার আছে, সামার থিয়েটার। গরমের সময় প্রতি বছরই তাতে ছেলেমেয়েদের দিয়ে নাটক করানো হয়। এবারেও হবে। স্থানীয়রা তো থাকেই, যারা বেড়াতে আসে তাদের মধ্যে থেকেও অভিনয়ের জন্যে লোক নেয়া হয়।

'কি নাটক করছে ওরা?' জানতে চাইল রবিন বই পড়া ছাড়াও নাটক, গান এ সবের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে তার। কিছুদিন একটা গানের কোম্পানিতে পার্ট টাইম চাকরিও করেছে। আবার ওরা ডাকছে যাওয়ার জন্যে।

'নাইট অভ দ্য ভ্যাম্পায়ার,' নাটকের নাম বলল টনি।

কান খাড়া করে ফেলল মুসা, 'কাহিনীটা কি?'

'কি আর হবে,' যে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে রাখতে চাইছিল রবিন, সেটা আবার উঠে পড়ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'ভ্যাম্পায়ারের রক্ত খাওয়ার কাহিনী। ওরা তো ওই একটা কাজই পারে। এত কিছু থাকতে ভূতের গল্প। আর কোন কাহিনী খুঁজে পেলেন না মিসেস রথরক!'

'এটা সেরকম না,' টনি বলল। 'নামটা ভয়ঙ্কর হলেও আসলে হাসির নাটক।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর উঠে দাঁড়াল মুসা, 'চলো, ওঠা যাক।'

'কোথায় যাব?' জিজ্ঞেস করল টনি।

'আর্কেডে। আমার খিদে পেয়েছে।'

'আমারও,' বলেই বোনের দিকে তাকাল টনি। 'কিন্তু যত্ত মুশকিল এই মেয়েটাকে নিয়ে। ঝামেলা! ওর জ্বালায় না পারব রেস্টুরেন্টে ঢুকে ভালমন্দ কিছু খেতে, না পারব আর্কেডে খেলতে।'

'ও, আমি ঝামেলা! বিরক্তির কারণ!' ঝাঁঝিয়ে উঠল সিসি, 'বেশ, আমি থাকবই না। গেলাম বাড়ি চলে।'

আঁতকে উঠল টনি, 'না না, যাসনে! একা গেলে মা আর আমাকে আস্ত রাখবে না!'

'তাহলে আর উপায় কি? আমাকে নিয়েই যেতে হবে তোদের।'

'যাব। তবে ঝামেলা করতে পারবি না।'

'করব, আইসক্রীম কিনে না দিলে। বাড়ি ফিরে গিয়ে মাকে বলব, তুই আমাকে সারা পথ ধমকাতে ধমকাতে নিয়ে গেছিস...'

'কতবড় মিথ্যুক রে! ধমকালাম আবার কখন? তুইই তো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে পিত্তি জ্বালাচ্ছিস।'

'আবার গালাগাল! চ্যাটাং চ্যাটাং, না? বেশ, যাচ্ছি বাড়ি ফিরে...'

খপ করে বোনের হাত ধরে ফেলল টনি। 'দেখ, সিসি, কাজটা তুই ভাল করছিস না। ব্ল্যাকমেইল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

'কোন্ মেইল হচ্ছে তা বুঝিটুঝি না। তবে আমি সঙ্গে যাব, আমার যা ইচ্ছে বলব, সাফ কথা। টীচার বলেছেন, স্বাধীনভাবে কথা বলা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার...'

'নাও, হয়েছে!' হতাশ ভঙ্গিতে কপাল চাপড়াল টনি। 'এবার ওনার কাছে রাজনীতিও শুনতে হবে...অপরাধ হয়ে গেছে, সিসি। মাপ করে দে। তোর মরিচ গোলানো কথার তীর বন্ধ করে এবার রেহাই দে। চল্, দেব তোকে আইসক্রীম কিনে।'

হাসি ফুটল সিসির মুখে, 'যা, দিলাম মাপ করে। তবে একটা আইসক্রীমে আর চলবে না এখন। যতগুলো বলব, দিতে হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল টনি, 'চল্, দেব। ঠাণ্ডা লেগে তোর টনসিল পচে মরলে আমার কি!'

হাসতে হাসতে বলল সিসি, 'তখনও মা তোকেই বকবে। বলবে, আমাকে ভোগানোর জন্যে ইচ্ছে করে বেশি বেশি আইসক্রীম কিনে দিয়ে আমার টনসিল তুইই পচিয়েছিস।'

দুই

সাত দিন পর।

ছায়ায় লুকিয়ে আছে মেয়েটা। ছোট্ট নাক। কালো চুলের লম্বা বেণি। গায়ের রঙ আমেরিকানদের মত ফর্সা নয়, বরং কিছুটা বাদামী। দেখছে সে।

অপেক্ষা করছে।

দুটো মেয়ে এগিয়ে আসছে। একজনের লম্বা লাল চুল। চাঁদের আলোয় চকচক করছে।

এগিয়ে আসতে আসতে দ্বিতীয় মেয়েটার দিকে তাকাল সে। এই মেয়েটার সোনালি, কোঁকড়া চুল। মুখের চামড়া মসৃণ, ফ্যাকাসে। হাঁটার সময় নাচে চুলগুলো।

'খুব খিদে পেয়েছে,' বলল সোনালি চুল মেয়েটা। 'আর সহ্য হয় না। কখন যে পাব কে জানে!'

'পাওয়া যাবে শীঘ্রি,' দ্বিতীয় মেয়েটা বলল। 'লোকজন তো আর কম নেই।'

'ইস্, যা খিদে লেগেছে! আর সহ্য করতে পারছি না…'

দেখা দেয়ার সময় হয়েছে, ভাবল বাদামী মেয়েটা। ছায়া থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল অন্য মেয়ে দুটোর দিকে।

'হাই!' চোখ চকচক করে উঠল লাল-চুল মেয়েটার।

দুজনেই দৌড়ে আসতে শুরু করল।

'ওই যে এসে গেছে খাবার,' সঙ্গের মেয়েটাকে বলল লাল-চুল মেয়েটা। 'বেশিক্ষণ আর না খেয়ে থাকতে হবে না।'

দাঁড়িয়ে গেল বাদামী মেয়েটা। তার দুই পাশে এসে দাঁড়াল মেয়ে দুটো। ঠোঁট ফাঁক হলো। শ্বদন্ত দেখা গেল।

লাল-চুল মেয়েটার তাড়াহুড়া বেশি। শিকারের গলার শিরায় দাঁতের চোখা মাথা ফুটিয়ে দিতে মুখ বাড়াল।

ধমকে উঠল বাদামী মেয়েটা, 'গাধা কোথাকার! নিজের দলের লোককে চিনতে পারো না?'

দ্বিধায় পড়ে গেল মেয়ে দুটো। মুখ সরিয়ে নিল লাল-চুল মেয়েটা।

'কয়েক দিন আগে আমিও তোমাদের একজন হয়ে গেছি,' বাদামী মেয়েটা জানাল।

'অ,' হতাশ ভঙ্গিতে বলল লাল-চুল মেয়েটা।

পেটের খিদে চোখে ফুটেছে ওদের।

'তোমার নাম কি?' জিজ্ঞেস করল সোনালি-চুল মেয়েটা। 'দলে ঢুকিয়েছে কে?'

'আমি কণিকা। বাড়ি ইন্ডিয়ায়। জন ঢুকিয়েছে আমাকে।'

'ও, জন। বেচারা! আগুনে পুড়ে মরল শেষ পর্যন্ত। বস্ তো ওর জন্যে রোজই দুঃখ করে। দলের সেরা এজেন্ট ছিল। কতজনকে যে ঢুকিয়েছে…কিন্তু তোমার নাম তো কখনও শুনিনি ওর মুখে?'

'এতজনকে ঢোকাল, ক'জনের নাম আর বলবে।'

'তা ঠিক। তা ছাড়া আমরা এসেছি দিন তিনেক হলো। গতবছরের পর আর জনের সঙ্গে দেখা হয়নি আমাদের। ওর সঙ্গে লীলাও মারা গেছে। ওদের মৃত্যুটা রহস্যময়। কি করে মারা গেছে কাউন্টও জানেন না। যে বাড়িটাতে

ছিল ওরা, আগুন লেগে পুরো বাড়িটাই পুড়ে গেছে। কোন সূত্রই পাওয়া যায়নি।'

'তোমাদের নাম কি?'

'আমি কিমি,' পরিচয় করিয়ে দিল সোনালি-চুল মেয়েটা। 'ও ডলি।'

শ্বদন্ত দেখিয়ে হাসল ডলি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কণিকার দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে, কণিকা সত্যি কথা বলছে না মিথ্যে। জ্বলজ্বল করছে চোখ। তাতে রাজ্যের খিদে। কণিকাও চোখ সরাচ্ছে না ওর চোখ থেকে। হেসে নিজের শ্বদন্তও দেখিয়ে দিল।

'এখানে দাঁড়িয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি আমরা,' ডলি বলল। 'আমার রক্ত দরকার। খিদেয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। এক্ষুণি চলো।'

'হ্যাঁ, চলো,' বলল কিমি।

রাস্তার সমতলে উঠে যাওয়া বালিয়াড়িটায় চড়ল ওরা।

'বছরের এই সময়টায় আমার ভীষণ খারাপ লাগে,' শুকনো গলায় বলল ডলি। 'খাবার নেই, কিছু নেই। শুধু রক্ত খেয়ে থাকতে হয়। মানুষকে পটিয়ে রক্ত জোগাড় করা যে কি কঠিন কাজ!'

রাস্তায় উঠল ওরা। শহরের মেইন রোডের দিকে এগোল। সাইডওয়াক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অনেকে। দুজন তরুণ-তরুণী হাঁটছে, মাঝে একটা বছর চারেকের মেয়ে। দুদিক থেকে দুজনে হাত ধরে রেখেছে বাচ্চাটার। হার্ড রক টি-শার্ট গায়ে দুটো মেয়ে হাঁটছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। একজোড়া প্রৌঢ় দম্পতি হেঁটে যাচ্ছে দোকানগুলোর সামনে দিয়ে। দোকানের উইন্ডোর দিকে নজর। কিছু কিনবে বোধহয়।

ওদের কাউকে ধরা যায় কিনা ভাবছে ডলি, হাত চেপে ধরল কিমি, 'ওই দেখো! শিকার!'

খানিক দূরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওদের সমবয়েসী তিনটে ছেলে। পেছন পেছন হাঁটছে সাত-আট বছরের একটা ছোট্ট মেয়ে।

সবচেয়ে লম্বা ছেলেটা নিগ্রো। পেশী দেখে বোঝা যায় নিয়মিত ব্যায়াম করে, অ্যাথলিট। দ্বিতীয় ছেলেটাও লম্বা। মাথায় খাটো করে ছাঁটা চুল। আর তৃতীয় ছেলেটা হালকা-পাতলা, গোলগাল চেহারা, বাদামী-চুল।

মাথা নেড়ে চুল ঝাঁকিয়ে, মৃদু হেসে ডলি বলল, 'ওদের পটানো যেতে পারে, কি বলো?'

'চলো, চেষ্টা করে দেখা যাক,' বলল কিমি।

তিন

ছেলেগুলোর দিকে এগোল তিন ভ্যাম্পায়ার।

কাছাকাছি এসে ডাকল কিমি, 'হাই।'

ফিরে তাকাল ছেলেগুলো। মেয়েদের আসতে দেখে দাঁড়াল। বাদামী-চুল ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের বলছ?'

অকারণেই খিলখিল করে হাসল কিমি, 'এখানে তোমরা ছাড়া আর কে আছে? বেড়াতে এসেছ বুঝি?'

মোরগের মত ঘাড় কাত করে, লাল চুল নাচিয়ে হাসল ডলি। 'আমরাও বেড়াতে এসেছি। আমি লেবার ডে পর্যন্ত থাকব।'

'অ,' হাত বাড়িয়ে দিল বাদামী-চুল ছেলেটা, 'আমি রবিন। রবিন মিলফোর্ড।'

'কোন শহর থেকে এসেছ তোমরা?'

'রকি বীচ।'

'আমি হানিকম্ব থেকে।'

'শুনতে তো নামটা মিষ্টিই লাগছে। জায়গাটাও মিষ্টি নাকি?'

'আছে। মোটামুটি।'

'আমাদেরটাও মোটামুটি। খুব খারাপও না, খুব ভালও না।'

সঙ্গীদের পরিচয় করিয়ে দিল রবিন। নিগ্রো ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল, 'ও মুসা আমান। আর এ হলো টনি হাওয়াই। ও সিসি। টনির বোন।'

হাই, হালো, হাত মেলানো ইত্যাদি শেষ হলে কণিকা জিজ্ঞেস করল, 'যাচ্ছ কোথায় তোমরা?'

'শহরে,' জবাব দিল রবিন। 'নাটকের জন্যে প্লেয়ার সিলেকশন করা হবে আজ। টেস্ট দেব।'

'ও, ভালই হলো। আমরাও ওখানেই যাচ্ছি। চলো, একসঙ্গেই যাওয়া যাক।'

মুসার বাহুর ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিল ডলি। শুধু শুধু হাসছে। এত দ্রুত আন্তরিক হতে চাওয়ার ব্যাপারটা মুসার কাছে স্বাভাবিক মনে হলো না। এখানে অবশ্য অপরিচিত সবাইকেই তার সন্দেহ।

ওকে টেনে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ডলি।

ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা। চিন্তিত।

তর সইছে না। খিদেটা ডলির সত্যি খুব বেশি, বুঝতে পারল কণিকা।

যেতে চাইছে না মুসা। অস্বস্তি বোধ করছে।

মুচকি হাসল কণিকা। বুঝতে পারছে, মেয়েদের সঙ্গে সহজ হতে পারে না ছেলেটা। ভাল বিপদে পড়েছে বেচারা। মেয়েমানুষের খপ্পর।

টনি মোটামুটি স্বাভাবিক। কিমি যখন ওর হাত ধরল, মুসার মত কুঁকড়ে গেল না। বরং হাসির জবাব দিল হাসি দিয়ে।

রবিনের সঙ্গী হলো কণিকা। রবিন টনির চেয়েও স্বাভাবিক। মুসার মত অস্বস্তি বোধ করছে না। সহজ ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগল কণিকার সঙ্গে। মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে কোন অসুবিধে হয় না তার।

'চলো, হাঁটি,' মুসার হাত ধরে টানল আবার ডলি।

মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটতে লাগল ওরা। বীচ এমপোরিয়ামের উইন্ডোর

সামনে দাঁড়াল কিমি। 'বিকিনিগুলো খুব সুন্দর।'
ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ডলি, 'কিনবে নাকি?'
'নাহ,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল কিমি, 'পয়সা নেই।'
'স্যান্ডি হোলোতে এই প্রথম এলে বুঝি?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল ডলি।
'না, আরও এসেছি।'
'তাহলে তো তুমি সব জানো। গরমকালে নাকি এখানে অনেক লোক আসে, পার্টি-টার্টি, হই-চই হয় খুব?'
'হ্যাঁ, হয়। ভরে যায়। সৈকতে আগুন জ্বেলে কাবাব বানিয়ে খায়, আড্ডা দেয়, নাচাকোঁদা করে। পাগল হয়ে যায় যেন সব। বুড়োগুলোও ছেলেমানুষ হয়ে যায়।'
'তাই নাকি! খুব মজা হবে এবার। খোলা জায়গার পার্টি আমার খুব ভাল লাগে। তোমরা সঙ্গে থাকলে আরও বেশি জমবে।'
জবাব না দিয়ে হাঁটতে থাকল মুসা।
মনে মনে হাসছে কণিকা। মুসাকে আগ্রহী করতে পারছে না ডলি।
রবিনের দিকে তাকাল কণিকা। 'তুমি এসেছ আর?'
মাথা নাড়ল রবিন, 'এসেছি।'
কথা বলতে বলতে এগোল ওরা।
ডলি বার বার মুসাকে দল থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। মুসাও সরতে নারাজ।
'আমি বাড়ি যাব!' আচমকা তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সিসি।
ফিরে তাকাল সবাই। ভুলেই গিয়েছিল যেন ওর কথা। এমনকি ওর ভাই টনিরও যেন মনে ছিল না।
'এত তাড়াতাড়ি?'
'কেন, আম্মা বলে দিয়েছে না এগারোটার পর যেন আর না থাকি।'
জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিমির দিকে তাকিয়ে টনি বলল, 'তোমরা এগোও। আমি চট করে ওকে বাড়িতে রেখে আসি। সিলেকশনের আগেই চলে আসব।' সিসির দিকে তাকাল, 'চল্! জলদি! আর যদি রাতে কখনও সঙ্গে আসতে চাস তো ভাল হবে না বলে দিলাম।'
'রোজ রোজ দুটো করে কোন্ আইসক্রীম আর একটা করে চকলেট যদি দিস, আসতে চাইব না।'
'অত পাবি না। একটা আইসক্রীম, আর একদিন পর পর একটা করে চকলেট।'
কি ভেবে তাতেই রাজি হয়ে গেল সিসি।

*

মুসা কোন কথা জিজ্ঞেস করছে না দেখে ডলিই আগ বাড়িয়ে বলল, 'নাটকের প্লটটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার। মেইন একটা চরিত্র যদি পাই...'
জবাব দিল না মুসা।
থিয়েটারে পৌঁছে গেল ওরা।

মুসা আর রবিনকে বলল ডলি, 'তোমরা যাও। আমরা আসছি।'

থিয়েটারের দরজার দিকে এগিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ডলি। 'খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট। ভ্যাম্পায়ার হওয়ার যে এত যন্ত্রণা, আগে জানলে কে আসত!'

'খবরদার!' চট করে কণিকার দিকে তাকাল কিমি। চোখে সন্দেহ। বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও ওদের নতুন সঙ্গীকে। আবার ফিরল ডলির দিকে। 'এসব কথা বোলো না। কে কোন্‌খান থেকে শুনে ফেলবে, কাউন্ট ড্রাকুলার কানে চলে গেলে রক্ষা থাকবে না। ভ্যাম্পায়ার যখন হয়েই গেছি, মানুষের রক্ত খেয়ে ফেলেছি, এখন এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই আমাদের।...কি বলো, কণিকা?'

মাথা ঝাঁকাল কণিকা। 'তা তো বটেই!'

'যাই বলো,' ডলি বলল, 'ওই মুসাটাকে আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। কি স্বাস্থ্য। অনেক রক্ত শরীরে। ওর গলায় দাঁত ফোটাতে পারলে...' চুটকি বাজাল সে, 'আহ্!'

'কিন্তু ও তোমাকে ভাল চোখে দেখছে বলে মনে হলো না,' কণিকা বলল।

'তা ঠিক। অতিরিক্ত চালাক,' ডলি বলল। 'সম্মোহনের অনেক চেষ্টা করেছি। চোখের দিকেই তাকাতে চায় না। এখানকার ভ্যাম্পায়ারের ব্যাপারে কিছু জানে নাকি কে জানে! জন আর লীলা মরার সময় কাউন্ট ড্রাকুলা এখানে ছিলেন না। তাঁর ধারণা, ওদের মরার ব্যাপারে এখানকার কারও হাত থাকতে পারে।'

'মুসার কথা বলছ?'

'অন্য কেউও হতে পারে!'

'ভঙ্গিতে তো মনে হচ্ছে আমাকে সন্দেহ করছ! নাকি?'

'তোমার সঙ্গে কিন্তু কাউন্টের পরিচয় হয়নি এখনও,' ঘুরিয়ে জবাব দিল ডলি। 'কোথায় থাকো সেটাও জানি না আমরা...'

'কাউন্টের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কথা ছিল জনের। কিন্তু সে-ই তো নেই।...চলো, ভেতরে চলো। দেরি দেখলে মুসারা আবার অবাক হয়ে ভাববে আমাদের কি হলো।'

থিয়েটারের দরজার দিকে পা বাড়াল কণিকা।

চার

স্টেজের কিনারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সব মুসা। তিরিশ-বত্রিশজন ছেলেমেয়ে আছে ঘরে। একসঙ্গে কথা বলছে সবাই। হই-চই, হাসাহাসি করছে।

কোন্‌জন? ভাবছে সে। ওদের মধ্যে ভ্যাম্পায়ার কে? আছে কি কেউ?

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। সামনের সারির ওই চটপটে মেয়েটাই কি সারাদিন কফিনে শুয়ে কাটিয়ে রাতে বেরোয়? নাকি ওই ছেলে দুটো? চেঁচিয়ে, পরস্পরের পিঠে চাপড় মেরে উল্লাস করছে যারা?

ও নিশ্চিত, জন আর লীলাই শেষ নয়। ওদের দলে ভ্যাম্পায়ার আরও আছে। রিকি শরকে শেষ করেছে লীলা। জন দিচ্ছিল জিনাকে শেষ করে আরেকটু হলেই। অল্পের জন্যে বেঁচেছে জিনা।

বেঁটে, মোটা, মাঝবয়েসী এক মহিলা গটগট করে হেঁটে এসে ঢুকলেন স্টেজে। সোনালি চুল ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। কোলাহল ছাপিয়ে চিৎকার করে বললেন তিনি, 'অ্যাটেনশন, প্লীজ! আমার কথা শোনো তোমরা!'

ধীরে ধীরে কমে এল চিৎকার-চেঁচামেচি, হট্টগোল। 'আমি মিসেস রথরক। স্যান্ডি হোলোর এই কমিউনিটি থিয়েটারের পরিচালক। একসঙ্গে তোমাদের এতজনকে দেখে খুব ভাল লাগছে আমার।'

নাটকটা সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করলেন তিনি। আগ্রহ হারাল মুসা। অডিটরিয়ামের সীটে বসা ছেলেমেয়েদের দিকে নজর ফেরাল আবার। ওসব হাসিমুখের যে কোনটার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে মারাত্মক শ্বদন্ত। সুন্দর চেহারাগুলোর যে কোনটা নিমেষে পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিতে পারে ভয়াবহ দানবে।

কেশে গলা পরিষ্কার করলেন মিসেস রথরক। আবার তাঁর দিকে ফিরল মুসা।

'শুরু করা যাক, বললেন তিনি। 'রবিন মিলফোর্ড, উঠে এসো। তোমাকে দিয়েই শুরু করি।'

সীটের সারির পাশ দিয়ে মঞ্চের দিকে এগোল রবিন। চেহারায় উত্তেজনার ছাপ। মঞ্চে উঠলে তার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলেন মিসেস রথরক। তাতে সংলাপ লেখা। পড়া আর অভিনয় একসঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে।

শুরু করল রবিন।

মুসার চোখ ওর দিকে। পাশ থেকে চমকে দিল ডলি, 'মুসা, আমি এসে গেছি।'

ফিরে তাকাল সে। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ডলি। বলল, 'দেরি করে ফেললাম নাকি?'

'না, মাত্র শুরু করেছে। রবিনই প্রথম। যে রকম ঢিলামি শুরু হয়েছে, কয়েক ঘণ্টা লাগিয়ে দেবে। হয়তো দেখা যাবে আজ আর সবার টেস্ট নেয়াই হলো না।'

'তুমি কোন্‌ পার্টটা করছ?'

ডলির গায়ের পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছে মুসা। পরিচিত লাগছে গন্ধটা। মনে করতে পারছে না। 'আমার এসব নাটক-ফাটক ভাল্লাগে না। তবু যদি করতেই হয় সবচেয়ে ছোটটা নেব, ডেলিভারি বয়। মাত্র পাঁচ লাইনের

সংলাপ। দিলে দিল না দিলে নাই।'

'লেডি ভ্যাম্পায়ারের পার্ট করার ইচ্ছে আমার,' গর্বের সঙ্গে বলল ডলি। 'ডায়লগ আগেই নিয়ে গিয়ে মুখস্থ করে ফেলেছি। আশা করছি পেয়ে যাব চরিত্রটা।'

পরীক্ষা দেয়া শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে এল রবিন। ডলিকে জিজ্ঞেস করল, 'কণিকা আসেনি?'

'এসেছে,' হাত তুলে দেখাল সে, 'ওই তো।'

'আমাকে খুঁজছ?' এগিয়ে এল কণিকা। পেছনে কিমি।

'কেন খুঁজছ?' জানতে চাইল কণিকা।

'না, এমনি। এলে একসঙ্গে, তারপর আর দেখা নেই...'

'ও। চলো, বসি।'

আগের সীটটায়ই গিয়ে বসল রবিন। পাশে কণিকা। কিমি বসল তাঁর পাশে।

মুসার দিকে তাকাল ডলি। লম্বা চুলে ঝাঁকি দিয়ে হেসে বলল, 'আবার সেই তুমি আর আমি একা।'

জবাব দিল না মুসা।

মিসেস রথরক বললেন, 'টনি হাওয়াই, অভিনয় করবে?' বলে ঘুরতেই ডলির ওপর চোখ পড়ে গেল, 'ও, ডলিও এসে গেছ। ভাল। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

এখানকার ছেলেমেয়েদের অনেকেই তাঁর পরিচিত।

'হ্যাঁ, এসেছি,' এক পা এগিয়ে গেল ডলি।

'টনির আগে তুমি টেস্ট দিতে চাও?'

'অসুবিধে নেই। টনি আগে গেলেও হয়।'

'ঠিক আছে, তুমিই এসো আগে। তোমার চরিত্রটা বড়।'

এগিয়ে গেল ডলি। মঞ্চের মাঝখানে গিয়ে দর্শকের দিকে ফিরে হাসল।

অনেকের মত মুসাও তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'ভ্যাম্পায়ার হওয়া বড়ই কঠিন কাজ,' সংলাপ বলার আগে লেকচার দিতে শুরু করল ডলি। 'যে না হয়েছে, সে বুঝবে না।' গুঙিয়ে উঠল সে।

সবাই ভাবল অভিনয় করছে ডলি, কিন্তু কণিকা আর কিমি বুঝতে পারছে, গোঙানিটা সত্যি। খিদেয় এমন করছে।

একটা বিশেষ দৃশ্য অভিনয় করে দেখাতে বললেন মিসেস রথরক।

অভিনয় শুরু করল ডলি।

'ভালই,' বলে উঠল মুসার কাছে দাঁড়ানো একটা মেয়ে। 'তবে অতি অভিনয় করছে।'

ফিরে তাকাল মুসা। মেয়েটা সুন্দরী। কখন এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে বলতে পারবে না। মঞ্চের দিকে চোখ থাকায় খেয়াল করেনি এতক্ষণ। মাথাভর্তি কালো চুল। এত নিঃশব্দে এল কি করে! ভ্যাম্পায়ার নাকি?

ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কি বললে?'

'বললাম, অতি অভিনয়। নাটক না হয়ে কার্নিভলের যাত্রা হয়ে যাচ্ছে।'
'আস্তে বলো। শুনতে পেলে দুঃখ পাবে।'
'পায় পাক। ভুল তো আর বলিনি।'
'খুব বেশি আত্মবিশ্বাস মনে হচ্ছে তোমার?'
জবাবে হাসল মেয়েটা। ডান হাতটা মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি অ্যানি। ওই চরিত্রটার জন্যেই টেস্ট দেব আমিও।'
কয়েক মিনিট পর ডলিকে বিদেয় করে দিয়ে মিসেস রুথরক ডাকলেন, 'এনিড ক্যামেরন, এবার তুমি এসো।'
নড়ে উঠল অ্যানি। মুসার দিকে তাকিয়ে আরেকবার হেসে বলল, 'যাচ্ছি, দোয়া কোরো।'
হালকা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে মঞ্চে উঠল সে।
ভ্যাম্পায়ার হিসেবে কাকে বেশি সন্দেহ করা উচিত, ভাবতে লাগল মুসা। ডলি, না অ্যানি? অ্যানিই হবে। ডলি অতিমাত্রায় সরব। অ্যানি শান্ত। ছায়ার মত নিঃশব্দ চলাফেরা তার।
অ্যানি অভিনয় শুরু করতেই নীরব হয়ে গেল সমস্ত অডিটরিয়াম। যেন কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সে। নাক কুঁচকাল, মোরগের মত ঘাড় কাত করল, হাসল, ভ্রূকুটি করল।
তাকিয়ে আছে সবাই।
মুসা নাটক বোঝে না। কিন্তু অ্যানি আর ডলির অভিনয় দেখে এটুকু অন্তত বুঝল, দুজনের মধ্যে কে ভ্যাম্পায়ারের অভিনয় ভাল করতে পারবে।
ডায়লগ বলা শেষ হতেই তুমুল হাততালি পড়তে লাগল। লজ্জা পেল অ্যানি। লাল হয়ে গেল। মঞ্চ থেকে নেমে এগিয়ে এল মুসার দিকে।
'তুমি দারুণ অভিনয় করো!' প্রশংসা করল মুসা।
'সত্যি বলছ? পার্টটা পেলে খুব খুশি হতাম।'
ওর চকচকে বাদামী চোখের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। কোমল, কেমন যেন পুরানো ধাঁচের চোখ। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যাচ্ছে ওর। ভ্যাম্পায়ারের বয়েসের কোন ঠিকঠিকানা থাকে না। কোন্ আমলের মানুষ অ্যানি!
'এখান থেকে বেরিয়ে কোন কাজ আছে তোমার?' জানতে চাইল অ্যানি।
'নাহ্।'
'চলো না তাহলে হেঁটে আসি কোনখান থেকে। সৈকতে যাবে?'
'তা যাওয়া যায়,' ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার কথা ভেবে বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল মুসার। কিন্তু অ্যানি কি সত্যি ভ্যাম্পায়ার? বাইরে নির্জনতার মধ্যে না গেলে সেটা বোঝা যাবে না। প্রমাণ করতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে। ভূতের সঙ্গেই বেরোতে হবে।
'দাঁড়াও, আসছি,' বলে বাথরুম সারতেই বোধহয় মঞ্চের পেছনের পর্দা সরিয়ে ওপাশে চলে গেল অ্যানি।
জমছে ভালই, ভাবল মুসা। দ্রুত পরিচয় হচ্ছে অনেকের সঙ্গে। যত

বেশি মানুষের সঙ্গে জানাশোনা হবে, তত ভাল। ভ্যাম্পায়ারের খোঁজ পাওয়া সহজ হবে। কোন্‌জন যে ভ্যাম্পায়ার, কাছাকাছি না এলে বোঝা যাবে না।

সীটের দিকে ফিরে দেখল রবিন আর কণিকা বেরিয়ে যাচ্ছে।

পেছনে এসে দাঁড়াল ডলি। বলল, 'কিছুক্ষণের মধ্যে কে কোন পার্টট পাবে, ঘোষণা করবেন মিসেস রথরক।'

'তুমি যেটা চাইছ, পাবে বলে মনে হয়?'

'না পাওয়ার কোন কারণ আছে?' চোখের পাতা সরু হয়ে এল ডলির।

'না না, তা বলছি না,' ডলির প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হলো মুসা। 'তুমি কি ভাবছ সেটা জানতে চাচ্ছিলাম। রাগার কিছু কিন্তু বলিনি।'

সামলে নিল ডলি, 'পার্টটা আমিই পাব।'

'অভিনয় তেমন বুঝিটুঝি না। তবে আমার মনে হয়েছে ভাল অভিনয় করেছ তুমি।'

চেহারা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল ডলির। 'বাইরে যাবে? চলো না, ঘুরে আসি। বদ্ধ ঘরে ভাল লাগছে না।'

'তোমার সঙ্গে যেতে পারব না।'

'কেন?' ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল ডলি।

ঘাবড়ে গেল মুসা। আবার রেগে যাবে না তো!

না, আর রাগল না ডলি। মুসার চোখের দিকে তাকাল। আঠার মত আটকে গেল যেন দৃষ্টি।

মুসার মনে হতে লাগল তাকে কোন অদ্ভুত জায়গায়, স্বপ্নের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে মেয়েটা। নিচের অন্ধকার খাদের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে সে।

এমন লাগছে কেন! জোর করে চোখ সরিয়ে নিল।

অবাক হলো ডলি। সেই সঙ্গে হতাশ। অভিমানের সুরে বলল, 'আমার সঙ্গে যেতে পারবে না কেন?'

'অ্যানিকে কথা দিয়ে ফেলেছি...ওর সঙ্গে বেরোব।'

হতাশা ছেয়ে দিল ডলির চেহারা।

ওর অবস্থা দেখে মায়া লাগল মুসার। 'তুমি যেতে চাও আগে বললে না কেন? তাহলে অ্যানিকে আর...'

'অ্যাটেনশন প্লীজ!' জোরে জোরে বলতে লাগলেন মিসেস রথরক। 'আমার কথা শোনো! নাটকের জন্যে যারা যারা সিলেক্টেড হয়েছ, তাদের নাম ঘোষণা করছি। সবাই তোমরা ভাল অভিনয় করেছ। এত ভাল যে, কাকে বাদ দিয়ে কাকে নেব সেটা ঠিক করতেই বেকায়দায় পড়ে গেছি। সবাইকে নেয়ার মত এত চরিত্র আমাদের নাটকে নেই। তাই বাধ্য হয়ে কয়েকজনকে বাদ দিতে হয়েছে...'

যারা বাদ পড়েছে তাদের দুঃখ ঘোচানোর জন্যে প্রচুর ভাল ভাল কথা বললেন তিনি। সান্ত্বনা দিলেন। শেষে নাম ঘোষণা করতে লাগলেন।

টনি, রবিন, মুসা তিনজনেই সুযোগ পেল। পেল কণিকা আর কিমি। অ্যানিকে মেইন রোলটা পেতে দেখে অবাক হলো না মুসা। ডলিকে দেয়া

হলো একটা বড় চরিত্র। ডলি তাতে খুশি হতে পারল না মোটেও। অ্যানি যেটা পেয়েছে সেটা চেয়েছিল সে।

'মুসা, রোলটা পেয়েই গেলাম শেষ পর্যন্ত!' উল্লাসে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো অ্যানির।

'পাবে, সে তো জানা কথা। তোমার পাওয়ার ব্যাপারে একবিন্দুও সন্দেহ ছিল না আমার।'

'সত্যি বলছ?'

'মিথ্যে বলব কেন?'

'থ্যাংক ইউ,' ঝলমলে হাসি উপহার দিল অ্যানি। 'চলো, বেরোই। নাকি আরও থাকবে?'

'না, আর কি? হয়েই তো গেল। টেস্ট দিলাম, চান্স পেলাম, ব্যস।'

এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল মুসা। ধরে রাখল, অ্যানির বেরোনোর জন্যে।

বাইরে বেরিয়ে আগে আগে হাঁটতে শুরু করল অ্যানি। মুসাও পা বাড়িয়েছে, খুট করে শব্দ হলো পেছনে। ফিরে তাকাল। সাঁৎ করে একটা ছায়া সরে গেল দরজার কাছ থেকে। ক্ষণিকের জন্যে আলো পড়ল ছায়াটার মুখে। ডলিকে চিনতে ভুল হলো না তার।

একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ডলি। তারপর দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। রাগ দেখাল। মুসার সঙ্গে বেরোতে না পারার দুঃখ ভুলতে পারছে না।

কিছু করার নেই মুসার। অ্যানিকে কথা দিয়েছে আগে।

পাঁচ

সৈকতে হাঁটতে হাঁটতে চাঁদের দিক মুখ তুলে তাকাল অ্যানি। জ্যোৎস্নায় অনেক বেশি আকর্ষণীয় লাগছে ওকে।

মেয়ে ভ্যাম্পায়াররা যে সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে আসে, ভোলেনি মুসা। কিন্তু অ্যানিকে ভ্যাম্পায়ার ভাবতে ভাল লাগল না। তবে অসতর্কও হলো না। ভ্যাম্পায়াররা নানা ছলনা জানে। ওদের মায়ার জালে জড়ালে রিকি আর জিনার অবস্থা হতে দেরি হবে না তারও।

পানির কিনার দিয়ে হাঁটছে ওরা। নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই। ডানে পাথরের জেটিতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ।

সামনের দিকে হাত তুলে অ্যানি জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি তোমার বন্ধু?'

পানিতে নেমে পাশাপাশি হাঁটছে রবিন আর কণিকা। ঢেউ আছড়ে পড়ছে ওদের পায়ে।

মেঘের আড়ালে চলে গেল চাঁদ। অন্ধকারে হারিয়ে গেল দুজন। আবার

যখন বেরোল চাঁদ, আর দেখা গেল না ওদের।

অবাক হলো মুসা। এত তাড়াতাড়ি গেল কোথায় ওরা?

কয়েক মিনিট নীরবে হাঁটল মুসা আর অ্যানি। আবার মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। অনবরত চলতে লাগল চাঁদের এই লুকোচুরি খেলা।

অ্যানি বলল, 'রাত নিশ্চয় অনেক। ক'টা বাজে?'

অন্ধকারে ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল মুসা। 'দেখা যাচ্ছে না। এগারোটার বেশিই হবে।'

'বাড়ি যাওয়া দরকার। দেরি করলে আম্মা চিন্তা করবে।'

বাহ্, ভ্যাম্পায়ারের আবার আম্মাও থাকে!—ভাবল মুসা। যদিও এখন পর্যন্ত কোন রকম অস্বাভাবিক আচরণ করেনি অ্যানি। সময় নিচ্ছে আরকি। ধৈর্য ধরে সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

'কাল যাচ্ছ তো থিয়েটারে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'নিশ্চয়ই।'

'চলো, তোমাকে দিয়ে আসি।'

'লাগবে না। আমি একাই চলে যেতে পারব। শুধু শুধু কষ্ট করতে হবে না তোমার।'

শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল অ্যানি। যতক্ষণ দেখা গেল ওকে, তাকিয়ে রইল মুসা।

ধীরে ধীরে বালিয়াড়ির ওপাশে হারিয়ে গেল অ্যানি।

*

'খুব ভাল লাগছে আমার,' কিমি বলল। 'আজকের রাতটা খুব সুন্দর।'

'আমারও ভাল লাগছে,' টনি বলল। সৈকতের কিনারে সাগরের দিকে মুখ করা বারান্দায় বসে আছে দুজনে। মস্ত কটেজটা ভাড়া নিয়েছেন টনির বাবা।

'চলো না, সৈকতে হেঁটে আসি।'

'কি দরকার। এখানেই তো ভাল লাগছে।'

'তা লাগছে। গেলে আরও ভাল লাগত,' সুযোগের অপেক্ষায় আছে কিমি। টনিকে সম্মোহিত করে, ওষুধ শুঁকিয়ে কাবু করে রক্ত খাওয়ার অপেক্ষা। এভাবে বসে থাকলে সে-সুযোগ পাবে না। উঠে দাঁড়াল সে। রেলিঙের কাছে গিয়ে পেট ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

খানিকক্ষণ বসে থেকে টনিও উঠে গেল।

ফিরে তাকাল কিমি। টনির মুখোমুখি হলো। জ্যোৎস্নায় খুব সুন্দর লাগছে ওকে। টনির চোখ আটকে গেল কিমির চোখে।

আরও কাছে চলে এল কিমি। হাত নাড়ল টনির নাকের সামনে। কিমির চাহনিতেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল টনি, মিষ্টি গন্ধে অবশ হয়ে আসতে লাগল শরীর।

ওর কাঁধে দুই হাত রাখল কিমি। ধীরে ধীরে মুখটা নামিয়ে আনতে লাগল গলার কাছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে দপদপ করছে শিরাটা। মুহূর্তে খিদে চাগিয়ে উঠল। প্রবল হয়ে গেল রক্তের তৃষ্ণা। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল

আপনাআপনি। বেরিয়ে পড়ল তীক্ষ্ণ মাথাওয়ালা শ্বদন্ত। কুটুস করে ফুটিয়ে দিলেই হলো এখন। রক্ত বেরিয়ে আসবে ফিনকি দিয়ে। চুষে চুষে খাবে সে।

সাবধান, অত উতল হয়ো না!—নিজেকে হুঁশিয়ার করল কিমি। লোভ সামলাও। রক্ত শুষে ওকে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলো না। ও মরে গেলে ভীষণ বিপদে পড়বে।

শিরাটার ওপর মুখ নামাল সে। দাঁত চেপে ধরল। ফুটিয়ে দিতে যাবে, ঠিক এই সময় শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার, 'অ্যাই, কি করছ তোমরা?'

ঝটকা দিয়ে মুখ সরিয়ে একলাফে পিছিয়ে গেল কিমি। ঠোঁট দিয়ে চেপে ঢেকে ফেলল দাঁত দুটো। গলা শুনেই বুঝতে পারল টনির বোন সিসি। সর্বনাশ! শঙ্কিত হলো কিমি। বিচ্ছু মেয়েটা শ্বদন্ত দুটো দেখে ফেলেনি তো?

টনিরও ঘোর কেটে গেল। চিৎকার করে উঠল, 'সিসি, চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'দেখতে এসেছিলাম, তোরা কি করছিস,' বলে হি-হি করে হাসতে লাগল সিসি।

রাগ আগ্নেয়গিরির লাভার মত ফুটতে শুরু করল কিমির মগজে। সিসির ঘাড় চেপে ধরে ওর গলাতেই দাঁত ফুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সেটা করতে যাওয়া হবে চরম বোকামি। যতই ঝগড়া করুক, বোনকে প্রচণ্ড ভালবাসে টনি। মুসা আর রবিনও পছন্দ করে। সিসির কিছু হলে ভ্যাম্পায়ারের পেছনে আদাজল খেয়ে লাগবে তিনজনে। সাংঘাতিক বিপদে ফেলে দেবে। স্যান্ডি হোলো ছাড়তে বাধ্য করবে।

নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল কিমি।

পারছে না কোনমতে। পেটে খিদে না থাকলেও এক কথা ছিল। এখানে থাকলে নিজেকে সামলাতে না পেরে শেষে কোন্ অঘটন ঘটিয়ে বসে কে জানে! চলে যাওয়াই ভাল।

'আমি যাই, টনি,' বলে আর একটা মুহূর্ত দাঁড়াল না সে। দ্রুত বারান্দা থেকে নেমে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করল। কানে এল, ওর চলে যাওয়ার জন্যে বোনকে দায়ী করে বকাবকি শুরু করেছে টনি।

*

রাত দুপুরে ঘনঘন কলিং বেলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। এতরাতে কে? আধো ঘুম নিয়ে বিছানা থেকে নামল সে। দরজা খুলতে চলল।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দুজন পুলিশ অফিসার। মুসার নাম জানতে চাইল একজন।

'মুসা।'

'পুরো নাম?'

'মুসা আমান।'

'আজ রাতে এনিড ক্যামেরনের সঙ্গে সৈকতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ,' ডলে ডলে চোখ থেকে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করল মুসা। 'কেন? কিছু হয়েছে নাকি?'

'ক'টার সময় শেষ দেখেছ ওকে?'

'এই…এগারোটা-সাড়ে এগারোটা হবে।'

'তোমার আব্বা আছেন বাসায়?'

'না, মাকে নিয়ে বেড়াতে গেছে হ্যামারহেডে। বলে গেছে শনিবার নাগাদ আসবে। কেন, বাবাকে দরকার?'

'না, তোমাকেই দরকার।'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই অফিসার। একজন পুরুষ। ছয় ফুটের বেশি লম্বা। মাংসপেশীর পাহাড় মনে হয়। দ্বিতীয়জন কঠোর চেহারার মহিলা। দুজনেই গম্ভীর।

'অ্যানির কিছু হয়েছে?' জানতে চাইল মুসা।

'ওকে পাওয়া যাচ্ছে না,' অফিসার জানাল।

'কে খবর দিল আপনাদের?'

'ওর আম্মা।'

তারমানে সত্যি সত্যি আম্মা আছে অ্যানির। ভ্যাম্পায়ার নয় সে।

'কোথায় তাকে শেষ দেখেছ?' জানতে চাইল মহিলা অফিসার।

'সৈকতে।'

'সৈকতের কোন্‌খানে?'

'শহরের কিনারে। একটা বালিয়াড়ির কাছে। কমিউনিটি থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ওখানে হাঁটতে গিয়েছিলাম আমরা।'

'জায়গাটা আমাদের দেখাতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'কাপড় পরে তাহলে এসো একটু আমাদের সঙ্গে।'

পেট্রলকারের পেছনে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে মুসা। ভেসে ভেসে যেন সরে যাচ্ছে নির্জন, ঘুমন্ত শহরটা। খড়খড় করছে টু-ওয়ে রেডিওর স্পীকার। কথা হচ্ছে। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছে অফিসাররা, বুঝতে পারল না সে।

অ্যানির কথা ভাবতে লাগল। মনে পড়ছে ওর চকচকে চুল। উজ্জ্বল হাসি।

'আস্তে চালান,' শহরের কিনারে পৌঁছে অফিসারদের বলল সে। 'আরেকটু সামনেই।' মসৃণ, রূপালী সৈকতটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। হঠাৎ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, থামুন, এখানেই।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল অফিসার।

গাড়ি থেকে নামল মুসা। ছোট বালিয়াড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। হাঁটতে গিয়ে ঠাণ্ডা বালি ঢুকছে জুতোর মধ্যে।

ওর ঠিক পেছনেই রয়েছে দুই পুলিশ অফিসার। ওদের হাতের শক্তিশালী টর্চের রশ্মি হলুদ আলোর বৃত্ত সৃষ্টি করছে বালিতে।

'এখানেই হাঁটছিলাম আমরা,' মুসা বলল। গালে এসে লাগছে সাগরের ফুরফুরে হাওয়া। নোনা গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে পচা শ্যাওলার গন্ধ।

পেছনে দুদিকে সরে গিয়ে আলো ফেলে ফেলে দেখতে শুরু করল দুই

অফিসার।

সৈকতের এপাশ-ওপাশ, সামনে-পেছনে চোখ বুলিয়ে অনুমানের চেষ্টা করল মুসা, কোথায় যেতে পারে অ্যানি?

রাতে এই সৈকত ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সর্বক্ষণ চলে ভ্যাম্পায়ারের আনাগোনা।

বালিয়াড়ির সাদা বালিতে উঁচু হয়ে আছে কালোমত একটা কি যেন। শেষবার এই বালিয়াড়িটার আড়ালেই হারিয়ে যেতে দেখেছিল অ্যানিকে। কৌতূহল হলো। এগিয়ে চলল ওটার দিকে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল, টর্চ হাতে খুঁজতে খুঁজতে দূরে সরে যাচ্ছে দুই অফিসার। পানির কিনারে খুঁজছে দুজনে। হয়তো ভাবছে রিকির মত পানিতে ডুবে মারা গেছে অ্যানিও।

কালো ঢিবিটার কাছে চলে এল মুসা। ভালমত দেখার জন্যে নিচু হয়ে তাকাল। পরক্ষণে সোজা হয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগল দুই অফিসারকে।

ছয়

বালিতে চিত হয়ে পড়ে আছে অ্যানি। একটা হাত বুকের ওপর, আরেক হাত পাশে ছড়ানো। চাঁদের আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে সাদা চামড়া। নিথর হয়ে পড়ে আছে সে।

'কোন কিছুতে হাত দিয়ো না,' মুসাকে সাবধান করল মহিলা অফিসার। সরে যেতে বলল।

অ্যানির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। খোলা চোখ দুটো নিষ্প্রাণ, শূন্য চাহনি মেলে যেন তাকিয়ে রয়েছে রাতের আকাশের দিকে। হাঁ হয়ে থাকা মুখ বালিতে ভরে গেছে। নাকের ফুটোয়ও বালি।

জানা দরকার কি করে মারা গেল ও। কাছে যেতে মানা করেছে তাকে অফিসাররা। করুক। শুনবে না কথা। জানতেই হবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দুজনে। মুসার দিকে চোখ নেই। এই সুযোগে অ্যানির লাশের কাছে চলে গেল সে। বসে পড়ে হাত বাড়িয়ে গলার কাছের চুল সরিয়ে দিল

চিৎকার করে উঠল দুই অফিসার। ওকে সরিয়ে নিতে এল একজন।

ততক্ষণে যা দেখার দেখে ফেলেছে মুসা। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল গলার শিরার ওপরের চামড়ায় দুটো ফুটো। দুই ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে কালো হয়ে আছে।

এই জিনিস দেখারই আশঙ্কা করেছিল। তারমানে তার সন্দেহ ঠিক। লীলা আর জন ছাড়াও আরও ভ্যাম্পায়ার আছে এই এলাকায়। ওগুলোকে থামানো দরকার। নইলে রিকি আর অ্যানির মত আরও কত জীবন যে নষ্ট

করবে ঠিক নেই।

চাপা রাগ ফুঁসে উঠতে লাগল ভেতরে ভেতরে। ওখানে দাঁড়িয়েই আরও একবার প্রতিজ্ঞা করল, সবগুলোকে ধ্বংস না করে ক্ষান্ত হবে না।

খুঁজে বের করবে!

খুন করবে একে একে!

কোনটাকে রেহাই দেবে না। স্যান্ডি হোলোকে পুরোপুরি মুক্ত করবে ভ্যাম্পায়ারের কবল থেকে।

*

বালিতে বসে পড়ল মুসা। মাথার মধ্যে কেমন ঘোর লেগে আছে।

মোবাইল ফোনে খবর পেয়ে আরও অনেক পুলিশ এসে হাজির হয়েছে। কাজে ব্যস্ত ওরা। লাশটা যেখানে পাওয়া গেছে, সাদা রঙের প্লাস্টিকের খুঁটি দিয়ে তার চারপাশ ঘিরে দিয়েছে। সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিভাবে মারা গেল মেয়েটা বোঝার চেষ্টা করছে।

বসেই আছে মুসা।

অবশেষে কাজ শেষ হলো পুলিশের। ওকে ডাকল একজন। একটা গাড়িতে তুলে নিল।

চুপচাপ বসে রইল সে। কারও সঙ্গে কোন কথা বলল না। ওরাও তাকে জিজ্ঞেস করল না কিছু। থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। অন্ধকার শহরটা ওর পাশ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে যেন স্বপ্নের মধ্যে।

মেইন স্ট্রীট আর ওশন অ্যাভেনিউটা যেখানে ক্রস করেছে, তার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। পাথরে তৈরি পুরানো বাড়ি। জানালায় মোটা লোহার শিক লাগানো। জেলখানার মত। হাজত, না জেল?

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

শেষবার ওর সঙ্গে দেখা গেছে অ্যানিকে। লাশটাও খুঁজে বের করেছে সে। তার জন্যে কি সন্দেহ করা হচ্ছে ওকে?

ওকারিশ নামে একজন ডিটেকটিভ তার অফিসে নিয়ে ঢোকাল মুসাকে। তারপর শুরু হলো মুষলধারে প্রশ্ন। একই প্রশ্ন বার বার। কখনও কণ্ঠস্বর চড়িয়ে, কখনও নামিয়ে; কখনও ধমকের সুরে, কখনও কোমল স্বরে—কোথায় দেখা হয়েছে অ্যানির সঙ্গে, কতদিনের পরিচয়, শেষবার ওর সঙ্গে কোন্খানে ছিল, কতক্ষণ, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং আরও নানা প্রশ্ন।

জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেল মুসা।

ভোরের ঘন্টাখানেক আগে ছাড়া পেল সে। হেঁটে চলল মেইন স্ট্রীট ধরে, বন্ধ দোকানগুলোর পাশ দিয়ে। একটা লোককেও দেখা গেল না এ সময়ে।

দ্রুত হাঁটতে লাগল সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে চাইছে যেন থানার কাছ থেকে। সে যে নির্দোষ এটা পুলিশকে বোঝাতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারছে না।

মনে হয় পারেনি। ওকারিশ ওকে সন্দেহ করে বসে আছে। ছেড়ে দিয়েছে বোধহয় ওর গতিবিধির ওপর চোখ রাখার জন্যে।

দোতলার শিক লাগানো জানালাগুলোর কথা মনে পড়তে আবার কেঁপে উঠল সে। ওর মধ্যে আটকা থাকতে হলে মরেই যাবে।

আবার অ্যানির কথা ভাবল।

রিকির কথা ভাবল।

রাগটা মাথা চাড়া দিল আবার। মনে মনে আবারও কসম খেল, ভ্যাম্পায়ারের দলকে ধ্বংস না করে শান্ত হবে না।

কি করে খতম করতে হয় ওদের, ভালমতই জানে এখন সে। ড্রাকুলার বইতে পড়েছে। একজন পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করেছে। একজন মওলানাকে জিজ্ঞেস করেছে। পাদ্রী বলেছেন, কাঠের চোখা খুঁটি ঢুকিয়ে দিতে হবে ভ্যাম্পায়ারের বুকে। ক্রুশ বাড়িয়ে ধরলে ভ্যাম্পায়ার আর এগোয় না। মওলানা বলেছেন, আল্লাহ্-রসুলের নাম করলে কোন জিন-ভূতেরই সাধ্য নেই কাছে এগোয়। দুজনেই একটা ব্যাপারে একমত—রোদের আলো আর আগুন সহ্য করতে পারে না রক্তচোষা ভূত। রোদের মধ্যে বের করে নিয়ে এলে, কিংবা গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলে ধ্বংস হতে বাধ্য। বুকে কাঠের খুঁটি পোঁতার চেয়ে আগুন ধরানোটাই সহজ মনে হয়েছে ওর কাছে।

তবে সবার আগে, প্রথম কাজটা হলো ওদের খুঁজে বের করা···

*

সাঁঝের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কণিকা। কেমন অসহায় বোধ করছে। কোথায় ওরা?—ভাবল। সব সময় এত দেরি করে কেন আসতে? শহরে গিয়ে ছেলেগুলোকে খুঁজে বের করার কথা ভাবল একবার।

চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিল উড়তে থাকা লম্বা কালো চুল। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। ওর এত তাড়া থাকাটা উচিত না। ডলি আর কিমি কখনও তাড়াহুড়া করে না।

পা থেকে স্যান্ডেল খুলে নিল সে। ঠাণ্ডা বালি ঢুকে যাচ্ছে আঙুলের ফাঁকে। হাঁটতে গেলে লাফ দিয়ে দিয়ে উঠে আসছে পায়ের পাতার ওপরে।

মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দে মুখ তুলে তাকাল সে। অনেকগুলো বাদুড় একসঙ্গে উড়ে চলেছে পাহাড়ের দিকে।

বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে চলার সময় খিলখিল হাসির শব্দে চমকে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখল টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে কিমি আর ডলি। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

ঘাবড়ে গেল কণিকা। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল দুজনকে। চিৎকার করে উঠল, 'এই, কি করছ!'

'রক্ত খাব,' জবাব দিল ডলি।

'কি যা তা বলছ! আমি তোমাদের স্বজন!'

'স্বজনের রক্তই খাব আজ,' কিমি বলল।

দুজনে যুক্তি করে এসেছে, বুঝতে পারল কণিকা। 'তারমানে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?'

'না, পারছি না,' ডলি বলল। 'তুমি যে আমাদের স্বজন, কি করে বুঝব?'

'কি করে বুঝতে চাও?'

'তোমার গলায় দাঁত বসাব। রক্তের স্বাদ থেকেই বুঝে যাব, তুমি আসল না নকল।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুজনকে দেখতে দেখতে কণিকা বলল, 'কাউন্ট ড্রাকুলা বলেছেন বুঝি?'

'যদি বলি তাই?'

'একই কথা তো আমিও তোমাদের বলতে পারি। আমি যদি বলি, আমার সন্দেহ তোমরা নকল। কাউন্ট ড্রাকুলা আমাকে বলেছেন তোমাদের রক্ত খেয়ে দেখার জন্যে। তাহলে কি বলবে?'

প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কিমি আর ডলি। পরস্পরের দিকে তাকাতে শুরু করল।

দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ওদের বুঝতে পেরে চাপ দিল কণিকা, 'কই, দাঁড়িয়ে আছ কেন? এসো, রক্ত টেস্ট করো আমার। তারপর আমি তোমাদের রক্ত টেস্ট করব।'

ডলির দিকে তাকিয়ে আচমকা ধমকে উঠল কিমি, 'তখনই বলেছি, এসব চালাকির দরকার নেই। ও আমাদেরই লোক। জন যখন ঢুকিয়েছে, নকল হতেই পারে না, কাউন্ট ড্রাকুলা যতই বলুন। নইলে আমাদের যা করতে বললেন, একই কাজ কণিকাকেও করতে বলবেন কেন?' কণিকার দিকে তাকাল, 'থাক, নিজেরা নিজেরা ঝগড়া করে আর লাভ নেই। কোথায় যাচ্ছিলে?'

'শহরে।'

'আমরাও যাব।'

সাত

পরদিন সন্ধ্যায় রবিনকে ফোন করল মুসা। সারাদিন ওর খোঁজ পায়নি। আশা করেছিল, আসবে। আসেনি। সে নিজেও যোগাযোগ করতে পারেনি। সারারাত থানায় কাটিয়ে এসে ভোরের দিকে সেই যে শুয়েছিল, উঠেছে দুপুরের পর। সাগরে গিয়ে সাঁতার কেটেছে অনেকক্ষণ। ফিরে এসে গোসল করে খাওয়াদাওয়া সারতে সারতে বিকেল শেষ। কাপড় পরে বেরোনোর জন্যে রেডি হয়ে এখন রবিনকে ফোন করল।

ফোন ধরল বোর্ডিং হাউসের অ্যাটেনডেন্ট। ওখানেই উঠেছে রবিন। মুসার শত চাপাচাপিতেও ওদের ভাড়া করা কটেজে ওঠেনি। লোক বাড়লে গাদাগাদি হয়ে যাবে, আঙ্কেল আর আন্টির অসুবিধে হবে। বেড়াতে আসা মানুষকে কোনভাবে বিরক্ত করা উচিত না।

'রবিন কোথায়?' জানতে চাইল মুসা। 'রবিন মিলফোর্ড?'

'ঘরে। আপনি কে?'
'আমি তাঁর বন্ধু। মুসা আমান। ডেকে দেয়া যাবে, প্লীজ?'
'ধরো। দিচ্ছি।'
রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনতে পেল মুসা। বেশ দেরি করে এসে ফোন ধরল রবিন।
'কে, মুসা? অ্যানির খবর শুনেছ?'
'হ্যাঁ। কেবল শুনিইনি, নিজের চোখে লাশ দেখে এলাম,' মুসা বলল। 'কাল রাতে সৈকতে গিয়েছিল আমার সঙ্গে। বেড়িয়ে-টেড়িয়ে সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলে আমার কাছ থেকে চলে গেল। রাত দুপুরে পুলিশ এসে ঘুম থেকে জাগাল আমাকে। বলল বাড়িতে ফিরে যায়নি সে। ওর মা নাকি খোঁজাখুঁজি করছে। আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে হবে। সৈকতে লাশ খুঁজে পাওয়ার পর আমাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন। যেন খুনিটা আমিই।'
'মানুষের জীবনটা কি অদ্ভুত, তাই না? কাল দেখলাম বেঁচে আছে, হেসেখেলে বেড়াচ্ছে, অভিনয় করছে, আজ নেই। কোনদিন আর মঞ্চে উঠবে না, কথা বলবে না...' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন।
মুসা চুপ করে আছে। অ্যানির গলার দাগগুলোর কথা বলবে কিনা ভাবছে। রবিন বিশ্বাস করবে না। এতদিন যেমন করেনি, এখনও করবে না।
'মুসা, শুনছ?'
'হ্যাঁ।'
'চুপ করে আছ কেন?'
'এমনি। তোমার কথা শুনছি। তোমার গলা এমন লাগছে কেন? শরীর খারাপ নাকি?'
'হ্যাঁ। খুব টায়ার্ড লাগছে সারাটা দিন ধরে। কেন এ রকম হচ্ছে বুঝতে পারছি না। আর ঘুম! বিছানা থেকেই উঠতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে সাতদিন ঘুমাইনি।'
'অসুখটা কি?'
'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। শরীরটা যেন একেবারে ভেঙেচুরে গেছে। আর দুর্বল কাকে বলে। আঙুল নড়াতেও ইচ্ছে করে না।'
শঙ্কিত হয়ে উঠল মুসা। খারাপ ভাবনাগুলো মনে আসতে দিল না। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল, 'জ্বরটর আসবে হয়তো। রিহারস্যালে যাবে?'
'চেষ্টা করব। কণিকাকে কথা দিয়েছি ওর সঙ্গে কার্নিভল দেখতে যাব।'
'বন্ধুত্বটা তাহলে ভালমতই হয়ে গেছে,' হাসল মুসা।
'কি জানি! মেয়েটা যেন কেমন। এখনই ভাল, এখনই কেমন হয়ে যাচ্ছে। অস্বাভাবিক। খুব অবাক লেগেছে আমার।'
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মুসা বলল, 'ঠিক আছে, রাখি। থিয়েটারে দেখা হবে।'
রিসিভার রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। রবিনের ক্লান্তির কথা

শুনে ভাল লাগছে না। ভ্যাম্পায়ারের খপ্পরে পড়ার পর রিকির ক্লান্ত লাগত, জিনারও লাগত। ক্লান্তি, ঘুম, বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে না করা, ফ্যাকাসে চেহারা, ঘোর লাগা ভাবভঙ্গি এ সব ভ্যাম্পায়ারে রক্ত খেয়ে যাওয়ার লক্ষণ। রিকি তো মরেই গেল। জিনা বেঁচেছে কপালগুণে। তবে ওই সময়কার কথা কিছু মনে করতে পারে না। জিনা কিছু বলতে পারেনি বলেই কিশোর আর রবিনকে ভ্যাম্পায়ারের কথা বিশ্বাস করাতে পারেনি সে। ভূতের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে কিশোর। অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছে রবিন। তবে এইবার ওদের ভুল ভাঙানোর সময় এসেছে। যা মনে হচ্ছে, রবিন নিজেই পড়েছে ভ্যাম্পায়ারের কবলে।

রবিনকে সাবধান করে লাভ হবে না। ও কথা শুনবে না। সাবধান থাকতে হবে মুসার নিজেকে। রবিনের ওপর চোখ রাখতে হবে। যাতে রক্ত খেয়ে খেয়ে ওকেও মেরে ফেলতে না পারে ভ্যাম্পায়ার।

ইস্, রিকির ব্যাপারটাও যদি আগেভাগে বুঝতে পারত! তাহলে এভাবে অপঘাতে মরতে হত না বেচারাকে। অ্যানি যে এভাবে ভ্যাম্পায়ারের কবলে পড়বে, সেটাও আন্দাজ করতে পারেনি মুসা। ওকেই ভ্যাম্পায়ার ভেবে বসে ছিল।

সামনের টেবিলটায় এক কিল মারল সে। দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে বলল, 'রবিনকে আমি কোনমতেই মরতে দেব না! রিকিকে নিয়েছ, অ্যানিকে নিয়েছ, আর কাউকে পাবে না! আমার কোন বন্ধুকেই আর নিতে দেব না তোমাদের!'

অস্থির ভঙ্গিতে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করল সে। রবিনের গলায় দাঁতের দাগ আছে কিনা দেখে শিওর হয়ে নিতে হবে।

কাজটা কার? কণিকার?

মেয়েটার চেহারা কল্পনা করল মুসা। আকর্ষণীয় চেহারা। লম্বা কালো চুল। মায়াময় দুটো চোখ।

'কণিকার ওপর নজর রাখতে হবে,' ভাবল মুসা। 'যত সুন্দর চেহারাই হোক, ভ্যাম্পায়ার হলে কোনমতেই বাঁচতে পারবে না আমার হাত থেকে।'

টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেয়া কাগজটা একটানে তুলে নিল সে। নাটকের সংলাপ লিখে নিয়েছে ওতে। গটমট করে এগোল দরজার দিকে। ওপাশে গিয়ে দড়াম করে পাল্লা লাগাল। টনিদের বাড়ি হয়ে যাবে ঠিক করল। ওকে পেলে একসঙ্গে যাবে থিয়েটারে।

অন্ধকার রাত। চাঁদ তো বটেই, তারাও সব মেঘে ঢেকে দিয়েছে। কটেজগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছায়াগুলোকে মনে হচ্ছে যেন ঘাপটি মেরে থাকা ভূত।

শিউরে উঠল মুসা। গা ছমছম করতে লাগল। এটা ভ্যাম্পায়ারের রাত! এমন চমৎকার রাতে রক্ত খেতে বেরোবেই ওরা।

নিরাপদে টনিদের বাড়িতে পৌঁছে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে।

বাড়িটা নতুন। ইঁটের দোতলা বাড়ি। যেন ভুল করে গজিয়ে উঠেছে

স্যান্ডি হোলোতে। এখানকার সব বাড়ি হয় কাঠের, নয়তো পাথরের। বেশির ভাগই পুরানো। সৈকতের ধারে ওগুলোর পাশে বাড়িটা তাই একেবারে বেমানান।

বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা পার্কও আছে। গাছপালা আছে। দুটো দোলনা আর কয়েকজনে একসঙ্গে বসার ব্যবস্থা আছে।

এত অন্ধকার, কোনদিকে যাচ্ছে সে, ঠাহর করা কঠিন।

খুট করে শব্দ হলো।

দাঁড়িয়ে গেল মুসা। কান পেতে রইল। আর কোন শব্দ নেই। কিন্তু শুনেছে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লুকিয়ে আছে নাকি কেউ? মানুষ না ভূত!

সব কিছুতে সবখানেই এখন ভ্যাম্পায়ার দেখছে সে। কারণ মন জুড়ে আছে রক্তচোষা ভূতের চিন্তা।

নিঃশব্দে বাড়িটার দিকে কয়েক পা এগোল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি। মনে হচ্ছে আড়াল থেকে কেউ নজর রাখছে তার ওপর।

লীলা আর জনের দোসররা কি জেনে গেছে ওর কথা? বুঝেছে ওকে ঠেকাতে না পারলে সবাইকে ধ্বংস করে দেবে সে? তাই আগেভাগেই ওকে খতম করে দিয়ে নিজেদের নিরাপদ ভাবতে চায়?

শব্দটা আবার কানে আসতে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। গাছপালার মধ্যে কোন কিছু থেকে থাকলেও চোখে পড়ল না। শুধুই অন্ধকার।

নাহ্, কিছু না। কিচ্ছু শুনিনি। সব কল্পনা। মনকে বোঝানোর চেষ্টা করল সে।

বাড়ির আশেপাশে গভীর ছায়া। যেখানে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার, সেই জায়গাটুকু পার হয়ে টনিদের সদর দরজার কাছে যেতে হবে।

এগোতেই আবার কানে এল ঘষার শব্দ। টেনে টেনে এগোনো পায়ের শব্দের মত। মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

'ও কিছু না!' ফিসফিস করে বলে নিজেকে অভয় দিতে চাইল সে। আবার পা বাড়াল দরজার দিকে।

আবার শব্দ।

ঘষার!

নখ ঘষছে নাকি! বাদুড়ের ডানাতেও ধারাল, বাঁকা নখ থাকে। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের রূপ নিতে পারে।

চলমান ছায়াটা চোখে পড়ল হঠাৎই। কিছু করার আগেই ওর গায়ের ওপর এসে পড়ল ওটা।

আতঙ্কে গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এল ওর।

হি-হি হাসি শোনা গেল অন্ধকারে। হাততালি দিয়ে সুর করে বলতে লাগল সিসি, 'পেয়েছে! পেয়েছে! ভয় পেয়েছে!'

চেপে রাখা দমটা ধীরে ধীরে ছাড়ল মুসা। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি জীবনে কমবে কিনা ভেবে অবাক হলো। বিড়বিড় করে বলল, 'কে বলল ভয় পেয়েছি? আমি জানতাম, তুমিই!'

'মোটেও জানতে না। তুমি ভেবেছিলে ভ্যাম্পায়ার।'

অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার মত লাগছে সিসির চেহারা। হাসিতে ওর দাঁত যে সব বেরিয়ে পড়েছে, না দেখেও অনুমান করতে পারছে মুসা।

'মানুষকে এভাবে ভয় দেখানো ঠিক না,' গলার কাঁপুনি এখনও বন্ধ হয়নি মুসার।

'কেন?'

'কারণ ব্যাপারটা মজার নয় মোটেও,' বলে আবার দরজার দিকে রওনা দিল মুসা।

'আমার কিন্তু বেশ মজা লাগে। এমন চমকে যায় সবাই, উফ্, যা মজা লাগে না তখন!'

জবাব না দিয়ে বেল বাজাল মুসা।

কয়েক সেকেন্ড পর দরজা খুলে দিল টনি।

'ইস্, তোমার বোনটা না একটা পাজির পা ঝাড়া!' অভিযোগ করল মুসা।

আট

নীরবে থিয়েটার হাউসের দিকে এগিয়ে চলেছে দুজনে। মুসা আর টনি।

অ্যানির কথা ভাবছে মুসা। দুঃখ হচ্ছে ওর জন্যে। কাল সবার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সে, আজ আর থাকবে না। কত সহজেই না একজন জলজ্যান্ত মানুষ হারিয়ে যায় চিরকালের জন্যে!

রবিনের জন্যেও দুশ্চিন্তা হতে লাগল।

স্যান্ডি হোলোর দক্ষিণ ধারে সামান্য উঁচু একটা ঘাসে ঢাকা জমিতে দাঁড়িয়ে আছে থিয়েটার হাউসটা। আয়তাকার কাঠের বাড়ি। দেয়ালে সাদা রঙ। জানালাগুলো সবুজ।

মুসা আর টনি একসঙ্গে হলে ঢুকল। অনেকেই এসেছে। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা। মঞ্চের কাছে জড় হয়েছে। অ্যানির কথাই আলোচনা করছে সবাই।

সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। ওদের মধ্যে কোন্‌জন ভ্যাম্পায়ার? কণিকাকে খুঁজল তার চোখ। কোথাও দেখতে পেল না ওকে।

'ওই যে কিমি,' টনি বলল। 'আমি যাই। পরে কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

মঞ্চ থেকে নামার সিঁড়ির কাছে কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে

কিমি। টনিকে ওর দিকে আসতে দেখে হাসল।

অন্য দিকে ভিড়ের মধ্যে রবিনকে খুঁজল মুসা। দেখতে না পেয়ে থিয়েটার হাউসের আরেক দিকে রওনা হলো।

'স্যান্ডি হোলোরই কেউ খুন করেছে অ্যানিকে,' পাশ কাটানোর সময় বাদামী-চুল একটা মেয়ের মন্তব্য কানে এল মুসার। 'এমন কেউ, যাকে আমরা চিনি।'

'অ্যাই, মুসা,' মুখ তিলে ভরা একটা ছেলে ডেকে বলল, 'নাটকটা আর হবে কিনা, কিছু শুনেছ?'

মাথা নাড়ল মুসা। ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল। এমন ফ্যাকাসে চামড়া কেবল ভ্যাম্পায়ারেরই হতে পারে। দিনের বেলা বেরোতে পারে না, রোদে যেতে পারে না, অন্ধকার ঘরে কফিনের মধ্যে শুয়ে থাকতে হয়—তাই এ অবস্থা। একে মনে রাখতে হবে, ভাবল সে।

থিয়েটারের দরজা খুলে গেল। ফিরে তাকাল মুসা। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঢুকছে রবিন।

চমকে গেল মুসা। রীতিমত করুণ রবিনের অবস্থা। বিধ্বস্ত চেহারা।

ঘুমের ঘোরে হাঁটছে যেন রবিন। মেঝের দিকে চোখ রেখে পা টেনে টেনে এগোচ্ছে মঞ্চের দিকে।

ভিড় ঠেলে ওর দিকে এগোল মুসা। কিন্তু সে রবিনের কাছে পৌঁছার আগেই ছায়া থেকে বেরিয়ে এল কণিকা। পৌঁছে গেল রবিনের কাছে। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ওকে সীটের দিকে। কথা বলতে বলতে হাসছে।

কণিকার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুসা। রবিনের অসুস্থতার জন্যে সে-ই দায়ী কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

রবিনের গলায় দাঁতের দাগ আছে নাকি আগে দেখতে হবে। তারপর অন্য কথা।

পাশ থেকে কে যেন হাত চেপে ধরল, 'হাই, মুসা।'

ডলি। পরনে ডেনিম কাটঅফ আর একটা নীল হলটার টপ। লম্বা চুলগুলোকে পেছনে কষে বেঁধেছে, ঘোড়ার লেজের মত ঝুলছে ঘাড়ের ওপর। হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা। সুন্দর লাগছে ডলিকে। তবে কোনখানে যেন একটা খুঁত আছে। চোখে নাকি? মনে হলো। শীতল চাহনি। কেমন লোভাতুর।

'খবর শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল ডলি।

নীরবে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'সাংঘাতিক কাণ্ড। কালকের এতবড় ঘটনার পরেও সবাই রিহারস্যালে এল, অবাকই লাগছে আমার। আমি তো ভাবলাম ভয়ে আজ রাতে বাড়ি থেকেই বেরোবে না কেউ।'

'তুমিও তো বেরিয়েছ।'

খিলখিল করে হাসল ডলি, 'কোন কিছুতে ভয় পাই না আমি।'

'ওরাও হয়তো পায় না।'

মঞ্চে উঠলেন মিসেস রথরক। মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুললেন চুপ করার জন্যে। 'অ্যাটেনশন, প্লীজ! এই, আমার কথা শোনো তোমরা।'

কথা বন্ধ করে দিল সকলে।

মিসেস রথরক ঘোষণা করলেন, নাটক চলবে। সেটাকে উৎসর্গ করা হবে অ্যানির নামে। তারপর জানালেন, 'অ্যানির জায়গায় এখন ডলি অভিনয় করবে।'

শুনে উজ্জ্বল হলো ডলির মুখ। মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'এবার তোমার সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ পাব আমি।'

জবাব দিল না মুসা। হিংসুক মেয়েটার ওপর বিরূপ হয়ে গেল মন। মিসেস রথরকের দিকে নজর ছিল বলে এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। এখন ফিরে তাকিয়ে দেখল রবিন আর কণিকা নেই সীটে। অদ্ভুত ব্যাপার! রিহারস্যাল শুরুর আগেই কেটে পড়ল! কণিকা কি ওকে রক্ত খাওয়ার জন্যে ধরে নিয়ে গেল নাকি?

'তাহলে শুরু করা যাক,' মিসেস রথরক বলছেন। 'প্রথম পর্ব।'

মুসার হাত ধরে টানল ডলি, 'আমাদের দিয়েই শুরু।'

মনে রবিনের জন্যে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে ডলির পেছন পেছন মঞ্চের দিকে এগোল মুসা। মঞ্চে উঠল। কোথায় কোন্ ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হবে দেখিয়ে দিলেন মিসেস রথরক। তারপর বললেন, 'রেডি। স্টার্ট।'

মঞ্চের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল মুসা। নজর পেছনে ব্যাকড্রপের আঁকা বিল্ডিঙের দিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'টোয়েন্টি সেভেন ব্র্যাকার স্ট্রীট।...কোথায় ওটা?...পাচ্ছি না কেন?...খুঁজে বের করতে না পারলে পিঠের চামড়া রাখবেন না আমার মিস্টার কর্কলি।'

ওর হাতে একটা ছোট বাক্স। মুদি দোকানের কর্মচারি সেজেছে। ডেলিভারি বয়ের বেশে খদ্দেরের বাড়িতে মাল সরবরাহ করতে এসেছে। ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না।

ছায়া থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ডলি। কানের কাছে বলে উঠল, 'কি খুঁজছ?'

এমন চমকে গেল মুসা, আরেকটু হলে হাত থেকে ছেড়ে দিচ্ছিল বাক্সটা।

'পথ হারিয়েছ বুঝি?' ডলির ঠোঁটে শয়তানির হাসি।

'আঁ...ইয়ে...ইয়ে...' কথা সরছে না মুসার মুখ থেকে।

'ইয়ে ইয়ে করছ কেন? হারিয়ে গেছ নাকি, সেটাও বলতে পারছ না?'

'আ-আমি ব্র্যাকার স্ট্রীটের সাতাশ নম্বর বাড়িটা খুঁজছি। তুমি চেনো?'

'চিনব না কেন? এসো,' হাঁটতে শুরু করল ডলি।

পেছন পেছন চলল মুসা। বুক কাঁপছে। এত ভয় পাচ্ছি কেন? মনে মনে নিজেকে ধমক লাগাল সে। এটা তো আর আসল নয়। নাটক।

তবে আসল বিপদও আছে স্যান্ডি হোলোতে। পথ হারানো মানুষের কাছে এভাবেই আচমকা এসে উদয় হয় ভ্যাম্পায়ার। সেটা ভেবে নিজেকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করল। মনে হলো তার, তাতে অভিনয়টা জমবে ভাল।

হঠাৎ মুসাকে চেপে ধরল ডলি।

হাত থেকে বাক্স ফেলে দিল মুসা। ধাক্কা দিয়ে ডলিকে সরানোর চেষ্টা করল।

আসুরিক শক্তিতে তাকে জাপটে ধরল ডলি। ফাঁক হয়ে গেল ঠোঁট। দুদিকের কোণা সরে গিয়ে বেরিয়ে এল মারাত্মক শ্বদন্ত। মঞ্চের আলোয় ঝকঝক করে জ্বলছে দাঁত দুটো। মুসার গলায় দাঁত বসিয়ে দিতে গেল।

'ভূ-ভূ-ভূত!' বলে চিৎকার করে উঠল মুসা। কিছুতেই ডলির বাহুমুক্ত হতে না পেরে চেঁচাতে শুরু করল, 'বাবাগো! খেয়ে ফেলল! বাঁচাও! বাঁচাও!'

ডলির আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ছটফট করতে লাগল।

'আরে করছ কি?' আবার চিৎকার করে উঠল মুসা। চিৎকারটা আগের চেয়ে বাস্তব মনে হলো। অভিনয় নয়। 'এত জোরে দাঁত ফোটাচ্ছ কেন? কেটে যাবে তো!'

হাসি শোনা গেল দর্শকদের।

কিন্তু কানেই তুলল না ডলি। দাঁতের চাপ কমাল না সামান্যতম। বরং বাড়াতে শুরু করল।

নয়

'আরে! করছ কি! ছাড়ো! ছাড়ো!' চিৎকার করতে লাগল মুসা। যখন কোনমতেই ছাড়ল না ডলি, এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিল।

হাসি বাড়ল দর্শকদের।

পিছিয়ে গেল ডলি। প্লাস্টিকের দাঁত দুটো খুলে নিল।

গলায় হাত বোলাতে লাগল মুসা। রক্ত বেরোয়নি। তবে দাঁতের চাপ আরেকটু জোরে লাগলে যেত ফুটো হয়ে। বাপরে বাপ! আসল দাঁতের চেয়ে কম শক্ত নয় ওই প্লাস্টিকের দাঁত।

'সরি,' ডলি বলল, 'অভিনয়ে এতটাই মনোযোগ দিয়ে ফেলেছিলাম, তুমি যে ব্যথা পাবে সেটাও মনে ছিল না।'

আহত জায়গা ডলতে লাগল মুসা। ডলির 'সরি' বলাও তার গোমড়া মুখে হাসি ফোটাতে পারল না। ভোঁতা স্বরে বলল, 'তবে স্বীকার করতেই হবে তুমি ভাল অভিনেত্রী।'

উজ্জ্বল হলো ডলির চোখ। 'থ্যাংকস।'

'ভেরি গুড। চমৎকার অভিনয় করেছ,' মিসেস রথরক বললেন। 'পরের দৃশ্য। রবিন, এসো।'

দুর্বল ভঙ্গিতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল রবিনকে। অন্য মানুষ লাগছে আজ ওকে। সেই প্রাণ-চঞ্চল রবিন নয়।

সংলাপও বলতে পারল না ঠিকমত। নীরস কণ্ঠ। তাতে প্রাণ নেই। যা করল সেটাকে আর যাই বলা যাক, অভিনয় বলা যাবে না।

'বাতিল করে ফেলেছে ওকে!' আনমনে বিড়বিড় করল মুসা।

শুনে ফেলল ডলি। 'কণিকার সঙ্গে বেরিয়েছিল না একটু আগে?'

'অ্যাঁ!...হ্যাঁ!' কি মনে হতে ঝট করে তাকাল ডলির দিকে। 'কণিকার সঙ্গে বেরোনোয় কি হয়েছে?'

'না, কিছু না,' অন্য দিকে চোখ ফেরাল ডলি।

ওর আচরণ রহস্যময় মনে হলো মুসার কাছে। ডলি কিছু জানে মনে হচ্ছে। ভ্যাম্পায়ারের ব্যাপারটা সে-ও সন্দেহ করেছে নাকি!

রিহারস্যালের পর মুসা আর ডলির সঙ্গে টনি আর কিমিও এগোল দরজার দিকে।

'বাড়ি যাবে এখন?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল টনি।

এই সময় রবিন আর কণিকাকে আসতে দেখে মুসা বলল, 'না, এত সকাল সকাল যাব না।' কণিকার ওপর নজর রাখতে চায় সে। 'চলো, প্রিন্সেসে যাই। খিদে পেয়েছে।'

রবিনের দিকে তাকাল ডলি, 'তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে কয়েক বছর ধরে ঘুমাওনি।'

'উল্টোটা বললে,' রবিন বলল। 'সারা দিনই ঘুমাই এখন। জেগে উঠে দেখি, ঘুমানোর আগে যেমন ছিলাম, তার চেয়ে দুর্বল লাগছে।'

তাকিয়ে আছে মুসা। রিকি আর জিনার সঙ্গে রবিনের অসুস্থতার ষোলো আনা মিল। গলায় দাগ আছে কিনা দেখার চেষ্টা করল। নেই।

দ্বিধায় পড়ে গেল সে। রবিন কি আসলেই কোন রোগের শিকার? ভ্যাম্পায়ারের নয়?

পোলো শার্ট পরেছে রবিন। উঁচু কলার। গলার নিচের দিকটা দেখা যায় না। ওখানে দাগ থাকতে পারে। পুরো গলা না দেখে নিশ্চিত হওয়া যাবে না।

রবিনের হাত ধরে টানল কণিকা, 'চলো, বেরোই।'

'কোথায় যাব?'

'প্রিন্সেসে। মুসা বলল না?'

হাই তুলতে তুলতে জবাব দিল রবিন, 'আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি বাড়ি যাব।'

হতাশ মনে হলো কণিকাকে। 'এক ঘণ্টার জন্যেও পারবে না?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন। মুসার দিকে তাকাল, 'মুসা, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে? একা যেতে ভরসা পাচ্ছি না।'

'চলো।'

'কিন্তু মুসা...' বলতে গেল ডলি।

বাধা দিল মুসা, 'না, ডলি, আজ আর তোমার সঙ্গে যেতে পারলাম না। কাল দেখা যাবে। রবিনকে দিয়ে আসা দরকার। ও অসুস্থ।'

'এই না বললে প্রিন্সেসে যাবে?'

'ব লছি। রবিন বাড়ি যেতে চাইবে, জানতাম না। তোমরাও চলে যেতে পারো। আজ আর প্রিন্সেসে যাওয়া হবে না।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' কণিকার মতই হতাশ মনে হলো ডলিকেও।

মুসার দেখাদেখি টনিও যদি মত পাল্টায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে টান দিল কিমি, 'চলো, ওরা না গেলে নাই। আমরাই যাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে, মুসা আর রবিনকে 'পরে দেখা হবে' বলে কিমির হাত ধরে বেরিয়ে গেল টনি।

একা যেতে যেন ভাল লাগছে না কণিকার। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। পাশ থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'কি ব্যাপার, একা নাকি?'

ফিরে তাকাল সবাই। মুসা দেখল, সেই তিল-পড়া ছেলেটা।

কণিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা। হেসে বলল, 'আমি ইমি। কার্নিভলে যেতে ইচ্ছে করছে। একা একা যেতে ভাল লাগছে না। একজন সঙ্গী পেলে যেতাম। ভয় নেই, খেলাধুলার খরচা সব আমিই দেব।'

কি ভেবে রাজি হয়ে গেল কণিকা। রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি বাড়ি যাও। আমি এর সঙ্গে চলে যাচ্ছি।'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না রবিন। বলার শক্তিও যেন নেই।

ইমির সঙ্গে বেরিয়ে গেল কণিকা।

রবিনের দিকে তাকাল মুসা, 'এসো।'

সারাটা পথ ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে এল রবিন। উঁচু-নিচু জায়গাগুলোতে তাকে ধরে ধরে পার করল মুসা।

বোর্ডিং হাউসের গেটের কাছে এসে রবিন বলল, 'থাক, আর আসতে হবে না। যাও এখন। কাল দেখা হবে। থ্যাংক ইউ।'

সামান্য উসখুস করে মুসা বলল, 'রবিন?'

ঘুরে দাঁড়াল রবিন, 'কি?'

'রবিন, সাবধানে থেকো।'

হাসল রবিন। বাড়ির বারান্দা থেকে এসে পড়া আলোয় মলিন দেখাল হাসিটা। 'দেখো, রোগ হওয়াটা কারও হাতে নয়। সাবধানেই তো থাকি...'

'আমি সেকথা বলছি না...'

'তাহলে?...ও, ভ্যাম্পায়ার। তোমার মাথা থেকে এখনও গেল না সেটা। কই, হপ্তা তো পেরিয়ে গেল এখানে এসেছি। ভ্যাম্পায়ারের ছায়াও তো চোখে পড়ল না।'

'কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি...'

'পরে কথা বলব। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না...'

'ঠিক আছে, যাও। পরেই কথা বলব। তুলে দিয়ে আসব বারান্দায়?'

'না, লাগবে না।'

*

বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করল না মুসার। সঙ্গী হিসেবে কাউকে পাওয়া যাবে না এখন আর। ডলিও চলে গেছে। একা একাই সৈকতে রওনা হলো সে।

চলে এল ডক হাউসের কাছে। দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল। ফিরে তাকাল পেছনের কালো পাহাড়ের দিকে।

বাদুড় উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। দ্বীপ থেকে আসছে। যাবে ওই পাহাড়টায়। খেয়েদেয়ে পেট ভরিয়ে অন্ধকার থাকতে থাকতেই আবার দ্বীপে ফিরে যাবে।

একা একা থাকতে ভাল লাগল না বেশিক্ষণ। ফিরে চলল। এতক্ষণ কৃষ্ণপক্ষের হলুদ চাঁদ ছিল আকাশে। এখন সেটাও মেঘে ঢাকা পড়েছে। সাগর থেকে এসে ঝাপটা দিয়ে গেল একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। গায়ে কাঁটা দিল।

অন্ধকার। চাঁদ-মেঘের খেলা। ভ্যাম্পায়ার আসার উপযুক্ত সময়।

সাবধানে এগিয়ে চলল মুসা।

ভয় লাগছে তার। দোয়া-দরূদ পড়তে পড়তে এগোল।

হাঁটতে হাঁটতে বালিয়াড়িটার কাছে চলে এল। কিছু ঘটল না।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। ভূতুড়ে ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে দিল আবার।

বালিয়াড়ির কাছ দিয়ে চলার সময় কালো কি যেন পড়ে থাকতে দেখল সে।

আবার কালো জিনিস! ধড়াস করে উঠল বুক। মানুষ না তো!

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওটার দিকে।

মানুষই! পড়ে থাকার ভঙ্গিটা ভাল না। আরও কাছে এসে দেখল উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে ওর। পকেটে হাত দিল। এখনও আছে রিকির বুটেন লাইটারটা। দ্বীপে গিয়ে জিনাকে আনার সময় একবার কাজে লেগেছে ওটা। তারপর থেকে আর কাছছাড়াই করে না।

আলো জ্বেলে পড়ে থাকা মানুষটার মুখ দেখে চমকে গেল সে।

ইমি!

একবার নাড়ি টিপেই বুঝে গেল, বেঁচে নেই।

বালিতে মাখামাখি মুখ। গলায় ঝাঁক বেঁধে রয়েছে মাছি। নিশাচর মাছিও আছে তারমানে। রক্ত খায় নাকি! হাত দিয়ে প্রায় ডলে সরাল সেগুলোকে।

গলার চামড়ায় স্পষ্ট দেখা গেল ফুটো দুটো। এক ফোঁটা করে রক্ত লেগে রয়েছে সেগুলোর ওপর। মুখের চামড়া ময়দার মত সাদা।

শুষে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলা হয়েছে ওকে। এক ফোঁটা রক্ত থাকতে ছাড়েনি। একেবারে রিকির মত।

কে করল কাজটা? বেরিয়েছিল তো কণিকার সঙ্গে।

সন্দেহটা সরাসরি কণিকার ওপরই পড়ে। তবে সে না-ও হতে পারে। মাত্র আগের দিন একইভাবে অ্যানি খুন হয়েছে এখানে। সে তো আর কারও সঙ্গে বেরোয়নি। তারমানে খুন করার পদ্ধতি বদল করেছে ভ্যাম্পায়ার। রাতে এসে ওত পেতে থাকে শিকারের আশায়। কাউকে একা পেলেই···

ঝট করে মাথা তুলে চারপাশে তাকাতে শুরু করল মুসা। নির্জন সৈকতে

কোন মানুষের সাড়াশব্দ নেই। সে একা! তার রক্ত খাওয়ার জন্যেও আসবে না তো ভ্যাম্পায়ার!

একটা মুহূর্তও আর থাকতে সাহস করল না। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটতে শুরু করল লোকালয়ের দিকে।

দশ

পরদিন রাতে। পিজ্জা কোভে দুটো টেবিলে বসেছে টনি, রবিন, কিমি, ডলি, কণিকা আর মুসা। আলোচনা হচ্ছে ইমির মৃত্যুরহস্য নিয়ে।

'মেইন স্ট্রীটের একটা পে ফোন থেকে থানায় ফোন করলাম,' মুসা বলছে। 'মাথাটা তখন পুরো খারাপ আমার। ভয়ে, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে হাত-পা। কথাও বলতে পারছিলাম না ঠিকমত।

'যাই হোক, পুলিশ এল। নিয়ে গেলাম লাশের কাছে। ওদের কাজ শেষ হওয়ার পর আবার আমাকে নিয়ে গেল থানায়। চলল একটানা জিজ্ঞাসাবাদ। ডিটেকটিভ অফিসার ওকারিশের সন্দেহ আরও বেড়েছে আমার ওপর। বাড়বেই। দু' দুটো খুন হলো। একজনের সঙ্গে শেষ দেখা গেছে আমাকে। তা ছাড়া দুজনের লাশই খুঁজে পেলাম আমি। ওকারিশের বোধহয় সন্দেহ, খুন করে রেখে এসে খুঁজে বের করার অভিনয় করেছি।'

কথা শেষ করে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল মুসা।

কোন ভাবান্তর নেই ডলির।

রবিনকে আগের দিনের চেয়ে ক্লান্ত লাগছে। কণিকার পাশে বসে আছে চুপচাপ। চোখ লাল। মাথা সোজা রাখতেও কষ্ট হচ্ছে।

বার বার ওর গলার দিকে তাকাচ্ছে মুসা। পোলো শার্টের কলারের জন্যে আজও দেখা যাচ্ছে না দাঁতের দাগ।

কণিকার দিকে তাকাল সে। একটা পেপার ন্যাপকিন ছিঁড়ে কুটি কুটি করে এক জায়গায় জমাচ্ছে কণিকা। হাত কাঁপছে ওর। ভয়ে নাকি?

ভয় না কচু! মনে মনে রেগে গেল মুসা। অভিনয় করছে। দেখাচ্ছে আমাদের যে ওর কোন দোষ নেই।

'মৃত্যুর আগে অ্যানির হয়েছিল তোমার সঙ্গে শেষ দেখা,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল কণিকা, 'আর ইমির হলো আমার সঙ্গে। বিশ্বাসই করতে পারছি না।'

এক টুকরো পিজ্জা বাড়িয়ে দিল রবিন। 'নাও।'

'আমি এখন কিচ্ছু মুখে দিতে পারব না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল কণিকা। 'মনটা ভীষণ খারাপ।'

ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। জানে, ভ্যাম্পায়াররা রক্ত ছাড়া কিছু খেতে পারে না। কণিকার চামড়া মোমের মত সাদা। যেন রক্তশূন্যতায় ভুগছে। দিনের বেলা না বেরোতে পারলে, চামড়ায় রোদ না লাগলে এ রকম

মড়ার মত সাদা হয়ে যায় মানুষের চামড়া।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল টনি। 'এখানে এসেছিলাম ছুটি কাটাতে। ভেবেছিলাম চমৎকার কাটবে দিনগুলো। কিন্তু কারোর মনেই আর আনন্দ নেই। সৈকতে টহল দিচ্ছে পুলিশ। লোকে আতঙ্কিত। সবার মুখে কেবল খুনের আলোচনা। ভ্যাম্পায়ারকে দোষ দিচ্ছে অনেকে।'

'ওফ্,' চোখ মুখ কুঁচকে ফেলল কিমি, 'এক কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল! ভ্যাম্পায়ার বলে কোন কিছু থাকলে তো খুন করবে।'

'হায়রে কপাল, এখনকার দিনেও এই কুসংস্কার,' আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল ডলি। 'ভূত বলে কিছু নেই, সবাই জানে। তা-ও ভূতকে দোষ দেয়। বেকুব ছাড়া আর কি বলব ওদের।'

'বেকুব বলো আর যাই বলো, আমি ভূত বিশ্বাস করি,' জোর গলায় বলল মুসা। 'সেটাকে আমি কুসংস্কারও বলব না। ভূত আছে এটা যেমন প্রমাণ করতে পারেনি কেউ, নেই এটাও পারেনি। তবে, আছে, এটা আমি প্রমাণ করেই ছাড়ব এবার।'

কণিকা তাকাল ওর দিকে। ভাবলেশহীন শূন্য দৃষ্টি। যেন মুসার কথায় কোন আগ্রহ নেই ওর। বিরাট অভিনেত্রী। ভাবল মুসা। ডলিকে না দিয়ে নাটকের প্রধান চরিত্রটা ওকে করতে দেয়া উচিত ছিল।

'সত্যি ভূত বিশ্বাস করো তুমি?' কিমি জিজ্ঞেস করল।

'করে,' মুসার হয়ে জবাবটা দিল রবিন। 'ভূতের কথা শুনলেই চোখ উল্টে দেয়। অথচ ক্ষ্যাপা মোষের সামনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দাও, ভয় পাবে না। এ এক আজব চরিত্র, আমাদের মুসা আমান।'

'দুনিয়াটা, সত্যি, আজব মানুষে বোঝাই।'

চুপ করে রইল মুসা। মনস্থির করে নিয়েছে কারও ব্যঙ্গ, কারও হাসাহাসিতে কান দেবে না। তর্কও করবে না। যে যা বলে বলুক। তার কাজ সে করে যাবে।

উঠে দাঁড়াল কিমি। টনির হাত ধরে ওকে টেনে তুলল চেয়ার থেকে। 'চলো। আমাকে কার্নিভলে নিয়ে যাবে বলেছিলে।'

'সেটা কাল বলেছি। মনমেজাজ আজ ঠিক নেই।'

'চলো। গেলেই মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। এখানে বসে এসব ফালতু আলোচনা করতে থাকলে বরং বিগড়াবে আরও।'

'তোমরা কেউ যাবে?' সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল টনি।

কেউ যেতে চাইল না।

টনিকে নিয়ে কিমি বেরিয়ে গেলে কণিকার দিকে ফিরল মুসা।

রবিনের সঙ্গে কথা বলছে কণিকা। কালো চুল। কালো চোখ। ফর্সা গাল। সুন্দর চেহারা। ওকে ভ্যাম্পায়ার ভাবতে কষ্ট হলো।

কিন্তু লীলাও সুন্দর ছিল।

তাই বলে কি ভ্যাম্পায়ার ছিল না?

আবার এক টুকরো পিজ্জা নিয়ে কণিকার দিকে বাড়িয়ে দিল মুসা,

'নাও।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে টুকরোটার দিকে তাকাল কণিকা।

মুসা জানত, এ রকমই করবে সে।

'না, আমি খাব না,' মাথা নাড়ল কণিকা। 'বললামই তো, খেতে পারব না।'

'খাও না,' কণিকার মুখের কাছে টুকরোটা নিয়ে গেল মুসা। জোর করে গুঁজে দেবে যেন। 'খুব ভাল বানানো হয়েছে। দারুণ টেস্ট।'

'না!' বলে ঝটকা দিয়ে পেছনে মাথা সরিয়ে নিল কণিকা।

'এক কামড় খেয়ে দেখো,' চাপাচাপি শুরু করল মুসা।

'খেতে যখন চাইছে না, থাক না,' রবিন বলল, 'শুধু শুধু জোর করছ কেন ওকে?'

আস্তে করে টুকরোটা প্লেটে নামিয়ে রাখল মুসা। চোখ কণিকার দিকে। 'ও বুঝে ফেলেছে, আমি ওকে চিনে ফেলেছি,' ভাবছে মুসা। 'এখন নিশ্চয় আমার মুখ বন্ধ করে দেয়ার কথা ভাববে।'

চিন্তায় পড়ে গেল সে। ভ্যাম্পায়ারকে সরাসরি যুদ্ধে আহ্বান! কাজটা কি ঠিক হলো? অ্যানি আর ইমির সৈকতে পড়ে থাকার দৃশ্যটা কল্পনা করে শিরশির করে উঠল মেরুদণ্ডের ভেতর।

এগারো

পরদিন বিকেল।

রবিনকে ফোন করল মুসা।

'রবিন, আমি,' কান আর কাঁধ দিয়ে ফোনের রিসিভারটা চেপে রেখে উবু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগল সে।

'কেমন আছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন। খসখসে কণ্ঠস্বর। কথাতেই বোঝা গেল ক্লান্তি এখনও কাটেনি ওর। নিশ্চয় আবার কোন ফাঁকে ওর রক্ত খেয়েছে ভ্যাম্পায়ার।

ঘাবড়ে গেল মুসা। দেরি করে ফেলল না তো! জরুরী কণ্ঠে বলল, 'রবিন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'এখন তো বলতে পারব না,' রবিনের কণ্ঠস্বর এত দুর্বল, বোঝাই যায় না প্রায়। 'কণিকার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওকে আমি কথা দিয়েছি...'

'ওর ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। ফিতে বাঁধা শেষ। সোজা হয়ে বসল। রিসিভারটা হাতে নিল আবার।

'কণিকা?' অবাক মনে হলো রবিনকে।

'শোনো, রবিন, আমার কথা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না, তবু বলি। ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রয়েছ তুমি।'

ওপাশ থেকে মৃদু হাসি শোনা গেল। দুর্বল হাসি।

'দেখো, রবিন, আমি সিরিয়াস,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মুসা। 'হেসো না। আমার কথা শোনো।'

'আমার ভাল লাগছে না, মুসা,' কাশতে কাশতে বলল রবিন। 'কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বেরোতে হবে।'

'রবিন, একবারও কি তোমার মনে হয়নি হঠাৎ করে এত দুর্বল লাগছে কেন তোমার? কিসের অসুখ? কারণটা আর কিছুই না, রবিন। সব কিছুর মূলে ওই কণিকা।'

দীর্ঘ নীরবতার পর রবিন বলল, 'তাই?'

'কণিকা একটা ভ্যাম্পায়ার, রবিন,' গরম হয়ে উঠছে মুসা। 'আমি জানি, কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু ও ভ্যাম্পায়ার। তোমার রক্ত খাচ্ছে। অল্প অল্প করে খাচ্ছে, যাতে মরে না যাও। রিকি, অ্যানি আর ইমির মত একবারে খেয়ে ফেলছে না। এখনও যদি সাবধান না হও...'

'মুসা, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে,' বাধা দিল রবিন। 'এখন এসব ভূতের গল্প ভাল লাগছে না...'

'রবিন, গল্প নয়!' বিশ্বাস করানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল মুসা। 'রিকির বেলায় কি ঘটেছে, বলেছি তোমাকে। জিনার অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখলে। জিনার মতই তোমাকেও...'

'জিনার মাথায় গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, তাই ওরকম করেছে। আমার তো আর তা হয়নি...'

'ভ্যাম্পায়ারেই ওর মাথাটা বিগড়েছে, রবিন। আমার কথা না শুনলে তোমারও এই অবস্থা হবে। যদি ভাগ্য ভাল হয়, বেঁচে থাকো, রিকির মত মরে না যাও। কণিকা তোমাকে...'

'কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আমার, মুসা। অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠছি। সেটা ভূতের কারণে নয়। নিশ্চয় কোন ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছে, ফ্লু-মু হবে। মুসা, তুমি বরং আমার কথা শোনো। রকি বীচেও বলেছি, এখনও বলছি—ডাক্তার দেখাও। জিনার আর তোমার একই অসুখ। কি হয়েছিল তোমাদের, কে জানে। অতিরিক্ত ভয় পেলে হয় ওরকম। সেরাতে নৌকা নিয়ে একা একা দ্বীপে যাওয়া তোমাদের মোটেও উচিত হয়নি।...আঙ্কেল আর আন্টি ফিরেছেন?'

'অ্যাঁ?...হ্যাঁ।'

'কথা বলেছ তাঁদের সঙ্গে?'

'না।'

'তাহলে বলে ফেলো। আর দেরি কোরো না। সত্যি কথাটাই জানাও। বলবে, ভ্যাম্পায়ারের আতঙ্ক তোমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। তোমার যদি বলতে সঙ্কোচ হয়, আমিই নাহয় বলে দেব। মোট কথা, তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার। দেরি করলে শেষে জিনার মত হাসপাতালে যেতে হবে।'

নিজের জীবন বিপন্ন, আমাকে ভাবছে পাগল! কি যে করি!—চুপ করে

রইল মুসা।
'অ্যাই, মুসা, শুনছ?'
'হ্যাঁ, বলো।'
'আমি বেরোচ্ছি।...ওই যে, কণিকা এসে গেছে। পরে দেখা হবে...'
'প্লীজ, রবিন!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'দোহাই লাগে তোমার! ওর সঙ্গে বেরিয়ো না! মারা পড়বে, রবিন...'
কট করে শব্দ হলো। লাইন কেটে গেছে।

*

টপ করে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়ল মুসার ঘাড়ে। বরফের মত শীতল পানি ঘাড় বেয়ে নেমে গেল নিচের দিকে চামড়ায় অদ্ভুত সুড়সুড়ি তুলে।

ঘন হচ্ছে কুয়াশা। শহর ঢেকে দিয়েছে। স্ট্রীট ল্যাম্পগুলোকে আলো ছড়াতে দিচ্ছে না। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে ঘোলাটে হলুদ আভা ছড়াচ্ছে কেবল ওগুলো।

মেইন স্ট্রীটে উঠল মুসা। পিজ্জা কোভে খুঁজল রবিন আর কণিকাকে। পেল না।

আর্কেডে এসে 'প্রিন্সেস'-এর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। বাইরের ভেজা রাতের চিহ্নও নেই এখানে। প্রচুর আলো। জোরাল মিউজিক বাজছে। বাজনার শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের চিৎকার-চেঁচামেচি আর হাসির শব্দ। ভিডিও গেম খেলছে।

আইসক্রীম পারলারে উঁকি দিল। পাশাপাশি টুলে বসে আছে টনি আর কিমি। টনির হাতে আইসক্রীম।

এগিয়ে গেল মুসা। ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। 'টনি, রবিনকে দেখেছ?'

ঝট করে মাথা ঘোরাল কিমি। মুসাকে দেখে বদলে গেল চাহনি। মাথা নেড়ে বলল, 'না, দেখিনি। তুমি বাপু এখন যাও তো। আবার কোন্ ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করবে...'

'তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি আমি!' কঠোর স্বরে জবাব দিয়ে টনির দিকে ফিরল মুসা, 'কি, দেখেছ রবিনকে?'

'নাহ্, গতকাল থেকেই দেখছি না,' টনিও অধৈর্য।

'কিন্তু ওকে আমার দরকার। খুঁজে বের করতেই হবে। ভীষণ বিপদে আছে ও।'

আবার নাক গলাল কিমি, 'কিসের বিপদ?'

'কণিকা একটা ভ্যাম্পায়ার। রবিনকে সাবধান করেছি। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করল না। কণিকা ওকে...'

'আহ্, দয়া করে এবার থামাও না তোমার ওই ভ্যাম্পায়ারের গপ্পো!' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল টনি। ভ্রূকুটি করল।

'বললাম তো গপ্পো নয়...'

চোখের পাতা সরু করে ফেলল টনি। কথা শেষ করতে দিল না মুসাকে। 'দেখো, অতিরিক্ত জ্বালাতন শুরু করেছ তুমি। সহ্যের একটা সীমা

আছে। তোমার মাথায় গোলমাল হয়ে গেল নাকি ভাবছি।'

'গোলমাল! কিসের গোলমাল?' ফেটে পড়ল মুসা। 'রিকি মরল। জিনার যখন এই অবস্থা হয়েছিল, তখনও তোমাদের জানিয়েছি। বিশ্বাস করোনি। হাসাহাসি করেছ। আমাকে পাগল ভেবেছ। ওর কি অবস্থা হয়েছে, দেখেছ...'

'দেখেছি। সে-ও তোমার মত পাগল হয়ে গেছে। কোন কারণে তোমাদের দুজনেরই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল...'

'হ্যাঁ, হয়েছিল! এবং সেই কারণটা ভ্যাম্পায়ার! কতবার বলব এক কথা!'

নিরাশ ভঙ্গিতে কপাল চাপড়াল টনি। মুসার দিকে তাকালও না আর।

মুসা বুঝল, কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না এদের কাছে। যা করার তার নিজেকেই করতে হবে। একা।

সে-ও আর কারও দিকে না তাকিয়ে গটমট করে বেরিয়ে এল আর্কেড থেকে।

বারো

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল নীরবে মুসা।

সাদা কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেছে স্যান্ডি হোলো। চেপে আসছে যেন চারদিক থেকে।

মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে ওর। কেউ বিশ্বাস করছে না ওকে। সবাই ভাবছে পাগল হয়ে গেছে। সাহায্য করার কেউ নেই। একেবারে একা সে। নিঃসঙ্গ।

পায়ের নিচে নরম লাগল। নিচে তাকিয়ে দেখল ভেজা বালি। সৈকতে পৌঁছে গেছে।

জুতো খুলে হাতে নিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে লাগল। আরাম লাগছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালি ঢুকে যাওয়ার সময় চমৎকার একটা অনুভূতি হয়। ওর বাঁ দিকে পানি। ঢেউ আছড়ে পড়ছে। কিছুদূরে সামনে বোট হাউসটা। কোন চিন্তাভাবনা না করে সেদিকেই এগিয়ে চলল সে।

মাথার ওপরে ডানা ঝাপটানোর শব্দ হতেই চমকে মুখ তুলে তাকাল। তিনটে বাদুড়। কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট। নিচ দিয়ে না উড়লে চোখে পড়ত না। তাকিয়ে রইল ওগুলোর দিকে। বাদুড়ের রূপ ধরে আসে ভ্যাম্পায়ার। কুয়াশার মধ্যে এসেছে। কুয়াশার মধ্যে বাদুড় ওড়ে কিনা, খাবারের খোঁজে বেরোয় কিনা, জানা নেই ওর। ভূত হওয়ার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সাবধান রইল। কিন্তু থেকেই বা কি করবে বুঝতে পারছে না। ভ্যাম্পায়ার হলে কি দিয়ে ঠেকাবে? কোন অস্ত্র তো নেই সঙ্গে।

বোকামি হয়ে গেছে। মস্ত বোকামি। যে সৈকতে দু'দুটো খুন হয়ে গেছে

ইতিমধ্যে, সেখানে এভাবে নিরস্ত্র চলে আসাটা উচিত হয়নি।

কিন্তু আক্রমণ করল না বাদুড়গুলো। তিনটে কালো ছায়ার মত মিলিয়ে গেল কুয়াশার মধ্যে।

ফিরে যাবে কিনা ভাবতে ভাবতে এগিয়েই চলল সে। আপন চিন্তায় বিভোর।

আরেকটা শব্দ কানে এল।

পেছনে।

কেউ অনুসরণ করছে ওকে!

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল সে।

কেউ নেই।

কল্পনা! ভাবল সে। মাথার মধ্যে ভূতের চিন্তা পাক খাচ্ছে বলেই উল্টোপাল্টা এত কিছু দেখছে।

কিন্তু না, ভুল দেখেনি। কুয়াশার মধ্যে থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। যেন একটা কাঁপা কাঁপা ছায়া বেরিয়ে এসে মানুষের রূপ নিল। কুয়াশা আর আলোর কারসাজি নাকি!

'কে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি,' ধীরপায়ে সামনে এসে দাঁড়াল ডলি।

'এত রাতে এখানে?'

'বাড়িতে একা একা ভাল লাগছিল না। তোমার সঙ্গে হাঁটি কিছুক্ষণ? অসুবিধে আছে?'

'না, অসুবিধে আর কি,' সঙ্গী পেয়ে খুশিই হলো মুসা।

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা। চারপাশ ঘিরে ওদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে যেন কুয়াশার সাদা দেয়াল।

খপ করে মুসার হাত চেপে ধরল ডলি, 'শুনছ?'

'ফগহর্ন।'

'হ্যাঁ। ওই শব্দ আমার ভাল লাগে।'

'কেমন যেন রহস্যময়।'

সামনে এসে দাঁড়াল ডলি। মুখোমুখি হলো ওর। হাত রাখল দুই কাঁধে। মিষ্টি গন্ধ পেল মুসা। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মোহনীয় কণ্ঠে বলতে লাগল ডলি, 'ফগহর্ন আমার ভাল লাগে। কুয়াশা ভাল লাগে। সব কিছু ঢেকে দেয়। কিচ্ছু দেখা যায় না। কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিচিত্র অনুভূতি হলো মুসার। মাথার মধ্যে বোঁ করে উঠল। মগজে সব কিছু গড়বড় হয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে নাচতে শুরু করেছে কুয়াশা।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ডলির মুখ।

*

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল মুসা। সরিয়ে নিল গলা। হাত দিয়ে ডলতে ডলতে বলল, 'কামড় দিল কিসে?'

ডলিও সরে গেছে। 'মশাটশা হবে। কুয়াশা পড়লে যেন পাগল হয়ে যায় রক্ত খাওয়ার জন্যে।'

'তোমাকে ঘাবড়ে দিলাম নাকি?'

মুসার কথা যেন কানেই যায়নি। একঘেয়ে কণ্ঠে বলল ডলি, 'মশাকে আমি ঘৃণা করি। এমন শয়তানের শয়তান। রক্তচোষা জীব!'

ঘাড় ডলছে এখনও মুসা। বলল, 'বাড়ি যাব। আর ভাল লাগছে না এখানে।'

'তুমি সব সময়ই খালি পালাতে চাও।'

'না, তা চাই না। তবে তোমার সঙ্গে যতবার দেখা হয় আমার, জরুরী কোন না কোন কাজ থাকে। ইচ্ছে করে কাজ বের করি ভেবো না।...রবিনকে খুঁজতে এসেছিলাম এখানে। ওর জন্যে ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার।'

'কাল রাতে দেখা হচ্ছে তো?' গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে মুসার চলে যাওয়ার কথায় হতাশ হয়েছে ডলি।

'হ্যাঁ। কাল না হলেও পরশু। তুমি কোনদিকে যাবে? চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'না, লাগবে না, থ্যাংক ইউ। এত তাড়াতাড়ি আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। এসেছি যখন, খানিকক্ষণ হাঁটব। নইলে ঘুম আসবে না।'

বাড়ি রওনা হলো মুসা। প্রায় দৌড়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকাল। দেখা গেল না ডলিকে। হারিয়ে গেছে কুয়াশায়।

মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দ হলো। ওপরে তাকিয়ে বাদুড়টাকে দেখতে পেল না মুসা। বেশ কিছুটা ওপরে কুয়াশার মধ্যে রয়েছে।

নিজের অজান্তেই গায়ে কাঁটা দিল ওর। গতি বাড়িয়ে দিল। তবে বাদুড়টা ভ্যাম্পায়ার হয়ে গিয়ে আক্রমণ করল না ওকে। নিরাপদেই বাড়ি ফিরে এল সে।

বাড়িতে ঢুকেই আগে টেলিফোনে রবিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। পারল না। ফেরেনি সে।

*

সৈকতে বসে আছে রবিন। কান পেতে শুনছে ঢেউয়ের গর্জন। গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে পানি জেটি থেকে, সৈকতের বালি থেকে। শব্দটা কেমন দূরাগত মনে হচ্ছে। যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে এসব।

পাশে বসে আছে মেয়েটা।

এটাও কি বাস্তব?

নাকি কল্পনা?

ফিসফিস করে ডাকল, 'কণিকা, তুমি সত্যি আছ?'

জবাব দিল কণিকা, 'আছি।'

ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে কুয়াশা। হালকা হয়ে আসছে নিচের দিকের কুণ্ডলীগুলো। ঢেউয়ের বুকে এখন চাঁদের আলোর প্রতিফলন। সব কিছু

ঝিলমিল করছে। সব কিছু কেমন কাঁপছে।

কণিকার দিকে ফিরে তাকাল রবিন। চাঁদের আলোয় আরও ফ্যাকাসে লাগছে মেয়েটার মুখ। চামড়ার রঙ এমন মোমের মত কেন? কালো চুল কুয়াশায় ভিজে গিয়ে ধূসর লাগছে। পাশে বসে থাকলেও এ মুহূর্তে মেয়েটাকে অবাস্তবই লাগছে ওর কাছে।

তার চোখের সামনে অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে হতে আরম্ভ করল কণিকা।

রাতের হালকা বাতাস বয়ে গেল। কুয়াশার শেষ পুঞ্জগুলোকেও উড়িয়ে নিয়ে গেল। কণিকাকে অবাস্তব লাগছে এখনও ওর কাছে। ফিসফিস করে ডাকল আবার, 'কণিকা!' জোরে ডাকতে যেন ভয় লাগছে।

'কি?' সাড়া দিল কণিকা।

'বুঝতে চাইছি সত্যি তুমি আছ নাকি?'

আবার রবিনের কাঁধে হাত রাখল কণিকা, 'আছি। তোমার খুব খারাপ লাগছে?'

'দুর্বল। পা-টা ভাঙার পর আর সুস্থ হতে পারলাম না। একটার পর একটা রোগ ধরতেই আছে।'

'সেই সঙ্গে ওষুধের প্রতিক্রিয়া,' কণিকা বলল। 'এত অ্যান্টিবায়োটিকে শরীর দুর্বল হতে বাধ্য। তার ওপর নিশ্চয় কোন ধরনের জটিল ভাইরাস ঢুকেছে রক্তে। তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত। দরকার হয় হাসপাতালে কাটাওগে কয়েক দিন।'

'কণিকা?'

'বলো?'

দ্বিধা করল রবিন। 'একটা কথা।...কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না।...মুসা যে বলে ভ্যাম্পায়ারে রক্ত খেলে এমন হয়, কথাটা কি বিশ্বাস করা উচিত?'

'না। আমি ভ্যাম্পায়ার বিশ্বাস করি না। তবে কিছু একটা এসে যে রক্ত খেয়ে যাচ্ছে, খুন করে মানুষগুলোকে ফেলে যাচ্ছে সৈকতে, এটা ঠিক।'

'তোমার কি মনে হয়? কারা করে? জানো কিছু?'

ঢেউয়ের দিকে তাকাল কণিকা। চিন্তা করল একমুহূর্ত। তারপর জবাব দিল, 'বোধহয় জানি!'

তেরো

মেইন স্ট্রীটে ঘোরাফেরা করছে মুসা। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত দোকানগুলোর দিকে নজর। বেরিয়ে আসা প্রতিটি মুখ দেখছে। রবিনকে খুঁজছে।

বোর্ডিং হাউসে ক্রমাগত ফোন করেছে। রবিনকে পায়নি। অ্যাটেনডেন্ট

জানিয়েছে, কোথায় গেছে বলে যায়নি। ধরেই নিয়েছে মুসা, কণিকার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে রবিন। কণিকার মায়াজালে জড়িয়েছে।

ভ্যাম্পায়ারের জাল। বড় ভয়ঙ্কর জাল। একবার জড়ালে ছিন্ন করা কঠিন।

সম্মোহন করে করে নিশ্চয় রবিনের মনটাকে ধোঁয়াটে করে দিয়েছে কণিকা। সেজন্যেই অন্য কারও কথা আর শুনতে চাইছে না সে। কোন কিছু ভাবতে চাইছে না। জিনারও এ অবস্থা করেছিল জন।

জিনাকে মুক্ত করেছে। রবিনকেও করতে হবে। ভ্যাম্পায়ারের হাতে ওকে কোনমতেই মরতে দিতে পারে না।

অ্যানটিক হাউসটা থেকে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে এল একটা পেশীবহুল ছেলে আর একটা সোনালি-চুল মেয়ে। মুখ দেখা যাচ্ছে না।

'টনি! কিমি!' ডাকতে ডাকতে ওদের দিকে এগিয়ে গেল মুসা।

ফিরে তাকাল ছেলেমেয়ে দুটো। অবাক চোখে তাকাল। টনি আর কিমি নয়। মুসার অপরিচিত।

'সরি,' তাড়াতাড়ি বলল মুসা। 'আমার বন্ধু মনে করেছিলাম। তোমরা দেখতে ওদেরই মত।'

হেসে হাত নেড়ে আবার হাঁটতে শুরু করল ছেলেমেয়ে দুটো।

গেল কোথায় সব? ভাবছে মুসা। চেনা কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না কেন?

শহরে রবিনকে না পেয়ে সৈকতে চলে এল। আজ কুয়াশা নেই। চাঁদের আলো আছে। কিন্তু লোকজন বড় কম। পর পর দুটো খুন হওয়ার পর থেকে রাতের বেলা সৈকতে আসা কমিয়ে দিয়েছে লোকে। কয়েক জোড়া দম্পতি আর হাতে গোণা কয়েকটা ছেলেমেয়েকে দেখা গেল। দু'একজন তার মুখচেনা আছে, বাকি সবাই অপরিচিত।

রবিনকে খুঁজছে আর কণিকাকে ধ্বংস করা যায় কিভাবে ভাবছে। সবচেয়ে সহজ হত যদি রোদে বের করে আনা যেত। কিন্তু আনাটাই হলো কঠিন। ও গিয়ে বললেই বেরিয়ে চলে আসবে না কণিকা। ধ্বংস করার দ্বিতীয় উপায়টা হলো বুকে কাঠের গজাল ঢোকানো। তার জন্যে ভ্যাম্পায়ারের আস্তানা খুঁজে বের করতে হবে।

কণিকার আস্তানা কোথায়? দ্বীপটাতে? জন আর লীলাকে ধ্বংস করার পরেও কি ওখানে থাকতে সাহস করবে ভ্যাম্পায়াররা?

দ্বীপটাতে গিয়ে খুঁজে দেখার কথা ভাবল। গেলে দিনের বেলা যেতে হবে। তখন কফিনের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে ভ্যাম্পায়ার।

রবিনের সাহায্য পেলে সবচেয়ে ভাল হত। রোদে বের করে আনতে পারত কণিকাকে। গজাল ঠুকে মারা অনেক বেশি কঠিন কাজ। নিজের আস্তানায় ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় ভ্যাম্পায়ারের। দিনের বেলায়ও জেগে উঠে আক্রমণ করার ক্ষমতা রাখে। যদি আস্তানায় কোন ফাঁকফোকর না থাকে, আলো আসার পথ না থাকে, অন্ধকার হয়।

সৈকতেও রবিনকে না পেয়ে সোজা ওর বোর্ডিং হাউসে রওনা হলো

সে। খুঁজে আজকে বের করবেই। যেখান থেকেই হোক।

বারান্দার পরে হলঘর। ডেস্কে বসে পত্রিকা পড়ছে অ্যাটেনডেন্ট। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ঘরেই আছে রবিন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা। যাক, পাওয়া গেল। দুশ্চিন্তাও হলো। নিশ্চয় খুব অসুস্থ। ওঠার শক্তি নেই। নইলে ঘরে থাকত না।

ওর ধারণাই ঠিক। বেশ কয়েকবার থাবা দেয়ার পর দরজা খুলে দিল রবিন। চোখের পাতা আধবোজা। সাংঘাতিক দুর্বল। মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়েছে। টলছে। দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে।

'এই অবস্থা হয়েছে তোমার!' প্রায় চিৎকার করে উঠল মুসা। 'আমাকে খবর দাওনি কেন?'

'ভাবলাম রেস্ট নিলে সেরে যাবে...'

ভেতরে ঢুকল মুসা।

একটা কাউচে পাশাপাশি বসল দুজনে।

'কাল রাতে কোথায় ছিলে? কোন পার্টিতে গিয়েছিলে নাকি?' জানতে চাইল মুসা।

'কাল রাতে?' কপাল কুঁচকে ভাবতে লাগল রবিন। মনে করার চেষ্টা করল। 'না, পার্টিতে যাইনি। কণিকার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সৈকতে গিয়ে বসে থেকেছি অনেকক্ষণ।...খুব কুয়াশা ছিল কাল, তাই না?'

জবাব দিল না মুসা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিনের মুখের দিকে। রক্তশূন্য মুখ। বিধ্বস্ত।

গলার দিকে তাকাল। দাঁতের দাগ দেখল না। তবে আছে, আজও ভাবল একই কথা। আরও নিচে। শার্টের কলারের নিচে লুকানো।

'কেন, কুয়াশা ছিল কিনা মনে করতে পারছ না?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'পারছি। তবে অস্পষ্ট। সবই যেন ঘোরের মধ্যে ঘটেছে। কিংবা স্বপ্নের মধ্যে।'

হবেই এ রকম—জানা আছে মুসার। ভ্যাম্পায়ারের মায়াজালে পড়লে এইই হয়। সব কিছু ভুলিয়ে দেয় ওরা। সম্মোহন করে। চোখে ঘোর লাগায়। তারপর ওই ঘোরের মধ্যে ধীরে সুস্থে ওদের কাজ সারে।

'কেন ওরকম লেগেছে জানো? ভ্যাম্পায়ার তোমাকে সম্মোহন করেছে বলে।'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল রবিন, 'আবার সেই ভ্যাম্পায়ার!'

'ভ্যাম্পায়ারেই যখন করছে এ সব, আবার সেই ভ্যাম্পায়ারই তো হবে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমাকে প্রমাণ। আমার কথা বিশ্বাস না করে আর পারবে না।'

শার্টের কলার চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওপরের বোতামটা ছিঁড়ে ফেলল মুসা। কলারটা নামিয়ে দিল নিচের দিকে।

'আরে, আরে, কি করছ!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'এই দেখো!' মুসাও চিৎকার করে উঠল। 'জানতাম, থাকবেই!'

রবিনের গলার নিচের দিকে দুটো ছোট ছোট ফুটোর দাগ। কালচে-বেগুনি হয়ে আছে।

'দেখো এখন! দাগগুলো দেখো ভাল করে!' টানতে টানতে রবিনকে আয়নার কাছে নিয়ে এল মুসা।

'কি হবে দেখলে?'

'দেখোই না।'

'কি দেখব? তুমি কি বলতে চাও বুঝতে পারছি না।'

'কামড়ের দাগ।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'তুমি বলতে চাইছ ভ্যাম্পায়ারের কামড়?'

'তো আর কিসের? এমন করে আর কে ফুটো করবে?'

'পোকার কামড়!' অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'মুসা, তোমার পাগলামি থামাও! ছুটিতে এসে অসুস্থ হওয়াটাই একটা জঘন্য ব্যাপার। তার ওপর তোমার পাগলামির অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না।'

'ভুলে যেয়ো না, ছুটিতে বেড়াতে আসোনি তুমি। জোর করে তোমাকে ধরে এনেছি আমি। ভ্যাম্পায়ার রহস্যের তদন্ত করতে। সেটা করছ না। উল্টো আমার কাজে বাধা দিচ্ছ। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। ভ্যাম্পায়ার তোমার মাথাটা গড়বড় করে দিয়েছে। তবে তোমাকে আমি মরতে দেব না রিকির মত। দেরি হওয়ার আগেই যা হোক একটা কিছু করব।'

'রিকি পানিতে ডুবে মরেছে। রাতের বেলা ভাটার সময় আমি পানিতেও নামব না, ঢেউয়ে ভাসিয়েও নিতে পারবে না। অতএব মরব না। ভয় নেই।'

'রিকিকে ঢেউয়ে ভাসিয়ে নেয়নি, রবিন, বিশ্বাস করো আমার কথা! রক্ত খেয়ে ওকে শুষে মেরে ফেলেছিল ভ্যাম্পায়ারে। লাশটা পানিতে ফেলে দিয়েছিল। কণিকা তোমাকে সম্মোহন করে তোমার মাথাটা ঘোলাটে করে দিয়েছে, তাই স্বাভাবিক চিন্তা করতে পারছ না। গলায় দাগ দেখেও তাই পোকার কামড় ভাবছ।'

মুসার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রবিন। 'কণিকাকে তুমি ভ্যাম্পায়ার ভাবছ! তুমি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছ, মুসা। নইলে ওর মত ভাল মেয়েকে…'

'রবিন,' থামিয়ে দিল ওকে মুসা। কথা আজ শোনাতেই হবে রবিনকে। জোর করে হলেও। 'আমার কথা শোনো। কণিকা যে ভ্যাম্পায়ার, কোন সন্দেহই নেই আমার তাতে। রক্ত শুষে খেয়ে যাওয়ার সময় তার দাঁত আর মুখ থেকে তোমার রক্তে বিষ ঢুকে যায়। সেই বিষ তোমাকে অসুস্থ করে রেখেছে। এত দুর্বল লাগে সেজন্যেই। জিনার ব্যাপারে ডাক্তার কি বলেছে, ভুলে গেছ? বলেছে, রক্তে বিষ ঢুকেছে। তোমাকে এ ভাবে চলতে দিলে শেষমেষ তোমার কি হবে জানো? মারা যাবে। আর ভ্যাম্পায়ারের হাতে মারা পড়লে তুমি নিজেও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাবে। জীবন্মৃত। মানুষের রক্ত

ছাড়া আর তখন চলবে না তোমার…'

'উফ্, কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম রে!' অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল রবিন। 'মুসা, তোমার দোহাই লাগে, তুমি যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

'রবিন!' মুসাও চিৎকার করে উঠল, 'কেন তোমরা শুরুতেই আমার কথা বিশ্বাস করো না! কি করলে বিশ্বাস করবে? কি করে বোঝাব তোমাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

'মুসা, তুমি যাও। ঘুম না এলে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুম দাওগে। আমি একটু ভাল হলেই তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব…'

রাগে, দুঃখে, হতাশায় কেঁদে ফেলার উপক্রম হলো মুসার। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'পারলাম না, রবিন! কিন্তু আমি চেষ্টা করেছিলাম…'

এক মুহূর্তও আর দাঁড়াল না সে। ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নিজেকে বোঝাল, হাল ছাড়বে না কোনমতেই। জিনার বেলায়ও ছাড়েনি। ওকে বাঁচিয়েছে। আগে জানা থাকলে রিকিকেও মরতে দিত না। রবিনকেও বাঁচাতে হবে। সেই সঙ্গে প্রমাণ করে ছাড়বে, সে পাগল নয়, তার সন্দেহই ঠিক।

সিঁড়ি বেয়ে নামতেই দেখল, হলে ঢুকছে কণিকা মুসাকে দেখে হেসে হাত তুলল, 'হাই, মুসা।'

কটমট করে তাকাল মুসা।

কণিকা হাসল।

'তুমি কোত্থেকে এলে?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা।

সৈকত থেকে। পার্টি হচ্ছে। দাওয়াত দিয়েছে আমাদেরকে। রবিনকে নিতে এলাম।'

'ও যাবে না। শরীর ভীষণ খারাপ।'

'তাহলে তুমিই চলো। যাবে?'

'যাব,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুসা। রবিন আজ গেলে আর বাঁচবে না। রিকির মতই কাল তার লাশ পাওয়া যাবে সাগরে। ওর বদলে সে নিজে গেলে রবিন বাঁচবে। আর কণিকাও তার কিছু করতে পারবে না।

'চলো,' মুসার হাত ধরে টান দিল কণিকা। 'সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে আমার।'

চোদ্দ

পরদিন সন্ধ্যা।

মুসাকে দেখেই সরে পড়তে চাইল রবিন।

কিন্তু মুসা নাছোড়বান্দা।

শেষে প্রায় হাতজোড় করার মত করে রবিন বলল, 'দোহাই তোমার, আমার সঙ্গে কথা বোলো না। আর যদি বলোই, তো শুধু নাটকের কথা বলো। তোমার ওই ভ্যাম্পায়ারের গল্প শুনতে শুনতে কান পচে গেছে আমার।'

থিয়েটারে নাটকের রিহারস্যাল দিতে এসেছে ওরা।

'রবিন...'

কিন্তু শুনল না রবিন। সরে গেল মঞ্চের দিকে।

তাকিয়ে রইল মুসা। ছাড়বে না সে। যতই রাগুক রবিন, তাকে বিশ্বাস করিয়েই ছাড়বে। রবিন বিপদটা বুঝতে পারছে না, কিন্তু সে তো পারছে।

সময়মত শুরু করা গেল না রিহারস্যাল। কয়েকজন ছেলেমেয়ে তখনও এসে পৌছায়নি। তাদের মধ্যে কিমি, ডলি আর কণিকাও রয়েছে। মঞ্চের সামনের দিকে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন মিসেস রথরক। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন।

রবিনের দিকে দৃষ্টি ফেরাল মুসা। আগের দিনের চেয়ে খারাপ অবস্থা ওর। চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে, পানিতে ভরা। মুখের চামড়া মোমের মত ফ্যাকাসে। যেন জীবনে কোনদিন রোদের মুখ দেখেনি।

ভ্যাম্পায়ারের মত।

জীবন্মৃতদের দলে যোগ দিতে আর কত সময় লাগবে রবিনের? কিংবা মারা যেতে?

*

রিহারস্যালের পর টনি আর কিমিকে আরও কিছুক্ষণ থাকতে বললেন মিসেস রথরক, ওদের দৃশ্যগুলো ভালমত বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে। দুজনেই কাঁচা।

থিয়েটারের দরজা দিয়ে কণিকার সঙ্গে রবিনকে বেরিয়ে যেতে দেখল মুসা। ওদের দিকে এগোতে যাচ্ছিল সে, সামনে এসে দাঁড়াল ডলি।

'বাইরে খুব সুন্দর রাত। হাঁটতে যাবে?'

'চলো,' রাজি হয়ে গেল মুসা। 'রবিনকে নিয়ে কোথায় গেল কণিকা দেখা দরকার।'

বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে। এদিক ওদিক তাকিয়ে রবিন আর কণিকাকে খুঁজতে লাগল মুসা। বাড়িটার মোড় ঘুরে অন্যপাশে চলে যেতে দেখল একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে। সরু রাস্তা ধরে শহরের দিকে চলেছে আরও অনেক ছেলেমেয়ে। কেউ কেউ যাচ্ছে সৈকতে।

রবিনের দেখা নেই।

কোথায় গেল ও? ভুলিয়েভালিয়ে ওকে থিয়েটারের পেছনের বনে নিয়ে গেল না তো কণিকা? এখন হয়তো রবিনের রক্ত খাচ্ছে!

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?' তাড়া দিল ডলি, 'চলো, শহরে চলে যাই।'

ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আশপাশের গলিগুলোর দিকে নজর রাখল

মুসা। রবিন আর কণিকাকে খুঁজছে ওর চোখ। হাত ধরাধরি করে হাঁটছে ছেলেমেয়েরা। হট ডগ খাচ্ছে। বীচ এমপোরিয়ামের উইন্ডোতে সাজানো জিনিসপত্র দেখছে।

'আমাদের ডায়লগগুলো আরেকবার প্র্যাকটিস করলে কেমন হয়?' ডলি বলল।

'কি আর প্র্যাকটিস করব? হাতে গোণা কয়েকটা বাক্য আমার, মুখস্থ হয়ে গেছে। ভুলব না।'

'কিন্তু আমার ডায়লগ অনেক। কিছুতেই মনে থাকে না। প্র্যাকটিস করতে পারলে ভাল হত। স্ক্রিপ্টটা আছে তোমার কাছে?'

'না। ওটা আমার লাগে না।'

'আমারটা ভুলে ফেলে এসেছি থিয়েটারে। এনে দিতে পারবে?'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি।'

'যাও। সৈকতে চলে এসো। কাঠের সিঁড়ির কাছে থাকব আমি।'

দৌড় দিল মুসা। ও ভেবেছিল, তখনও টনি আর কিমিকে রিহারস্যাল দিচ্ছেন মিসেস রথরক। কিন্তু এসে দেখল অন্ধকার।

নিশ্চয় তালা দিয়ে চলে গেছেন মিসেস রথরক, ভেবে দরজার নব ধরে মোচড় দিল সে।

সহজেই খুলে গেল দরজা। লবিতে ঢুকল মুসা। পেছনে বাতাস লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লাটা। চমকে উঠল সে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চলল।

বাতির সুইচটা কোন্‌খানে অনুমানের চেষ্টা করল সে। লবিতে কোথায় কি আছে জানে। টিকেট বুদ। একটা কোকের মেশিন। সীটের কাছে যাওয়ার দরজা। সবই দেখতে পাচ্ছে কল্পনায়। কিন্তু সুইচটা কোথায়?

খসখস শব্দ হলো। বাঁয়ে। তারপর খুট করে আবার শব্দ।

'কে?' ডেকে জিজ্ঞেস করল সে।

জবাব নেই।

বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটাতে শুরু করল যেন হৃৎপিণ্ডটা।

থিয়েটারের দরজা খোলা, অথচ সব আলো নেভানো। খটকা লাগল তার। ঘটনাটা কি?

বড়, ভারী একটা কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগল। ঠং-ঠং, ঝনঝন, নানা রকম শব্দ হলো।

কোকের মেশিনটা।

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে ছাড়ল মুসা। লাইট সুইচটা খুঁজতে শুরু করল।

শব্দ হলো আবার। পা টিপে টিপে হাঁটার মৃদু শব্দ। বিড়ালের পায়ের মত। চারপাশের দেয়ালে মোলায়েম প্রতিধ্বনি তুলল যেন।

'কে?' আবার জিজ্ঞেস করল সে। গলা কাঁপছে।

এত ভয় পাচ্ছ কেন? নিজেকে ধমক দিল সে। ওটা ইঁদুর। অন্য কিছু না।

দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে চলল সে। সুইচটা কোথায়? পাচ্ছে না কেন?

পেল অবশেষে। সুইচ বোর্ডের কিনারে হাত পড়ল। সুইচটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিপে দিল।

আলো জ্বলল মাথার ওপর।

চোখ মিটমিট করে সইয়ে নিতে লাগল এই হঠাৎ উজ্জ্বলতা। চারপাশে তাকাল। লবিতে দাঁড়িয়ে আছে। একা। ইঁদুর থেকে থাকলে আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে।

কিন্তু মনের খুঁতখুঁতি গেল না। সত্যি কি ইঁদুর? নাকি রেস্ট রুমে কেউ লুকিয়ে রয়েছে?

দরজা খুলে একটা ঘরে ঢুকল সে। এটা পুরুষদের রেস্ট রুম। খালি। মেয়েদেরটাতেও উঁকি দিল। এটাও খালি। কেউ নেই।

ধূর! অহেতুক দেখাদেখি করছে এভাবে। কোন প্রয়োজন ছিল না। তারচেয়ে যা নিতে এসেছে, সেটা নিয়ে কেটে পড়া উচিত। দেরি দেখলে ডলি আবার চিন্তা শুরু করবে।

ডাবল ডোরটা পার হয়ে অডিটরিয়ামে চলে এল সে। সামনে সারি সারি সীট তার দিকে মুখ করে রয়েছে। সব যেন তাকিয়ে রয়েছে শূন্য মঞ্চটার দিকে।

ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগোল সে। নির্জন অডিটরিয়ামে প্রতিধ্বনি তুলল তার পায়ের শব্দ। অনেক জোরাল হয়ে কানে বাজল।

ডলি বলেছে, উইঙসের ভেতরে একটা টুলের ওপর স্ক্রিপ্টটা ফেলে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠতে শুরু করল সে। মঞ্চের পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে কাপড়ের স্তূপ। ভাল করে দেখল মুসা। ধূসর রঙ চোখে পড়ল। পরিচিত রঙ।

ওগুলো দৃশ্যপট। নাটকের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। মাটির নিচের ঘরে ভ্যাম্পায়ারের আস্তানার ছবি। কফিনের মধ্যে শুয়ে থাকা ভ্যাম্পায়ার।

এগিয়ে গেল মুসা। এভাবে ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে। ছড়িয়ে নিয়ে ঠিকমত রোল করে কিংবা ভাঁজ করে রাখতে হবে। দেখেই যখন ফেলেছে, ঠিক করে রাখাটা তার কর্তব্য।

একটা কাপড়ের কোণা ধরে টান দিল সে।

দিয়েই থমকে গেল। চমকে উঠল ভীষণভাবে।।

কাপড়টাকে ওভাবে স্তূপ করে রাখার কারণ আছে।

কাপড়ের নিচে একটা লাশ।

একজন মহিলার!

পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল মুসার। নাড়িভুঁড়িগুলো যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

'খাইছে!' একটিমাত্র শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

মিসেস রথরক। চিত হয়ে পড়ে আছেন। দৃশ্যপটের রঙের মতই তাঁর

মুখটাও ফ্যাকাসে ধূসর।

কাঁপা পায়ে হাঁটু গেড়ে বসল মুসা। ভাল করে তাকাল গলার দিকে। দুটো দাঁতের দাগ স্পষ্ট।

খোদা, আবার খুন করল ভ্যাম্পায়ার! এই লাশটাও প্রথম চোখে পড়ল তার! কি ভাববে এখন পুলিশ?

চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল।

ভ্যাম্পায়ারটা কি এখনও ঘরেই আছে!

বুকের দুরুদুরু বেড়ে গেল তার। পাঁই করে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল একটা ছায়ামূর্তি। চিনে ফেলল।

কণিকা!

পনেরো

গাঢ় ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। মঞ্চের পেছনে। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। ঠোঁট ফাঁক।

কেন? দাঁতের জন্যে? এখনও গুটিয়ে নেয়নি শ্বদন্ত?

যেন মুসার মনের কথা পড়তে পেরেই তাড়াতাড়ি মুখের কাছে হাত নিয়ে গেল কণিকা। চিৎকার ঠেকাল, না শ্বদন্ত গোপন করল, বোঝা গেল না।

আবার অভিনয় করা হচ্ছে! রাগ লাগল মুসার। বলবে নাকি এসব ভণ্ডামি বন্ধ করতে? বলবে, আমি জানি, তুমি ভ্যাম্পায়ার!

নাহ্, আপাতত না বলাই ভাল।

সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয় ঝেড়ে ফেলে গটমট করে ওর দিকে এগিয়ে গেল মুসা। মঞ্চের পেছনে ছায়ায় এসে দাঁড়াল। খপ করে চেপে ধরল কণিকার একটা হাত। হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল ছায়া থেকে আলোতে।

এতক্ষণে যেন লাশটাকে চোখে পড়ল কণিকার। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরোল মুখ থেকে। চোখে ফুটল বিস্ময়। কুঁচকে গেল কপাল। নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল এক পা।

'এখানে কি তোমার?' গর্জন করে উঠল মুসা। 'আমি তো জানতাম তুমি রবিনের সঙ্গে রয়েছ।'

'ছিলাম,' নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেছে কণিকার। 'কিন্তু ও অতিরিক্ত দুর্বল। হাঁটা তো দূরের কথা, দাঁড়াতেই পারছিল না। বাড়ি চলে যেতে বললাম। একটা জরুরী কথা মিসেস রথরককে জিজ্ঞেস করতে থিয়েটারে ফিরে এসেছিলাম আমি। কিন্তু···'

থেমে গেল সে।

আর ন্যাকামি করতে হবে না! মনে মনে বলল মুসা। তুমিই খুন করেছ মহিলাকে। কোন সন্দেহ নেই আর আমার। জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ আগে

এসেছ?'

'এই তো, মিনিটখানেকও হয়নি। মিসেস রথরকের লাশটা দেখে কি করব ভাবছি, এই সময় একটা শব্দ কানে এল। ভাবলাম খুনী ফিরে এল বুঝি। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লাম। কারণ আমাদের এই খুনীটা ডেঞ্জারাস। বাগে পেলে আমাকেও ছাড়ত না। তাই সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে দেখি তুমি।'

'আমি পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছি,' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কণিকা।

লবিতে দৌড়ে গেল মুসা। ফোন আছে ওখানে। থানায় ফোন করল। ডিউটি অফিসার বলল, কয়েক মিনিটের মধ্যে লোক পাঠাবে।

পুলিশ এবার আমাকে দেখলে খুশিতে মাথায় তুলে নাচবে! তেতো হয়ে গেল মুসার মন। আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখল রিসিভার। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, পেছনে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে কণিকা।

বুকের মধ্যে আবার ধড়াস করে উঠল মুসার। মনে পড়ল কণিকা ভ্যাম্পায়ার। একটা ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে একা এক ঘরে রয়েছে সে। তিন তিনটে খুন যে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে।

পিছিয়ে যেতে শুরু করল মুসা।

দেয়ালে গিয়ে পিঠ ঠেকল। কণিকার চোখে চোখ।

এক পা আগে বাড়ল কণিকা।

আরেক পা।

আর দাঁড়াল না মুসা। ঘুরে দৌড় মারল।

'মুসা, শোনো,' চিৎকার করে ডাকল কণিকা। 'দাঁড়াও। পালাচ্ছ কেন?'

কিন্তু ফিরেও তাকাল না মুসা। এক ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। বাইরে গিয়ে পুলিশের অপেক্ষা করা বরং ভাল, নিরস্ত্র হয়ে একঘরে একটা ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে থাকার চেয়ে।

ষোলো

'সৈকতে লোক চলাচল নিষিদ্ধ করে দেয়ার কথা ভাবছে পুলিশ,' মুসা বলল। রবিন আর টনির সঙ্গে বসে বসে পাথর ছুঁড়ছে পানিতে।

মিসেস রথরক খুন হওয়ার পর তিন দিন পেরিয়ে গেছে। খুনীকে ধরতে পারেনি পুলিশ। কোন মোটিভ বের করতে পারেনি। তিন খুনের কোনটারই কোন কিনারা করতে পারেনি ওরা, সূত্র পায়নি।

কিন্তু মুসার ধারণা, পুলিশ আসল ব্যাপারটা জানে। ভ্যাম্পায়ারের কথা না জানলে সৈকত বন্ধ করে দেয়ার কথা মাথায় আসত না ওদের। কিন্তু পুলিশ ভূত বিশ্বাস করলে লোকে হাসবে, এই ভয়ে ঘোষণা দিতে পারছে না।

রবিনকে কথা দিয়েছে মুসা, ওর সঙ্গে ভ্যাম্পায়ারের আলোচনা আর করবে না। টনি অবশ্য খোলাখুলি কিছু বলছে না, তবে মুসা বুঝতে পারছে, সে-ও এ নিয়ে আলোচনা করতে চায় না।

একটা সান্ত্বনার কথা—রবিনের দুর্বলতা যা ছিল, তার চেয়ে আর বাড়েনি। তবে মুখের দিকে তাকানো যায় না এখনও। কণিকা নিশ্চয় ওকে রেহাই দিয়েছে। রক্ত খাওয়া বন্ধ করেছে।

তবে, মুসা জানে, আপাতত বন্ধ করেছে। সুযোগ পেলেই আবার খাবে, কোন সন্দেহ নেই। মায়া করে ভ্যাম্পায়ার তার শিকার ছেড়ে দিয়েছে, এ কি কোনদিন হয়!

মেজাজ খারাপ করে একটা গোল পাথর তুলে নিয়ে পানিতে ছুঁড়ে মারল মুসা। একটা ঢেউ তখন তীরে আছড়ে পড়ে ভাঙছে। তার মাথায় পড়ল পাথর। পানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ব্যাঙের মত কয়েকটা লাফ দিয়ে কিছুদূর গিয়ে তারপর ডুবল।

মুসার মত মারার চেষ্টা করল টনি। হলো না। ডুবে গেল। বলল, 'কি করে মারো তুমি? তোমারটা লাফায় আর আমারটা ডুবে যায়?'

'মারার কায়দা আছে,' জবাব দিল মুসা।

রবিন হাসল। মুসার মনে হলো, জোর করা হাসি। আজকাল আর হাসি আসে না ওদের। তিন তিনটে মানুষ খুন হওয়ার পর—বিশেষ করে পরিচিত আর বন্ধুজন, হাসি থাকার কথা নয়।

'সৈকতে চলাফেরা সত্যি বন্ধ করে দেবে?' বলল রবিন।

'তাহলে আর এখানে থেকে লাভটা কি হবে আমাদের,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল টনি। 'বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল।'

'পুলিশও সেটাই চায়,' মুসা বলল।

'কিন্তু আমার মোটেও যেতে ইচ্ছে করছে না। আবার সেই একঘেয়ে পরিবেশ, কাজ নেই কর্ম নেই, সময় কাটতে চাইবে না···নাহ্, সৈকত বন্ধ করে দিলেও আমি যাচ্ছি না। সিসিকে নিয়ে আব্বা-আম্মা চলে গেলেও আমি থেকে যাব।'

'থেকে কি করবে? সৈকতটাই এখানে আসল। আর তো তেমন কোন জায়গা নেই। এখানে যা কিছু আনন্দের, সব এই সৈকতকে ঘিরে।'

ঘড়ি দেখল টনি। 'কিমি অপেক্ষা করবে বীচ এমপোরিয়ামে। আমি যাই। পরে কথা বলব তোমাদের সঙ্গে।'

সৈকত ধরে হেঁটে যাওয়া টনিকে যতক্ষণ চোখে পড়ল, তাকিয়ে রইল মুসা। তারপর ফিরল রবিনের দিকে। 'কণিকা কি তোমাকে বলেছে, মিসেস রথরকের গলায় দাঁতের দাগ ছিল?'

জবাব না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রবিন। হাঁটতে শুরু করল।

ছাড়ল না মুসা। পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমি দেখেছি। কণিকা এ ব্যাপারে কিছু বলেনি?'

'না। থাক না ওসব কথা।'

রবিনের হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে নিজের দিকে ফেরাল মুসা, 'শোনো, কণিকা যে ভ্যাম্পায়ার, এটা আমাকে প্রমাণ করতে দাও। নইলে তোমাকেও ভ্যাম্পায়ার বানিয়ে ছাড়বে খুব শীঘ্রি। আমি প্রমাণ করতে পারব।'

'ওহ্, মুসা, প্লীজ!' গুঙিয়ে উঠল রবিন, 'আমাকে রেহাই দাও!'

রবিনের কথা কানেই তুলল না মুসা, 'তুমি দুর্বল কেন...'

'ফ্লু কিংবা অন্য কোন ভাইরাসে ধরেছে।'

'তাহলে তোমার গলায় দাগ এল কোথেকে? পোকার কামড় হলে চলে যেত। ভ্যাম্পায়ারের হলে যাবে না এত সহজে।'

আবার গুঙিয়ে উঠল রবিন।

'প্রমাণ করতে পারলে তো বিশ্বাস করবে আমাকে? তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে একটা সুযোগ দাও,' কোনমতেই হাল ছাড়ল না মুসা। 'যদি না পারি এ ব্যাপারে আর টুঁ শব্দ করব না কখনও, কথা দিলাম। কণিকাকে আর সন্দেহ করব না।'

'বেশ,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল রবিন, 'আমি রাজি! বুঝতে পারছি, আমি তোমাকে সুযোগ না দিলে আমাকে রেহাই দেবে না তুমি। তবে তোমার ধারণা যে ভুল হবে, এখনই আমি লিখে দিতে পারি।'

যাক, খানিকটা এগোনো তাহলে গেল! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

'রাজি তো হলাম, কি করতে চাও এখন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'প্রথমেই তোমাকে কথা দিতে হবে, প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কণিকার সঙ্গে একা কোথাও যাবে না।'

'এটা কোন কথা হলো?'

'হলো। তুমি যেহেতু প্রমাণ চাও, আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। নইলে প্রমাণ করব কি করে? রবিন, শোনো, কোন মানুষকে যদি তিনবার ভ্যাম্পায়ারে কামড়ায়, সেই মানুষটাও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়। জীবন্মৃত অবস্থার ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দেয়ার একটাই উপায় থাকে তখন, বুকে কাঠের গজাল মেরে...'

'হয়েছে, হয়েছে,' তাড়াতাড়ি দুই হাত তুলে মুসাকে থামাল রবিন। 'যাব না কোথাও কণিকার সঙ্গে।'

'একা দেখাও করবে না ওর সঙ্গে। আশেপাশে আর কেউ আছে কিনা শিওর হয়ে নেবে।'

'বুঝলাম! আর...'

'রবিন, আমি ইয়ার্কি মারছি না!'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ঠিক আছে, যা বলছ করব।'

'কথা দিচ্ছ?'

'দিচ্ছি। এখন বলো, তোমার উদ্দেশ্যটা কি? কি করতে চাও?'

'খুব সহজ। কি করলে ভ্যাম্পায়ার ধ্বংস হয়?'

'কণিকার বুকে কাঠের গজাল ঢোকাতে পারব না আমি!'

'ঢোকাতে বলাও হচ্ছে না। তারচেয়ে সহজেই সম্ভব। গজাল ছাড়া অন্য

কিসে ভ্যাম্পায়ার মরে, বলো তো?'
'জানি না।'
'রোদ। সূর্যের আলো।'
'তোমার মাথাটা পুরোই গেছে!'
রবিনের কথা হাত নেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিল মুসা। কি করে মারবে ভ্যাম্পায়ারকে বোঝাতে লাগল, এই সময় পেছনে শব্দ শুনে থেমে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখে কণিকা।
স্থির হয়ে গেল মুসা। কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও? কতখানি শুনেছে?

সতেরো

'কি ব্যাপার?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল কণিকা, 'কি আলোচনা করছিলে তোমরা? আমাকে দেখে থেমে গেলে কেন?'
কণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমানের চেষ্টা করল মুসা, ওদের পরিকল্পনার কথা কতখানি জেনেছে মেয়েটা।
রবিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল কণিকা। 'এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন তোমরা? হাঁটবে, না অন্য কিছু করবে?'
মুসার দিকে তাকাল রবিন। কণিকার দিকে ফিরে বলল, 'আমি যেতে পারব না। শরীর ভীষণ দুর্বল।'
'আমাকেও বাড়ি যেতে হবে,' তাড়াতাড়ি বলল মুসা।
'বেশ, যাও,' কণিকা বলল। 'কাল দেখা হবে।' মেইন স্ট্রীটের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। কয়েক পা গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ওহ্হো, ভুলে গিয়েছিলাম। কাল সন্ধ্যায় সৈকতে একটা বড় পার্টি হবে। সবাই আসবে। তোমাদেরও দাওয়াত দিতে বলে দিয়েছে।'
'তাই নাকি,' খুশি হয়ে রবিন বলল, 'খুব ভাল খবর শোনালে।'
'তাহলে কাল ওই সময় দেখা হবে,' কণিকা বলল।
'হ্যাঁ,' কোনমতে দায়সারা জবাব দিল মুসা। কণিকাকে দূরে চলে যাওয়ার সময় দিল। তারপর বলল, 'আমাদের কথা শুনে ফেলেনি তো?'
'ফেললে আর কি করব! তবে কোনভাবেই যেন ও অপমানিত না হয়, সে-খেয়াল রাখতে হবে আমাদের।'

*

'ছিলে কোথায় তুমি?' পরদিন রাতে সৈকতের পার্টিতে এলে মুসাকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'খাবার তো সব শেষ।'
'হোকগে শেষ। বারগার খেয়ে এসেছি।'
'হাই, মুসা,' হাত নাড়ল কণিকা। আরও অনেকগুলো ছেলেমেয়ের সঙ্গে রবিনের পাশে বসেছে সে।

মধ্যরাত পার হয়ে গেছে। সারা সৈকত জুড়েই চলছে বীচ পার্টি। কথা রেখেছে রবিন। কণিকার সঙ্গে একা হয়নি একটিবারের জন্যেও।

চোখ বুলিয়ে চারপাশটা দেখল মুসা। হুল্লোড় করছে ছেলেমেয়েরা। সোডার ক্যান ছুঁড়ে মারছে এর ওর গায়ে। খালি ক্যান দিয়ে একটা পিরামিড বানানো হয়েছে। উচ্চতা হবে ছয় ফুট। ক্রমেই আরও উঁচু হচ্ছে ওটা। ভলিবল খেলার চেষ্টা করছে কয়েকজন, অন্ধকারে জ্বলে এ রকম বল দিয়ে। বাতাসে কয়লার ধোঁয়া আর সাগর থেকে ধরা তাজা মাছের কাবাবের সুগন্ধ।

কণিকার দিকে তাকাল সে।

আজকের রাতটাই তোমার শেষ রাত কণিকা!

রবিনের রক্ত আর খেতে পারবে না তুমি! কারোর রক্তই পাবে না!

ওর প্ল্যানটা হলো, রবিনের সঙ্গে কণিকাকে কোন একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আটকে ফেলবে। বসিয়ে রাখবে সকাল পর্যন্ত। সূর্য ওঠার আগে কোনমতেই বেরোতে দেবে না।

সাগরের ওপরের আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শোনা গেল বজ্রের গুড়ুগুড়ু। চিমনি দিয়ে ভলকে ভলকে বেরোনো ধোঁয়ার মত কোথা থেকে কালো মেঘ এসে ছেয়ে ফেলল রাতের আকাশ।

বৃষ্টি! চমৎকার! খুশি হলো মুসা। বৃষ্টি এলে ওর প্ল্যানমত কাজ করতে সুবিধে হবে। ঘরে ঢুকতে বাধ্য হবে কণিকা। আর একবার ঢুকলে কোনমতেই ওকে সকালে সূর্য ওঠার আগে বেরোতে দেয়া হবে না।

ডলি এল এই সময়। টনি আর রবিনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের কথা শুনতে লাগল।

বৃষ্টি! আহ্! আসে না কেন এখনও?

মুসার পাশে বসে পড়ল ডলি। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'চলো, সৈকতের ওদিক থেকে হেঁটে আসি।'

'না। বসো। এখন আমার হাঁটতে ইচ্ছে করছে না,' মুসা বলল। 'আমি এখন সবার সঙ্গেই থাকতে চাই।'

রবিনের কাছ থেকে কিছুতেই দূরে সরা চলবে না এখন। সুযোগ দিলেই ভুলিয়েভালিয়ে তুলে নিয়ে যাবে ওকে কণিকা। আর গেলেই সর্বনাশ। ভ্যাম্পায়ারের সম্মোহন বেশিক্ষণ এড়াতে পারবে না রবিন।

মিনতি ভরা চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে আছে ডলি। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল।

হাঁটতে যেতে রাজি না হওয়ায় ও এত দুঃখ পেল কেন বুঝতে পারল না মুসা। সবার সামনে অপমান বোধ করল নাকি?

দূরে আবার গুড়ুগুড়ু শব্দ। আবার বজ্রপাত।

নীচে নেমে আসছে কালো মেঘ।

এসো বৃষ্টি। আরও তাড়াতাড়ি। প্লীজ!

কিন্তু মুসার অনুরোধে কান দিল না বৃষ্টি। দূরেই রইল বিদ্যুৎ চমকানো, দূরেই রইল বজ্রের গর্জন।

ভোররাত তিনটের দিকে পার্টিটা হয়ে গেল একেবারে প্রাগৈতিহাসিক। বুনো উন্মাদনায় মেতে উঠল সবাই। হই-হুল্লোড়, নাচাকোঁদা, যার যা ইচ্ছে চালিয়ে যাচ্ছে।

'মনে হচ্ছে খুনের কথাটা ভুলতে চাইছে সবাই,' ডলি বলল।

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'মুসা, এবার তো হাঁটতে যেতে পারি আমরা? সারারাত এক জায়গায় বসে থাকার ইচ্ছেটা আজ তোমার কেন হলো, বুঝতে পারছি না।'

কি জবাব দেবে ভাবছে মুসা, এই সময় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল আকাশ। গুড়ুগুড়ু করে উঠল মাথার ওপর। চমকে ওপর দিকে তাকাতেই আকাশের এমাথা ওমাথা চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুতের শিখা। পরক্ষণে বজ্রপাতের বিকট শব্দ।

মুহূর্ত পরেই অঝোরে নামল বৃষ্টি।

লাফ দিয়ে উঠে হাসাহাসি, চেঁচামেচি করতে করতে দৌড় দিল ছেলেমেয়ের দল। আর বাইরে থাকা যাবে না। এখন ঘর দরকার।

'মুসা!' চিৎকার করে উঠল ডলি, 'এদিকে!' একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে মেইন স্ট্রীটের দিকে ছুটল সে।

চমৎকার!

রবিনের দিকে ফিরে বলল মুসা, 'শুরু করো।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল রবিন। গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। কণিকার দিকে ফিরে বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল, 'এসো, কণিকা! থিয়েটারটা সবচেয়ে কাছে। ওখানেই যাব।'

থিয়েটারের দিকে দৌড় দিল দুজনে। পেছনে ছুটল মুসা। পাথরের কুচির মত গায়ে এসে আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। বাতাসে ঝাপটা দিয়ে এনে এত জোরে চোখে ফেলছে, চোখ মেলে রাখা কঠিন। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল। গুড। কেউ নেই।

রবিনের পাশ কাটিয়ে গিয়ে একটানে থিয়েটারের দরজাটা খুলে ফেলল সে।

হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল রবিন আর কণিকা। মাথার ওপরে বিদ্যুৎ চমকাল। থরথর করে বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিল বজ্রপাতের শব্দ।

লবিতে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল ওরা।

'বাপরে বাপ! হঠাৎ করে কি নামাটাই নামল!' কণিকা বলল। 'ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছি।'

'হঠাৎ করে আর কোথায়। অনেকক্ষণ থেকেই তো গর্জাচ্ছে।' মেঝেতে পা ঠুকে জুতোয় ঢুকে যাওয়া পানি বের করতে লাগল রবিন।

দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে ওর। দেখতে পাচ্ছে মুসা। দুর্বল শরীরে এ ভাবে দৌড়ানোটা কঠিন হয়ে গেছে ওর জন্যে।

'চলো, বেসমেন্টে ঢুকে বসে থাকি,' মুসা বলল। 'ওখানটায় গরম পাব। এখানে ঠাণ্ডা।'

বেসমেন্টে নামার দরজায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। থিয়েটারের লোক ছাড়া অন্য কারও ঢোকা নিষেধ। কিন্তু তালা নেই। সুইচ টিপে আলো জেলে দিল মুসা। এত রাতে আর কে দেখতে আসবে। নিষেধ অমান্য করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল সে। রইল সবার পেছনে। দরজাটা লাগিয়ে দিল।

বেসমেন্ট থেকে বেরোনোর দুটো দরজা। একটা দিয়ে ঢুকেছে ওরা। অন্যটা দিয়ে বেসমেন্ট থেকে সরাসরি বাইরে যাওয়া যায়।

কোন জানালা নেই।

একেবারে নিখুঁত। এ রকম ঘরই দরকার ছিল।

বহু বছর ধরে নাটক হচ্ছে এই থিয়েটারে। নানা রকম জিনিসে বোঝাই করে রাখা হয়েছে ঘরটা। প্লাস্টিকে মোড়ানো পোশাক ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে একদিকের দেয়ালে। তার ওপরের তাকগুলোতে নানা ধরনের হ্যাট। পুরুষের। মহিলাদের।

একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে পড়ল মুসা। দুটো টুল খুঁজে নিয়ে তাতে বসল রবিন আর কণিকা।

সকালের অপেক্ষায় থাকতে হবে এখন। আর কিছু করার নেই। রবিন আর মুসা দুজনে একই কথা ভাবছে। কণিকাকে আটকে রাখতে হবে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

ভিজেছে তিনজনেই। ভেজা চুল নিয়ে অনুযোগ করতে থাকল কণিকা। মুসা লক্ষ করল, ওর হাতে ঘড়ি নেই। তাতে আরও ভাল হয়েছে। সকাল হলো কিনা, বুঝতে পারবে না কণিকা।

রবিনের চোখে শীতল দৃষ্টি। একে শরীর খারাপ। তার ওপর মুসার এসব পাগলামি তার পছন্দ হচ্ছে না।

সবই বুঝছে মুসা। বলল না কিছু। সকাল হোক। রোদের আলো এসে পড়ুক কণিকার গায়ে। ওই দৃষ্টি আর থাকবে না রবিনের।

কথা বলতে লাগল সে। কিন্তু রবিন তাতে যোগ দিতে পারল না বিশেষ। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। শুয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু শোয়ার জায়গা নেই বলে বসেই থাকতে হলো।

'ক'টা বাজে?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল কণিকা।

'সোয়া তিনটে,' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কথা বলল মুসা। বাজে আসলে অনেক বেশি। ভোরের আলো ফোটার সময় হয়ে গেছে প্রায়। আর পনেরো মিনিট পরেই কণিকা আর ভ্যাম্পায়ার থাকবে না। জীবন্মৃতের অভিশাপ মুক্ত হয়ে চিরকালের জন্যে চলে যাবে পরপারে। দুঃখ হচ্ছে না মুসার। বাঁচিয়েই দিচ্ছে বরং কণিকাকে। জীবন্মৃত থাকার যন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক।

'আমি আর বসে থাকতে পারছি না,' রবিন বলল। 'এখুনি গিয়ে বিছানায় পড়তে না পারলে মারা পড়ব।'

'কিন্তু এই ঝড়ের মধ্যে যাবে কি করে?' মুসা বলল।

'এখানে থেকে তো বৃষ্টির শব্দও শুনতে পারছি না,' কণিকা বলল 'কমল

কিনা বুঝব কিভাবে? জানালা নেই কিছু নেই। চলো, ওপরে চলে যাই।'

'যে নামা নেমেছে, এত তাড়াতাড়ি থামবে না বৃষ্টি।'

'আমি ওপরে গিয়ে দেখে আসি।'

'তুমি বসো। রবিন যাক। নড়াচড়া না করলে বরং কিছুটা স্বাভাবিক হবে ও। এভাবে বসে থাকলে ঘুমিয়ে লুটিয়ে পড়বে এখানেই।'

হাসল কণিকা। 'তা অবশ্য ঠিক। রবিন, যাও। কোক মেশিন তো আছে ওপরে। একটা কোকটোক আনতে পারো নাকি দেখো।'

দ্বিধা করতে লাগল রবিন। ওর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। মনে মনে তাগাদা দিচ্ছে—যাও না! দেরি করছ কেন? তীরে এসে তরী ডুবিয়ো না!

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল রবিন। বুড়ো মানুষের মত পা টানতে টানতে এগিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। আধমরা লাগছে ওকে।

পাঁচ মিনিট পর তিন ক্যান কোক নিয়ে ফিরে এল সে। বৃষ্টির কথা বলল, 'আরও বেড়েছে। কমার কোন লক্ষণই নেই।' একটা ক্যান কণিকাকে দিয়ে আরেকটা মুসাকে দিল। দেয়ার সময় চোখে চোখে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

ইঙ্গিতটা বুঝল মুসা। এর মানে বৃষ্টি আসলে থেমেছে। সূর্য ওঠার সময় হয়েছে।

কণিকার এখন অগ্নিপরীক্ষার সময়। মুসা জানে, এই পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না কণিকা।

তাকে আরও পাঁচ মিনিট সময় দিল মুসা। তারপর খপ করে হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। কোক খাওয়া শেষ হয়নি কণিকার। ক্যান থেকে শার্টে পড়ল অনেকখানি।

'আরে! কি করছ?' তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল কণিকা। 'ছাড়ো, ছাড়ো!' হাত থেকে ছেড়ে দিল ক্যানটা। মুসার জুতোতে ছলকে পড়ল কোক।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে রবিন। তাকিয়ে আছে কণিকার দিকে।

'রবিন!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'তাকিয়ে আছ কেন হাঁ করে? দরজা খোলো!'

'মুসা!' কণিকাও চিৎকার করে উঠল, 'ছাড়ো আমাকে!'

বাইরে বেরোনোর দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল রবিন। নবে হাত রেখে ফিরে তাকাল কণিকার দিকে।

'রবিন!' ককিয়ে উঠল কণিকা। 'আমাকে বাঁচাও!'

টানতে টানতে ওকে দরজার দিকে নিয়ে চলল মুসা। রবিনকে বলল, 'খোলো! খোলো!'

ছাড়া পাওয়ার জন্যে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে দিল কণিকা। লাথি মেরে, আঁচড়ে, খামচে অস্থির করে তুলল মুসাকে। হাত ঝাড়া দিল। শরীর মোচড়াতে লাগল। 'কি করছ তুমি? ছাড়ো আমাকে!'

আর দ্বিধা করল না রবিন। একটানে খুলে ফেলল দরজার পাল্লা। ওপরে উঠে গেছে কংক্রীটের সিঁড়ি। রোদ উঠেছে। সিঁড়ির মাথায় এসে পড়েছে

উজ্জ্বল রোদ।

কেঁদে উঠল কণিকা, 'তুমি না বললে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। কই? মিথ্যে কথা বললে কেন? কি করতে চাও তোমরা?'

মুসার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল সে। কিন্তু পারল না। কব্জিতে আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল মুসার আঙুল।

ধাক্কা দিয়ে ওকে দরজার বাইরে বের করে দিল মুসা। ওপরে এনে ঠেলে দিল রোদের মধ্যে।

চিৎকার করে উঠল কণিকা।

আঠারো

চোখ মুদে ফেলল মুসা। হঠাৎ করে রোদ পড়াতে মেলে রাখতে পারল না। মাথা সামান্য সরিয়ে নিয়ে আবার মেলল চোখ।

'খাইছে!' নিজের অজান্তেই মুসার মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দটা। ভাবতেই পারেনি এমন কিছু ঘটবে।

দিব্যি রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কণিকা। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে মুসার দিকে। কিছুই হয়নি ওর।

'খাইছে!' আবার বলল মুসা। ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল। কণিকার গায়ে আগুন ধরছে না। বোমার মত ফেটে যাচ্ছে না।

সকালের রোদে চকচক করছে কণিকার কালো চুল। চোখের ওপর হাত এনে রোদ আড়াল করে জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে? তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছ?'

মুসা ভেবেছিল রবিন রেগে উঠবে। কিন্তু উঠল না। বরং সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। বলল, 'আমার শরীরটা ভাল থাকলে আজই তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতাম।'

কথা বলার জন্যে মুখ খুলেও বন্ধ করে ফেলল মুসা। কথা খুঁজে পেল না।

আনমনে নিচের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে দুজনের পাশ কাটিয়ে আবার বেসমেন্টে ফিরে চলল কণিকা। সিঁড়ির গোড়ায় নেমে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আমি যে ভ্যাম্পায়ার নই, আর কোন সন্দেহ আছে?'

রবিন বলল, 'মুসা, তুমি বরং রকি বীচে ফিরে যাও...'

'না, যেতে হবে না,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা টুলে বসে পড়ল কণিকা। 'বসো। কথা আছে।'

মুসা আর রবিন যার যার আগের জায়গায় বসল।

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' গলায় জোর নেই মুসার। ধাক্কাটা হজম করতে পারেনি এখনও। 'ভুলটা কোথায় করলাম?'

'ভুলটা তোমার মগজে,' রবিন বলল। 'গাধার মত তোমার কথা শুনতে

গেছিলাম! কিছু মনে কোরো না, কণিকা। আমি দুঃখিত। ও আমাকে এমন করে বোঝাতে লাগল…তুমি ভ্যাম্পায়ার তুমি ভ্যাম্পায়ার বলতে লাগল…'

'ভুল করেনি ও,' রবিনকে অবাক করে দিয়ে বলল কণিকা। 'ভ্যাম্পায়ার এখানে সত্যি আছে। সেজন্যেই এখানে এসেছি আমি। ওগুলোর অত্যাচার বন্ধ করতে।'

'কণিকা…' তাকিয়ে আছে মুসা। 'তুমি…'

মুচকি হাসল কণিকা। হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল কালো চুল। টান দিয়ে খুলে আনল। বেরিয়ে পড়ল কোঁকড়া কালো চুল। এক এক করে প্লাস্টিকের নকল নাক, নকল দাঁত, গালে লাগানো রবারের আলগা চামড়া, গালের ভেতর দিকে লাগানো প্যাড খুলে নিয়ে রাখল পাশের একটা বাক্সের ওপর। হাসিমুখে তাকাল দুই সহকারীর দিকে।

'কিশোর!' একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল মুসা আর রবিন।

'আস্তে!' চট করে দরজার দিকে চোখ চলে গেল কিশোরের। মেয়েলী কণ্ঠস্বর আর নেই। তার স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'কেউ শুনে ফেলবে!' মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা শেষ দিকের অভিনয়টুকু কেমন লাগল?'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। কথা নেই মুখে।

অভিনয় কিশোরের জন্মগত ক্ষমতা। ছদ্মবেশ নেয়ার ক্ষমতাও অসাধারণ। গ্রীনহিলসে থাকতে বহুবার এর প্রমাণ পেয়েছে ওরা। পুলিশম্যান ফগর‍্যাম্পারকটকে কত যে নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। ওকে এ রকম ছদ্মবেশ নিতে দেখে যত না অবাক হলো, তার চেয়ে বেশি হলো এই বেশে ওকে স্যান্ডি হোলোতে দেখে।

'তোমার না রাশেদ চাচার সঙ্গে কোথায় যাওয়ার কথা?' অবশেষে কথা খুঁজে পেল মুসা।

'ছিল, কিন্তু যাইনি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন?'

'রিকির মৃত্যুটা ভাবিয়ে তুলেছিল আমাকে। তার ওপর দেখলাম জিনার অবস্থা। তোমার মুখে সব শুনেও ভ্যাম্পায়ারের কথা বিশ্বাস করিনি। তবে বুঝতে পারছিলাম রহস্যময় কিছু ঘটছে এখানে। একটা কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পুরানো পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলাম। শিওর হয়ে গেলাম, আমার ধারণাই ঠিক হবে।… তোমাদের না জানিয়ে ছদ্মবেশে আসার কারণ, ভ্যাম্পায়ারের নজরে পড়তে চাইনি। বরং আমি ওদের খুঁজে বের করে ওদের দলে মিশে যেতে চেয়েছিলাম…'

'কিন্তু আমাদের জানিয়ে এলে কি অসুবিধে হত?' মুসা বলল, 'আমরা না চেনার ভান করতাম।'

'পারতে না। স্বাভাবিক আচরণ করতে পারতে না কোনমতেই। এতটা বড় অভিনেতা তোমরা নও। আমি চাচ্ছিলাম, তুমি অন্তত আমাকে সন্দেহ করো। ভ্যাম্পায়ার ভাব। তাহলে ভ্যাম্পায়াররা আর আমাকে সন্দেহ করবে

না। কারণ জন আর লীলার মৃত্যুর ব্যাপারে তোমাকে সন্দেহ করবে ওরা, বুঝতে পেরেছিলাম। কার কার সঙ্গে তোমার খাতির, জেনে যেত সহজেই। ওদের সন্দেহের আড়ালে থেকে কাজ করতে চেয়েছিলাম আমি।'

'সফল হয়েছ?'

'তা বলতে পারো।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ ভ্যাম্পায়ার সত্যি সত্যি আছে এখানে!' রবিনের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'কেন,' মুচকি হাসল কিশোর, 'আমাকেও মুসার মত পাগল মনে হচ্ছে নাকি?' তারপর সিরিয়াস হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, ভ্যাম্পায়ার সত্যি সত্যি আছে এখানে। ওগুলোর শয়তানী বন্ধ করতে না পারলে আরও কত মানুষকে যে খুন করবে ওরা, তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। রক্তের নেশায়, বিশেষ করে ক্ষমতার নেশায় ওরা উন্মাদ। ওরা আমাকে ওদের দলের মনে করেছে। দু'বার সন্দেহ করে ধরে ফেলেছিল প্রায়, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। ইমি আর অ্যানিকে ওরাই খুন করেছে। মিসেস রথরককেও। প্রথম দুজন খুন হওয়ার আগে কিছু জানতে পারিনি। কিন্তু মিসেস রথরকের ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেছিলাম। যখন গেলাম, দেরি হয়ে গেছে। বাঁচাতে আর পারলাম না। অল্পের জন্যে।'

'কারা করেছে এ কাজ?' রাগে কাঁপছে মুসা। রিকির লাশটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ওর নিরীহ, লাজুক হাসিটা স্পষ্ট দেখতে পেল।

'কিমি আর ডলি।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। বুকের মধ্যে দাপাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা। 'ডলি!'

'বসো। মাথা ঠাণ্ডা করো। কিমি আর ডলি দুজনেই ভ্যাম্পায়ার। আমাকে সন্দেহ করলে, আর ডলিকে চিনতে পারলে না?'

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করল মুসা, 'ডলি! কিমি!'

'রক্তের নেশায়, খিদেয় পাগল হয়ে গিয়েছিল দুজনে। ইমি আর অ্যানিকে সৈকতে একা পেয়ে রক্ত শুষে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলেছিল। হুঁশ ছিল না যে মরে যাবে। কিংবা খিদের ঠেলায় কেয়ারই করেনি। একই কাণ্ড করেছে মিসেস রথরকের বেলায়ও।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'কিশোর, সব কথা যদি খুলে না বলো, তুমিও পাগল হয়ে গেছ ভাবতে বাধ্য হব। ভাবব, স্যান্ডি হোলোতে এসে মুসা আর জিনাকে যে রোগে ধরেছে, তোমাকেও সেই রোগে ধরেছে। সত্যি কি তুমি ভূত বিশ্বাস করছ?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। তবে ভ্যাম্পায়ার বিশ্বাস করছি। কারণ, আছে ওরা। নিজের চোখে দেখেছি। তবে এ ভ্যাম্পায়ার ভূত নয়, ভূতেরও বাড়া, মানুষরূপী পিশাচ। সেই প্রাচীনকাল থেকেই ব্ল্যাক ম্যাজিক, জাদুটোনায় বিশ্বাস করে আসছে মানুষ। ভেবেছে, শয়তানের উপাসনা করে তাকে ভজাতে পারলে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। ভ্যাম্পায়ার

হওয়ার চিন্তাও সেই বিশ্বাসেরই কুফল।

'ব্রাম স্টোকার ড্রাকুলা লেখার বহু আগে থেকেই ভ্যাম্পায়ারের কথা জানত মানুষ। বিশেষ করে জার্মানী আর তার আশপাশের কয়েকটা দেশের লোকে। তারা নানা রকম পূজা-অর্চনার মাধ্যমে ভ্যাম্পায়ার হতে চাইত। ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যে। তাদের আরও একটা বিশ্বাস ছিল, এই ক্ষমতা লাভ করতে পারলে অনন্তকাল বেঁচে থাকা যাবে। তবে এর জন্যে কিছুদিন বেশ কষ্ট করতে হবে। কিছু ক্রিয়াকর্ম পালন করতে হবে, বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। আসল ভ্যাম্পায়ার যা করে থাকে বলে ওদের বিশ্বাস, সেসব ওদের মত করেই পালন করতে হবে। কোন রকম উল্টোপাল্টা করলে চলবে না। এই যেমন দিনের বেলা কফিনে শুয়ে থাকা, সন্ধ্যার পর বেরিয়ে রক্ত খাওয়া—সাধনা চলাকালে অন্য কোন রকম খাবার খাওয়া চলবে না, তাহলে সব মাটি। মোট কথা ভ্যাম্পায়ার যা যা করে, ঠিক তাই তাই করতে হবে। আসল ভ্যাম্পায়ার যেহেতু ভূত, তার অনেক ক্ষমতা, কিন্তু বাস্তব মানুষের তো আর সে-ক্ষমতা নেই। মানুষের রক্ত খাওয়ার জন্যে তাই নানা কৌশল আর ওষুধের আশ্রয় নিতে হয়। শিকারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকে সম্মোহন করে ভোলাতে হয়, সুযোগমত ওষুধ শুঁকিয়ে তাকে বেহুঁশ করতে হয়, তারপর দাঁতে লাগানো কৃত্রিম ধাঁতব দাঁত দিয়ে গলার শিরা ফুটো করে রক্তপান করতে হয়। অকাল্টের বই পড়ে জেনেছি এ সব।

'যাই হোক, পুরানো আমলেও গুরু থাকত এদের, এখনও আছে। এখানে যে দলটা আছে, তাদের গুরুর নামটা নিশ্চয় শুনেছ তোমরা, বেশ গালভরা—কাউন্ট ড্রাকুলা…'

'কোথায় আছে ব্যাটা!' দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। 'নাম বলো। ধরে এয়সা ধোলাই দেব…'

'বলছি,' হাত তুলল কিশোর, 'তাকে কোনমতেই ছাড়া হবে না। তবে আগে জানতে হবে কোথায় আছে সে, কোন ঠিকানায়। চ্যালাগুলোকে পুলিশে ধরে ধোলাই দিলেই সুড়সুড় করে নাম বলে দেবে।'

'তাহলে চলো, এখনই ধরব। কিমি আর ডলি তো? দুই মিনিটও লাগবে না কাবু করে ফেলতে। থাকে কোন্খানে?'

'কেন, আন্দাজ করতে পারছ না? জন আর লীলা কোন্খানে ছিল?'

'ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ!'

'হ্যাঁ, এতে অবাক হওয়ার কি আছে? ঘাঁটি হিসেবে এত চমৎকার জায়গা আশেপাশে আর কোথায় আছে?'

'তা বটে। আমি মনে করেছি, জন আর লীলাকে যেহেতু ওখানেই খতম করা হয়েছে, জায়গা পাল্টাবে ওরা, ধরা পড়ার ভয়ে ওখানে থাকতে আর সাহস করবে না…কিন্তু বাড়িটা তো পুড়ে গেছে?'

'একটা পুড়েছে। আরও অনেক বাড়ি আছে ওখানে।'

'চলো তাহলে। এখনই যাব।'

'অত তাড়াহুড়া নেই। সারারাত জেগে ওরা দিনের বেলা বেহুঁশের মত

ঘুমাবে কফিনের মধ্যে। তৈরি হয়ে যেতে হবে আমাদের। সারারাত জেগেছি, আমাদেরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া দরকার। তারপর বেরোব।...বলা যায় না, কিমি আর ডলি বাদেও ওখানে আরও লোক থাকতে পারে। কাউন্ট ড্রাকুল নামে বদমাশটাও হয়তো ওই দ্বীপেই থাকে, ভিন্ন কোন বাড়িতে। লড়াই করে ওদের কাবু করতে হলে শক্তি দরকার।'

গলায় হাত বোলাতে বোলাতে রবিন বলল, 'আমার গলার দাগ দুটো তাহলে কিসের? নিশ্চয় পোকার কামড়ই হবে। আমি তো রাতে একা ওই দুই ভ্যাম্পায়ারের কারও ত্রিসীমানায়ও যাইনি।'

'তুমি না গেলে কি হবে?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'ওরা এসেছিল তোমার কাছে। ডলির কাজই হবে। ওটার খিদেই বেশি। তুমি এমনিতে অসুস্থ মানুষ। রাতের বেলা মরার মত ঘুমিয়েছ। চুরি করে বোর্ডিঙে তোমার ঘরে ঢুকে তখন রক্ত খেয়ে এসেছে। ঘুমের মধ্যেই ওষুধ শুঁকিয়ে নিশ্চয় বেহুঁশ করে নিয়েছিল তোমাকে। সেটা করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়।'

'শয়তানের দল!' শিউরে উঠল রবিন।

'তোমাকেও খতম করে দিত ওরা। বেঁচে গেছ মুসার জন্যে। ও তোমার ওপর এমনভাবে চোখ রাখা আরম্ভ করেছিল, বেশি সাহস করতে পারেনি ডলি। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে।'

কৃতজ্ঞ চোখে মুসার দিকে তাকাল রবিন। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। 'টনির কিছু কবল না কেন তাহলে কিমি?'

'ওই একই কারণ, ধরা পড়ার ভয়। পিছে পিছে থেকে সিসি বাঁচিয়ে দিয়েছে ভাইকে। তবে টনিকেও ছাড়ত না ওরা। সুযোগমত ঠিকই সাবাড় করত। ওকে খাঁচায় পোরা মুরগী ভেবেছিল আরকি। যখন ইচ্ছে খাওয়া যাবে।'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'চলো। অনেক বকবক করা হয়েছে। ঘুমানো দরকার।'

ঘুমের কথায় হঠাৎ আবার দুর্বল বোধ করতে লাগল রবিন। এতক্ষণ উত্তেজনায় খেয়াল ছিল না। মুসার দিকে তাকাল, 'একা যেতে সাহস পাচ্ছি না।'

হাসল মুসা, 'ভ্যাম্পায়ারের ভয়?'

'না, ভীষণ দুর্বল লাগছে। মাথা ঘুরে যদি পড়ে যাই।'

'চলো। আমি যাচ্ছি সঙ্গে।'

উনিশ

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। দড়ি খুলল মুসা। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল নৌকায়।

কিশোর আগেই উঠে বসে আছে।

-ক হাউসের ভেতরে মৃদু ঢেউয়ে দুলছে নৌকা।

হুডওয়ালা প্লাস্টিকের রেইন কোট পরে এসেছে দুজনেই। হুড তুলে দিয়ে শক্ত হয়ে বসল মুসা।

মাত্র দুপুর হয়েছে। কিন্তু কালো মেঘে এতটাই ভারী হয়ে গেছে আকাশ, প্রায় রাতের মত অন্ধকার। দাঁড়ের আঙটায় দাঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে বাইতে শুরু করল সে।

গলুইয়ের কাছে বসেছে কিশোর। এদিকে মুখ করে। শক্ত হয়ে আছে চোয়াল। চোখে কঠিন দৃষ্টি। বোঝা যাচ্ছে বন্ধুদের খুনের প্রতিশোধ নিতে মুসার মতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে।

রবিন এলে ভাল হত। সাহায্য করতে পারত। কিন্তু এতটাই অসুস্থ সে, বিছানা থেকে উঠতে কষ্ট হয়। তা ছাড়া সারারাত জেগে থাকার উত্তেজনা আর পরিশ্রমে আরও বেশি কাহিল হয়ে পড়েছে।

নৌকার পাটাতনে পড়ে আছে দুটো নাইলনের ব্যাগ। দুটোতে একই জিনিস আছে। কাঠের চোখা গজাল। বড় হাতুড়ি। ভ্যাম্পায়ার ধ্বংস করার সরঞ্জাম। কিশোরের বুদ্ধিতে নেয়া হয়েছে এসব। এগুলো দিয়ে কি করবে কিশোর, জানে না মুসা। বেকায়দায় পড়লে খুন করবে নাকি 'মানবভ্যাম্পায়ারের' বুকে গজাল ঢুকিয়ে!

'রোদ থাকলে ভাল হত,' কিশোর বলল। 'বিচ্ছিরি আবহাওয়া।'

'ভ্যাম্পায়ারের জন্যে চমৎকার।'

'কি জানি। চাঁদনী রাতে বেরিয়েও ভ্যাম্পায়াররা আনন্দ পায়।'

'পাবেই। আধামানুষ তো। মানুষেরা যাতে যাতে আনন্দ পায়, ওরাও পায়।'

'মানুষেরা মানুষের রক্ত খায় না।'

'কে বলল? নরখাদকদের কাহিনী ভুলে গেছ? এই শতকের গোড়ার দিকেও আফ্রিকার জঙ্গল আর প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপে মানুষখেকো মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে।'

'তা ঠিক,' আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল মুসা। 'মনে হচ্ছে আগামী পুরো হপ্তাটায়ই বৃষ্টি থাকবে। থাকুকগে। ভ্যাম্পায়ারগুলোকে খতম করতে পারলে আর থাকব না এখানে। বাড়ি ফিরে যাব।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'কিন্তু যে হারে অন্ধকার হচ্ছে...'

বৃষ্টির বেগ খানিকটা বাড়ল। রেইন কোটের ওপর ফোঁটা পড়ার একটানা আওয়াজ হতে থাকল পুট পুট করে। সাগর শান্ত। ঢেউ এতই কম, হ্রদের পানির মত লাগছে। তাতে সুবিধে হয়েছে। নৌকার গতি বেশি। দ্রুত এগিয়ে চলেছে দ্বীপের দিকে।

'ভয় লাগছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ। তবে কাজ সারতেই হবে। স্যান্ডি হোলোতে এই ভ্যাম্পায়ারের ব্যবসা খতম করে ছাড়ব আজ। তোমার ভয় লাগছে না?'

'না,' হাসল মুসা। 'ভয় তো ভূতকে। মানুষকে আবার কিসের ভয়?'

'কিন্তু মানুষকেই ভয় করা উচিত। কারণ ওরা বাস্তব। ক্ষতি করার ক্ষমতা সীমাহীন।'

চুপ হয়ে গেল মুসা। এই তর্কের শেষ নেই। সে ভূত বিশ্বাস করে, কিশোর করে না। অতএব যুক্তি দেখানোরও শেষ হবে না।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দ্বীপটা দেখল মুসা। কাছে চলে এসেছে। মেঘলা অন্ধকারের মধ্যে সামনে খাড়া হয়ে রয়েছে কালো দেয়ালের মত। জিনাকে নিতে এসে রাতের বেলা দেখেছিল সেদিন। দিনের বেলা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর মনে হলো আজ।

'দেখেই মনে হয় শয়তানের ঘাঁটি,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, সত্যি সত্যি শয়তান বাস করে ওখানে।'

আরও কাছে এলে গাছগুলোকে আলাদা করে চেনা গেল। দ্বীপের কিনারে ঘন হয়ে জন্মেছে বড় বড় গাছ।

বরফ শীতল এক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল মুসার কপাল থেকে। কেঁপে উঠল সে।

পুরানো ডকটা রাতের বেলা দেখেছে। কোন্খানে ছিল, মনে করতে পারল না। আন্দাজে এগিয়ে চলল। তীরের একপাশ থেকে আরেক পাশে চোখ বোলাল। কিন্তু দেখতে পেল না ওটা।

কোথায়? কোনখানে ছিল?

তীরের আরও কাছে চলে এল নৌকা।

'নাহ্, নেই! গায়েব!'

'কি গায়েব?' জানতে চাইল কিশোর।

'ডকটা···ওহ্হো, না না আছে। মানে, ছিল।'

করাতে কাটা কতগুলো তক্তার মাথা পানি থেকে উঁকি দিয়ে আছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে কোন্খানে ছিল ডকটা। এমনভাবে কেটে নষ্ট করে ফেলেছে, নৌকা বাঁধারও কিছু নেই।

'ভ্যাম্পায়ারেরাই কেটে ফেলেছে,' মুসা বলল। 'নৌকা নিয়ে কেউ এসে যাতে ওদের গোপন ঘাঁটি খুঁজে বের করে হামলা চালাতে না পারে সেজন্যেই এই সতর্কতা। নিজেদের নৌকা ভেতরে কোন খাঁড়িটাড়িতে লুকিয়ে রাখে।'

'তাহলেই বোঝো,' চোখের পাতা সরু করে ফেলল কিশোর। 'এই একটা ব্যাপার থেকেই বোঝা যায় ওরা ভূত নয়, মানুষ।···কিন্তু ওরা কিছু সন্দেহ করে ফেলল নাকি? আমরা আসব বুঝতে পেরেছে!'

অসম্ভব নয়। সাবধানে তীরের কাছে নৌকা নিয়ে এল মুসা। টেনে তোলার জায়গা খুঁজতে লাগল। বড় বড় পাথর আর পাথরের খাড়া দেয়াল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

'সাঁতরে উঠলে কেমন হয়?' কিশোরের প্রশ্ন।

'নৌকাটা কোথায় রেখে যাব? নোঙর নেই। ভেসে চলে যাবে। তখন ফিরব কি করে?'

দ্বীপটার যে পাশে খোলা সাগর, সেদিকে নৌকা নিয়ে গেল মুসা। ওপাশে বড় বড় ঢেউ। লোফালুফি শুরু করে দিল যেন নৌকাটাকে নিয়ে। এখনই ঢেউয়ের মাথায় চড়ছে নৌকা, পরক্ষণেই ঝপাৎ করে একেবারে নিচে—দুই ঢেউয়ের মাঝখানের উপত্যকায়, তারপর আবার ওপরে। চলতেই থাকল এ রকম। মোচার খোলার মত দুলছে। গলুইয়ে বাড়ি খেয়ে পানি ছিটকে এসে পড়ছে চোখে মুখে।

'খোলা সাগরে বেরোনোর উপযুক্ত নয় এই নৌকা,' শঙ্কিত হয়ে বলল কিশোর। দুই হাতে দুদিকের কিনার চেপে ধরে রেখেছে। 'ভেতরের দিকটাতে থাকাই উচিত ছিল।'

তীরের কাছে একটা পরিবর্তন চোখে পড়ল মুসার। চিৎকার করে উঠল, 'দেখো, ঢোকার মুখ!'

কিশোরও দেখল। একটা খালমত ঢুকে গেছে দ্বীপের ভেতরে।

ওটার দিকে নৌকা বাইতে লাগল মুসা। ঢেউয়ের জন্যে বাইতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু হাল ছাড়ল না সে।

খালের প্রবেশ মুখে ঢুকতেই ঢেউয়ের অত্যাচার কমে গেল। মাথার ওপর খাড়া হয়ে আছে বড় বড় গাছ। ছাতার মত ছড়িয়ে আছে ডালপালা। কিছু ডাল পানির ওপর ঝুঁকে পড়ে পানি ছুঁই ছুঁই করছে।

কুচকুচে কালো লাগছে পানির রঙ। তার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ভেসে এগিয়ে চলল নৌকা। আগের বারের কথা মনে পড়ল মুসার। রাত ছিল। মাথার ওপরে উড়ছিল অগণিত বাদুড়। বনের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল নেকড়ের ডাকের মত ডাক। বাদুড়রা দিনে ওড়ে না, কিন্তু নেকড়ে যে কোন সময় হামলা চালাতে পারে। যদিও এখন ডাক শোনা যাচ্ছে না, তবু সাবধান থাকতে হবে। কোন্দিক দিয়ে এসে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কোন ঠিক নেই। তা ছাড়া মেঘলা বনের চেহারা রাতের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না।

'ওদিকে নিয়ে যাও,' হাত তুলে দেখাল কিশোর। বন ওখানে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে পানিতে। নৌকা রেখে যাওয়ার উপযুক্ত জায়গা।

নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল মুসা। নরম মাটিতে ঠেকল নৌকার তলা। লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে দড়িটা একটা গাছের ডালে বেঁধে ফেলল সে।

ব্যাকপ্যাক দুটো ওর দিকে ছুঁড়ে দিল কিশোর। তীরে নামল।

ভারী দম নিল মুসা। বাতাসে একধরনের ভেজা ভেজা ভাপসা গন্ধ। 'যাব?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ।

দ্বীপটা যে এত ছোট, আগে বোঝেনি মুসা। আগের বার পুড়িয়ে রেখে যাওয়া বীচ হাউসটার কাছে পৌছতে কয়েক মিনিটও লাগল না। ওটার দিকে এগোতে গিয়ে আরও কতগুলো প্রায় একই ধরনের বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়ি মানে বাড়িঘরের কঙ্কাল, ধ্বংসাবশেষ।

'কফিনগুলো খুঁজে বের করব কি করে?' ঘড়ির দিকে তাকাল মুসা।

'বিকেল তো হয়ে এল। দুজন দুদিকে গিয়ে খুঁজব নাকি? তাতে সময় বাঁচবে।'

'সত্যি কি লাভ হবে তাতে?' ব্যাগটা হাত বদল করল কিশোর।

'একা হতে ভয় পাচ্ছ নাকি?'

দ্বিধা করল কিশোর। মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করল, 'পাচ্ছি না বলা যাবে না। খুনীদের সঙ্গে লাগতে এসেছি আমরা। সাধারণ খুনী নয়, একেবারে পিশাচ, জীবন্ত মানুষের গা থেকে রক্ত চুষে চুষে খেয়ে খুন করে। ওদের পক্ষে সব সম্ভব। এটা ওদের রাজত্ব। ধরে, বেঁধে রক্ত খেয়ে যদি লাশগুলো সাগরে ভাসিয়ে দেয় কিচ্ছু করার থাকবে না আমাদের।'

'ধরো কফিনে শোয়া অবস্থায় পাওয়া গেল ওদের। কি করব? গজাল ঢুকিয়ে দেব হৃৎপিণ্ডে?'

'না। খুন হয়ে যাবে সেটা। শুধু ভয় দেখাবে।'

'যদি ভয় না পায়?'

'পিটিয়ে বেহুঁশ করার চেষ্টা করবে।'

'তারপর?'

'কফিনের ডালা আটকে রেখে চলে যাব, যাতে বেরোতে না পারে। পুলিশ নিয়ে ফিরে আসব।'

একে অন্যকে 'গুড-লাক' বলে দুজন দুদিকে রওনা হয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, কালো একটা বাড়ির কঙ্কালের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে কিশোর। ঘুরে দাঁড়াল মুসা। ডানের আরেকটা কঙ্কালের দিকে এগিয়ে চলল সে। দরজার কাছে এসে দ্বিধা করল। তারপর যা থাকে কপালে ভেবে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখে সইয়ে নেয়ার জন্যে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড পরেই বুঝতে পারল, ঘরে আরও কেউ রয়েছে।

বিশ

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল মুসা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের অন্ধকারের দিকে। ব্যাগটা হাতে ঝোলানো। চেন খুলে গজাল বের করতে সময় লাগবে। ততক্ষণে আক্রমণ করে বসবে ঘরে যে আছে। ডলি কিংবা কিমিকে ভয় করে না সে। দুটো মেয়ে কিছুই করতে পারবে না ওর। তার ভয়, কাউন্ট ড্রাকুলাকে। পালের গোদা। পুরুষ মানুষ। সঙ্গে পিস্তল থাকা অস্বাভাবিক নয়।

খুট করে একটা শব্দ হলো।

তাকাল সেদিকে।

খুব আবছাভাবে নড়াচড়া চোখে পড়ল। মৃদু গরগর কানে এল। রেগে গেলে কুকুর যা করে।

হঠাৎ বুঝে ফেলল প্রাণীটা কি। নেকড়ে!

মহাসঙ্কটে পড়ে গেল মুসা। কি করবে? এগোনোর প্রশ্নই ওঠে না। পিছানোও বিপদ। মুহূর্তে এসে আক্রমণ করে বসবে নেকড়েটা।

জিম করবেটের মানুষখেকো বাঘ শিকারের কাহিনী মনে পড়ল। চৌগড়ের ভয়াবহ বাঘিনীর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলেন একবার তিনি। হাতে ছিল রাইফেল। বাঘিনীটা এতটাই কাছে ছিল তাঁর, কোন রকম নড়াচড়া করতে গেলেই ঝাঁপিয়ে এসে পড়ত। খুব ধীরে ধীরে হাতের রাইফেলটা ঘুরিয়ে টার্গেট করে তারপর গুলি করেছিলেন।

সেই বুদ্ধিটাই কাজে লাগাল এখন সে। খুব ধীরে যেন অনন্তকাল ধরে চেষ্টা করে নেকড়েটাকে চমকে না দিয়ে হাতের ব্যাকপ্যাকটা প্রায় পেটের ওপর নিয়ে এল। অন্য হাতটা আনল চেনের ওপর। করবেটের মত অতটা সাবধান থাকতে পারেনি, নড়াচড়া বোধহয় একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল নেকড়ের গরগরানি। হাতটা যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দিল সে। একেবারে স্থির। গরগর কমলে চেন খুলতে শুরু করল। ব্যাগের ভেতর হাত ঢোকাল। আঙুলে ঠেকল হাতুড়ির বাঁট। ঠিক এই সময় আক্রমণ করে বসল নেকড়ে।

একসঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। হাত থেকে ব্যাগটা ছেড়ে দিল মুসা। টান দিয়ে বের করে আনল হাতুড়ি। নেকড়েটা এসে ওর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই হাতুড়ি ঘুরিয়ে আন্দাজে বাড়ি মারল।

থ্যাপ করে একটা আওয়াজ হলো। বাড়িটা লাগল নেকড়ের পেটে। ভয়ঙ্কর গর্জন করে মুসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটা।

পড়ে গেল মুসা। হাতুড়ি ছাড়ল না। চিত হয়ে পড়েছে। ওই অবস্থাতেই আবার বাড়ি মারল। লাগল নেকড়ের গলায়। প্রচণ্ড ব্যথায় আবার গর্জে উঠে থমকে গেল প্রাণীটা। পরক্ষণে দাঁত বের করে মুসার টুঁটি কামড়ে ধরতে এল।

নাকে মুখে বাড়ি মারতে লাগল মুসা। থেঁতলে দিল নাকটা। দরজা দিয়ে আসা আলোয় দেখতে পেল রক্ত বেরোচ্ছে নেকড়ের নাক থেকে। গুঙিয়ে উঠল ওটা। ভীষণ রাগে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মুসার বুকে।

কানের পাশে বাড়ি মারল মুসা। মোক্ষম আঘাত। কাত হয়ে পড়ে গেল নেকড়েটা। ঠেলা মেরে বুকের ওপর থেকে নেতিয়ে পড়া প্রাণীটাকে সরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। মরেনি এখনও। চোখ মিটমিট করে তাকাচ্ছে। ব্যথাটা সহ্য হয়ে গেলেই আবার উঠে দাঁড়াবে। আবার কামড়ে ছিঁড়তে আসবে ওকে। সুযোগ দেয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি ব্যাকপ্যাক থেকে একটা কাঠের গজাল বের করে চোখা মাথাটা ঠেসে ধরল নেকড়ের হৃৎপিণ্ড বরাবর। বাড়ি মেরে মেরে ঢুকিয়ে দিল যতখানি যায়।

থরথর করে কেঁপে উঠল নেকড়ের শরীরটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল গজালের চারপাশ থেকে। ঠিক মুমূর্ষু কুকুরের মত আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগল মুখ দিয়ে

গজাল বেঁধা নেকড়ে! ভয়ানক দৃশ্য। তাকাতে পারল না আর মুসা। নেকড়ের মতই থরথর করে কাঁপতে লাগল সে-ও। মায়াই লাগছে প্রাণীটার জন্যে। না মেরে উপায় ছিল না। না মারলে তাকে মরতে হত।

ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিয়ে হাতুড়ি হাতে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভেতরে আর কেউ আছে কিনা দেখারও প্রয়োজন বোধ করল না। ভয়ঙ্কর নেকড়ের সঙ্গে একঘরে বাস করার কথা নয় কারও।

কথাটা মনে হলো এই সময়—পোষা নেকড়ে নয় তো ওটা? তাই হবে। নইলে এত বিপজ্জনক একটা প্রাণীর সঙ্গে বাস করার সাহস হত না কিমি আর ডলির। তা ছাড়া এই দ্বীপে নেকড়ে আসবেই বা কোথা থেকে। দ্বীপ পাহারা দেয়ার জন্যেই রাখা হয়েছে প্রাণীটাকে। ঠিক। কাউন্ট ড্রাকুলার প্রহরী। ট্রানসিলভানিয়ার সেই দুর্গের মত। এর আগের বার যখন এসেছিল সে, তখনও ছিল ওটা। আগুনের ভয়ে নিশ্চয় কাছে আসেনি সেবার। একটাই আছে? না আরও? সাবধান থাকতে হবে। কোনদিক থেকে এসে ঘাড়ে পড়বে কে জানে। সাবধান থেকেও কতটা লাভ হবে বলা যায় না। দল বেঁধে এসে একযোগে আক্রমণ চালালে কিছুই করার থাকবে না ওর। মুহূর্তে টেনে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

বাড়িটার কাছ থেকে সরে এসে দ্রুত অন্য বাড়ির খোঁজে হাঁটতে লাগল সে।

বুনো পথে চলতে গিয়ে দিনের বেলাতেও গা ছমছম করতে লাগল। ভূতুড়ে বন। সত্যি সত্যি ভূত থাকলেও এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভয় তার শক্তি কেড়ে নিয়েছে যেন। পা দুটো অসম্ভব ভারী লাগছে। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে।

পাওয়া গেল আরেকটা বাড়ি। একটা পাশ ধসে পড়েছে। ঢুকে কিছু পেল না।

একের পর এক বাড়িতে ঢুকে দেখতে লাগল সে। কোনটাতেই কফিন দেখল না। কিমি আর ডলিকে পেল না। যে ঘরেই তাক, আলমারি, সিন্দুক রয়েছে, কোনখানে খোঁজা বাকি রাখল না।

কিন্তু কিমিও নেই। ডলিও না। কোন চিহ্নই নেই ওদের। গেল কোথায়? কোন্খানে আছে?

ছোট্ট এক টুকরো খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল সে ঘড়ি দেখল। তিনটে পঁয়তাল্লিশ। আগের বার যখন দেখেছিল, তখনও ছিল তিনটে পঁয়তাল্লিশ। হঠাৎ খেয়াল করল, সেকেন্ডের কাঁটাটা চলছে না। এই ব্যাপার! বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়ি। নেকড়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় বাড়ি লেগে নিশ্চয়।

সময় বোঝার উপায় নেই আর। কতক্ষণ ধরে রয়েছে বলতে পারবে না। সূর্য ডোবার কত দেরি, তাও জানা গেল না।

বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু ভারী মেঘে ঢেকে রেখেছে আকাশ। সময় অনুমান করা কঠিন। তবে সন্ধ্যা বোধহয় হয়ে গেছে। আলো নিভে যাওয়ার আগেই কিমি আর ডলিকে খুঁজে বের করতে না পারলে আজকের মত ফিরেই যেতে

হবে। রাতের বেলা অন্ধকারে ওদের খুঁজতে যাওয়াটা হবে চরম বোকামি। খুঁজে পাবেও না। ওদিকে মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে। আরও নেকড়ে থেকে থাকলে রাতের বেলা ভয়ানক বিপদে পড়বে।

কিশোর কোথায়? কাউকে নিশ্চয় খুঁজে পায়নি এখনও। তাহলে যোগাযোগ করত ওর সঙ্গে। নাকি বিপদে পড়ল? চিৎকার তো শোনা যায়নি।

খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল মুসা। কোনদিকে যাবে বুঝতে চাইছে। বনের ভেতর থেকে ভেসে এল একটা কাঁপা কাঁপা ডাক। নেকড়ে! তারমানে আরও আছে! দূর থেকে শেয়ালের ডাকও অনেক সময় নেকড়ের মত লাগে। তবু, খারাপটা ভেবে রাখাই ভাল। প্রাণীটাকে নেকড়ে ধরে নিল সে।

রাতের আর কত বাকি? রাত পর্যন্ত কি অপেক্ষা করবে ওটা? একটাই আছে আর, না আরও বেশি?

ভুল করে আবার তাকাল ঘড়ির দিকে। তাকিয়েই মনে পড়ল নষ্ট। সেই তিনটা পঁয়তাল্লিশই বাজে। বাদুড়েরা এখনও বেরোয়নি। ওরা বেরোতে শুরু করলেই বুঝতে হবে সন্ধ্যা লেগে গেছে।

কিশোরকে ডাকার কথা ভাবল। চিৎকার করতে হবে তাহলে। নেকড়ের কানে যাবে সেই ডাক। হয়তো কিশোরের আগে ওরাই ছুটে আসবে। বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতেও এখন ভয় লাগছে। কিন্তু উপায় নেই। নৌকার কাছে যেতে হলেও বনের ভেতর দিয়েই যাওয়া লাগবে।

নৌকা! তাই তো! এখান থেকে কতখানি দূরে, অনুমান করতে পারল না। সাগরের খোলা দিকটা দিয়ে খালে ঢুকেছিল। খুঁজে বের করতে সময় লাগবে। নেকড়ের তাড়া খেলে এখন পৌঁছতে পারবে না ওটার কাছে।

আতঙ্ক যেন চেপে ধরল ওকে। গাছপালার ফাঁকে ঘুরে বেড়াতে লাগল চঞ্চল দৃষ্টি। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটা ঘাসে ছাওয়া। ভাল করে তাকাতে চোখে পড়ল একজায়গার ঘাস চ্যাপ্টা হয়ে আছে। কেউ মনে হয় হেঁটে গেছে এখান দিয়ে।

রাস্তা?

না, রাস্তা এখনও পুরোপুরি হয়নি। হেঁটে যাওয়ার ফলে একটা পায়ে চলা পথ তৈরি হচ্ছে। নেকড়ের কাজ?

ধূর! অত চিন্তা করে কিছু করতে পারবে না! নিজেকে ধমক লাগাল সে—যা হোক একটা কিছু করে ফেলো, নয়তো 'ভ্যাম্পায়ার' খোঁজা বাদ দিয়ে মানে মানে কেটে পড়ো এখান থেকে।

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরে পা বাড়াল সে। বনে এসে ঢুকল। বনটা এদিকে বেশ গভীর। এগিয়ে চলল গাছপালার মাঝখান দিয়ে গায়ে বাড়ি লেগে সড়াৎ সড়াৎ করে সরে যাচ্ছে ডাল। পাতায় লেগে থাকা পানি মুহূর্তে ভিজিয়ে দিল শরীর। ঘন হয়ে জন্মে আছে মোটা মোটা লতা ঝুলে আছে রাস্তার ওপর। হাঁটতে গেলে জড়িয়ে ধরে।

এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো সে। সামনে ডালপাতা জড়িয়ে ধরে দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরি করে রেখেছে লতার দঙ্গল। তার ওপাশে বাড়ির দেয়ালের মত কি যেন চোখে পড়ছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ডাল সরিয়ে দেখতে যেতেই খোঁচা লাগল হাতে। কুটুস করে কি যেন বিঁধল।

'আউক!' করে হাতটা সরিয়ে এনে তাকাল। খাইছে! দুটো ফুটো। ভ্যাম্পায়ারে দাঁত বসালে যেমন হয়। দুই ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এসেছে। চুষে ফেলতে গিয়ে থমকে গেল। ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপে এসে এ ভাবে রক্ত খাবে! নিজেও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে আনল।

যাবে কি করে ওপাশে, ভাবনায় পড়ে গেল সে। কাঁটার জন্যে ছোঁয়াও যাচ্ছে না।

ব্যাকপ্যাক থেকে একটা গজাল টেনে বের করল। ঢুকিয়ে দিল লতার দঙ্গলের মধ্যে। চাড় মেরে মেরে ফোকর বড় করতে লাগল। তাকাল তার ভেতর দিয়ে।

বাড়িই আছে ওপাশে একটা। দ্বীপের অন্য বাড়িগুলোর তুলনায় মোটামুটি অক্ষত। আলো ফুরিয়ে আসার আগেই কাজ সারার তাগিদে দ্রুত হাত চালাল সে। ফোকরটা বড় করে ফেলল যাতে কোনমতে গলে অন্যপাশে চলে যেতে পারে। গজালটা আবার ব্যাগে ভরল।

কিন্তু কাঁটার জন্যে ফোকর গলে যাওয়াও এক ঝকমারি। কাপড়ে আঁকড়ে ধরল কাঁটা, ব্যাগ টেনে ধরল, হাতের, মুখের চামড়া ছড়ে গেল। সব কিছু সহ্য করেই আসতে হলো অন্যপাশে।

আকাশের দিকে তাকাল। বন্ধ হওয়ার পর আর শুরু হয়নি বৃষ্টি। মেঘের দল টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে। কেউ যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ওগুলোকে। নেকড়ের দল! মনে পড়ল আবার।

সূর্য ডোবার আর কত বাকি? কতটা সময় হাতে আছে আর?

বাড়িটার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। নব চেপে ধরে মোচড় দিতে সহজেই ঘুরে গেল। ঠেলা দিতে ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে আটকে গেল পাল্লা। কোন কিছুতে লেগে গেছে।

জোরে ঠেলা দিল সে।

সামান্য একটু খুলে আবার আটকে গেল।

গায়ের জোরে ঠেলতে শুরু করল সে। যাতে আটকে ছিল, মেঝেতে ঘষার শব্দ তুলে সরে যেতে লাগল সেই জিনিসটা।

ফুটখানেক ফাঁক হতেই আর খোলার চেষ্টা করল না সে। তার মধ্যে দিয়েই চেপেচুপে কোনমতে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকার ঘর। দরজা দিয়ে যা সামান্য আলো আসছে। আর কোনদিক দিয়ে আসার পথ নেই আর।

চোখে অন্ধকার সয়ে আসার অপেক্ষা করতে লাগল। চোখে পড়ল একটা ড্রেসার এটাই দরজা আটকে রেখেছিল।

ধীরে ধীরে নজরে এল পুরো ঘরটাই। একটা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে

অদ্ভুত গন্ধ। আগুনের কুণ্ড করে নিভিয়ে ফেলার পর যা হয় অনেকটা তেমন।

সমস্ত ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার দৃষ্টি। পুরো ঘরটাই প্রায় খালি।

আরেকটা দরজা দেখে সেটা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। এই ঘরটা আরও বেশি অন্ধকার। ভেজা বাতাস। ভাপসা গন্ধ। কোণে কোণে অন্ধকার ছায়া। রান্নাঘর দিয়ে আসা আলোয় সে-অন্ধকার কাটছে না। দেখা যায় মোটামুটি।

দেয়ালগুলোর দিকে তাকাল সে। জানালা আছে। তবে তক্তা লাগিয়ে পেরেক ঠুকে আটকে দেয়া হয়েছে।

ছায়াতে কি আছে দেখার চেষ্টা করল।

এককোণে ওটা কি?

আরে একটা নয়, তিনটে। ছায়া এতই গভীর, বোঝা যায়নি প্রথমে।

তিনটে আয়তাকার বাক্স পড়ে আছে।

কফিন!

দম বন্ধ করে ফেলল সে। তিনটে কেন? দুটোতে কিমি আর ডলি। তৃতীয়টায় কে আছে?

কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল বুকের মধ্যে। যা খুঁজতে এসেছিল পেয়েছে। পাওয়া গেছে ভ্যাম্পায়ারের গোপন আস্তানা।

সাবধান রইল কোন রকম শব্দ যাতে আর না হয়। দরজা খোলার সময় যেটুকু করে ফেলেছে, ফেলেছে। ওই শব্দে যদি জেগে গিয়ে না থাকে, ভাল। জাগাতে চায় না। আস্তে করে নামিয়ে রাখল ব্যাকপ্যাকটা। একটা গজাল বের করে রাখল একটা কফিনের পাশে। হাতুড়িটা মাথার ওপর তুলে, বাগিয়ে ধরে রেখে, টান দিল কফিনের ডালা ধরে।

তুলেই থমকে গেল। ভেতরে বিছানা আছে। কিন্তু মানুষ নেই।

হাতের তালু রেখে বিছানাটা ছুঁয়ে দেখল। গরম। তারমানে এইমাত্র বেরিয়েছে। নিশ্চয় দরজা খোলার শব্দে জেগে বেরিয়ে গেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল মুসা। পেছনে শব্দ হলো।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে।

ধড়াস করে উঠল বুক। একটা হার্টবীট মিস হয়ে গেল। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে লম্বা এক লোক কালো আলখেল্লা, মুখ ভর্তি দাড়ি, ব্যাকব্রাশ করা চুল, ফ্যাকাসে চেহারা—সব মিলিয়ে একেবারে ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা। ট্রানসিলভানিয়ার দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন।

তবে এই ড্রাকুলার হাতে পিস্তল আছে। খসখসে গলায় হুকুম দিল, 'কোন শয়তানি করার চেষ্টা করলেই গুলি খাবে। এখানে কি জন্যে এসেছ?'

জবাব দেয়ার আগেই রান্নাঘর থেকে ঢোকার দরজায় আরেকটা মূর্তিকে দেখতে পেল মুসা। কিশোর।

'কি হলো, জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'এই জন্যে,' পেছন থেকে বলে উঠল কিশোর।

ঘুরে দাঁড়াতে গেল ড্রাকুলা। সময় দিল না কিশোর। নির্দ্বিধায় কাঠের হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারল লোকটার মাথায়।

এক আঘাতেই ড্রাকুলা কাত। হাতের পিস্তলটা মেঝেতে পড়ল খটাং করে। কাটা কলাগাছের মত টলে উঠে পড়ে যেতে শুরু করল লোকটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। বেহুঁশ হয়ে গেছে।

'ধরো ব্যাটাকে! ওর কফিনেই শুইয়ে ডালা লাগিয়ে বন্দি করি। তারপর পুলিশ আনতে যাব।'

শব্দ শুনে অন্য দুটো কফিনের ডালাও খুলে গেছে। উঁকি দিল কিমি আর ডলি। দৃশ্য দেখে হাঁ হয়ে গেল দুজনেই।

কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল কিশোর, 'চুপচাপ থাকো। নইলে বসের অবস্থা করে ছাড়ব। ভ্যাম্পায়ারগিরি ঘুচিয়ে দেব আজ।' হাতের হাতুড়িটা তুলে নাচাল। 'মাথায় বাড়ি খাওয়ার ইচ্ছে আছে?'

ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল ডলি। বোঝা গেল, ইচ্ছে নেই।

জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এ দ্বীপে আর কে কে আছে তোমাদের সঙ্গে?'

'কেউ না,' জবাব দিল কিমি।

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি।'

'তাহলে কোথায় আছে?'

'বহু জায়গায়। কোন্‌টার নাম বলব?'

'সবগুলোরই বলতে হবে। পরে। দ্বীপে আর কেউ নেই তো?'

'না,' মাথা নাড়ল কিমি।

'থাকলে ওর মাথা ফাটানোর আগে তোমার মাথা ফাটাব, বলে দিলাম!' হুমকি দিল কিশোর।

'সত্যি নেই।'

'হুঁ। শুয়ে পড়ো এবার। কোন রকম শয়তানির চেষ্টা করলে এটা ঢোকাব হৃৎপিণ্ডে,' একটা গজাল দেখাল কিশোর। 'ভ্যাম্পায়ার-খেলা অনেক খেলেছ। অনেক নিরীহ মানুষকে খুন করেছ। রবিনের রক্ত খেয়েছ। তোমাদের খুন করার জন্যে হাত নিশপিশ করছে আমার। সুযোগটা দিয়ো না।'

বিশ্বাস করল ওরা। সুযোগ দিল না কিশোরকে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে ভেতর থেকে ডালা নামিয়ে দিল।

সঙ্গে করে দড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। তিনটে কফিনের ডালা বাক্সের সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা হলো, যাতে ভেতর থেকে কোনমতেই বেরিয়ে আসতে না পারে তিন 'ভ্যাম্পায়ার'।

কাজ শেষ করে দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে মুসার দিকে তাকাল কিশোর, যাও এবার, পুলিশ নিয়ে এসোগে। আমি এদের পাহারা দিচ্ছি।'

'যদি দলে আরও লোক থাকে? তোমার ওপর হামলা চালায়?'

'নেই। কিমি মিথ্যে বলেনি। ডলির মত অভিনয় জানে না ও। আর যদি থাকেও,' মেঝে থেকে পিস্তলটা তুলে নিল কিশোর, 'কিছু করতে এলে গুলি

খেয়ে মরবে। দেখামাত্র বুকে গুলি করব। কোন ঝুঁকি নেব না। হাতে পিস্তল আছে যখন, নেকড়ে এলেও ভয় নেই···যাও যাও, দেরি কোরো না। ওই শয়তানগুলো আসার আগেই নৌকায় উঠে পড়োগে।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি। সাবধানে থেকো। আমি যাব, আর আসব।'

একটা গজাল আর হাতুড়ি তুলে নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মুসা।

***

ভলিউম ২৮

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০